প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

প্রকাশক : শ্রীস্বপনকুমার বিশ্বাস
ভাষা ও সাহিত্য
১০ / ২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা : ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : শ্রীঅনির্বাণ দত্ত

মুদ্রণ : শ্রীগোবিন্দ লাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিণ্টার্স
২, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা : ৭০০০০৬

উৎসর্গ

আমার অধ্যাপক
আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অবিস্মরণীয়েষু

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয় তাগিদেই গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ প্রবন্ধ রচিত। নইলে এগুলো লেখাই হ'ত না। এজন্য 'চতুষ্কোণ,' 'ক্রান্তিক' ও 'ঋক্' পত্রের সম্পাদকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাপক-বন্ধু শংকর দাশগুপ্ত প্রমুখ দু'য়েক জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা ত' ছিলই।

সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হ'ল। এ লেখা, বলা বাহুল্য, পণ্ডিতজনের জন্য নয়। সাধারণ পাঠক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্যই। কারণ আমি পণ্ডিত বা সাহিত্যতত্ত্ববিৎ গবেষক নই। জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্র। নানা জনের বই পড়ে কিছু কিছু মাধুকরী বৃত্তির সাহায্যে আমার জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করতে চেয়েছি। তার বেশি নয়। কবির ভাষায় বলা যেতে পারে

> "জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
> পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।'

কাজেই জ্ঞানরাজ্যের রাজপথপার্শ্বে আমি এক দীন ভিক্ষাপ্রার্থী মাত্র, তার বেশি গৌরব দাবী করিনা। তবে সাহিত্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা কালে কিছু কিছু নিজের কথা সবিনয়ে বলবার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য সহজ ও সুবোধ্য ভাষায়, এই মাত্র বলতে পারি। ভুলত্রুটি যদি কিছু ঘটে থাকে, তবে পণ্ডিত জন নিজগুণে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তা মার্জনা করবেন এই অনুরোধ।

জিজ্ঞাসা থেকে জাত বলেই গ্রন্থটির নাম দেওয়া হ'ল 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা'। তবে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে এবং আমার অতি সীমাবদ্ধ সাধ্যানুসারে সে জিজ্ঞাসার মীমাংসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কতদূর সফল হয়েছি তা' পাঠকদের বিচার্য। সাহিত্য-তত্ত্বের মতো দুরূহ বিষয় নিয়ে যাঁরা উচ্চতর জ্ঞান সঞ্চয়ে কৌতূহলী তাঁরা ডঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য বিবেক' ও 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব' প্রভৃতি বই অবশ্য পড়ে নেবেন। ইংরেজীতে এ বিষয়ে অজস্র বই আছে। তার একটি তালিকা পরিশিষ্টে দিতে চেয়েও বাহুল্যবোধে দিলামনা।

এই গ্রন্থ প্রকাশে 'ভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশনা সংস্থার শ্রী স্বপন বিশ্বাস যে নিষ্ঠা, যত্ন ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে অভিভূত হয়েছি। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে কাগজের দাম, মুদ্রণ ব্যয় এমন বেড়েছে এবং দিন দিন এতই বাড়ছে যে, বই প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ও দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। তবু শ্রীবিশ্বাস যে ঝুঁকি নিয়েছেন তা

তাঁর সাহিত্য-পুস্তক-প্রীতিরই অকৃত্রিম নির্দশন। এজন্য তিনি বাঙালী লেখক-পাঠক বর্গের ধন্যবাদার্হ। বইটি যাতে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদেরও কাজে লাগে এজন্য ধ্বনি ও রস সম্পর্কিত দু'টি আলোচনা এবং রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধ সম্পর্কিত একটি আলোচনা যুক্ত করা হ'ল।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন অনুজপ্রতিম কবি ও শিল্পী অনির্বাণ দত্ত। তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

'শৈলীবিজ্ঞান' বা 'stylistics', 'মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সৌন্দর্যবোধ' এবং 'গিয়র্গি লুকাচ' সম্পর্কিত আলোচনা কলেবর-বাহুল্য ও ব্যয়-বাহুল্য ভয়ে (এ গ্রন্থে দেবার ইচ্ছা সত্ত্বেও) শেষ পর্যন্ত দেওয়া হ'লনা। যদি ভবিষ্যতে, লেখকের আয়ুষ্কালে, কোনদিন এ গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা দেয়, তখন এগুলি গ্রন্থভুক্ত করা যাবে।

প্রুফ্ দেখায় যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ সামান্য দু'একটি মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেল। এজন্য সহৃদয় পাঠক বর্গ নিজগুণে মার্জনা করবেন এই অনুরোধ। ইতি।

বিনীত
অজয় কুমার ঘোষ

সূচীপত্র

সাহিত্যিক প্রতিভার স্বরূপ ঃ বস্তুবাদী বিচার

১

শিল্পসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সাহিত্যিক প্রতিভার রহস্য সন্ধান ও স্বরূপ বিচার এক উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কবিপ্রতিভাকে বলেছেন 'অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা।' অর্থাৎ তাঁদের মতে 'অপূর্ব বস্তু' হ'ল কাব্য এবং তা নির্মাণ করবার বিশেষ 'প্রজ্ঞা' শক্তিই প্রতিভা। অর্থাৎ যাঁর মধ্যে এই প্রজ্ঞাশক্তি থাকে তিনিই প্রতিভাবান। কথাটার মধ্যে প্রতিভার বিশেষ-ব্যক্তিত্ব শক্তির এবং সেইসঙ্গে কি একটা অ-লৌকিক শক্তির আভাস যেন রয়েছে। কিন্তু এই প্রজ্ঞাশক্তির উৎস কোথায় এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে। প্রতিভার স্বরূপ বা উৎস সম্বন্ধে স্বয়ং কবিরাও সচেতন ছিলেন না সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই। সেই কারণেই ওদেশে যেমন হোমার, ভার্জিল, দান্তে প্রমুখ কবিরা দেবী Muse-এর বন্দনা করেছেন, এদেশেও ভারতীয় কবিরা তেমনি করেছেন সরস্বতী-বন্দনা। সপ্তদশ শতকের কবি মিল্টন করেছেন "Heavenly Muse"-এর বন্দনা আর ১৯শ শতকের বাঙলার কবি মাইকেল 'তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা'—ব'লে প্রকারান্তরে সেই Muse-এরই বন্দনা বা স্তুতি করেছেন।

মজার ব্যাপার এই, যে-প্লেটো তাঁর প্রস্তাবিত রিপাবলিক থেকে কবির নির্বাসন চেয়েছিলেন সেই প্লেটোই তাঁর পরবর্তী তিনখানি গ্রন্থে গুরু সক্রেটিসের প্রমুখাৎ দেবী মিউজের বন্দনা না করিয়ে ছাড়েন নি। যতই তিনি কবিদের নিন্দা করুন না কেন কবি প্রতিভাকে তিনি এক ধরনের দিব্যোন্মাদনা বলতে চেয়েছেন (Madness which is heaven-sent)। এই দিব্যোন্মাদনা থেকেই হয়ত একদিন তমসা তীরে পরিভ্রমণরত বাল্মীকির মুখ থেকে প্রথম কাব্যবাণী নিঃসৃত হয়েছিল—'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদি……।

কিন্তু সাহিত্য চর্চার ভাবনামূলে শুধুই কি দিব্য প্রেরণা? চেষ্টা, যত্ন ও শ্রমের কি কোনই ভূমিকা নেই? আলংকারিকেরা কে কি বলেন দেখা যাক।

দন্ডী প্রতিভাকে "নৈসর্গিকী" বলেছেন, বামন বলেছেন "কবিত্ববীজ" আর রাজশেখর বললেন "মানস-প্রত্যক্ষ"। কিন্তু এরা এখানেই থামেন নি। আরও বলেছেন যে প্রতিভার জন্য প্রয়োজন 'ব্যুৎপত্তি' ও 'অভ্যাস'। রাজশেখর এই দুটোকে স্বীকার ক'রে নিয়েও প্রতিভাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন: ১. 'কারয়িত্রী' ২. 'ভাবয়িত্রী'। ভট্টতৌত প্রতিভাকে বললেন 'নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা' আর অভিনব গুপ্ত বললেন "অপূর্ব বস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা।'

আসলে কবিরাও যে বিশেষ ঐতিহাসিক দেশকাল খণ্ডের সমাজান্তর্গত মানুষ,

সমাজের সংগে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্রেই যে তাঁদের কবি প্রতিভার বিকাশ ও বিবর্ধন ঘটে, এ বিশ্বাস পূর্বে ছিল না বলেই কবি প্রতিভা সম্পর্কে নানা অ-লৌকিক কাহিনী ও মতবাদের জন্ম হয়েছে। তাই তো বলা হয় মহামূর্খ কালিদাস সরস্বতীর বরেই মহাকবি, এবং "তব বরে চোর রত্নাকর কাব্যরত্নাকর কবি।"

প্লেটোর 'আইয়ন'-এ সক্রেটিস্ ও আইয়নের কথোপকথনচ্ছলে কবির ওপর দৈবীশক্তির প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ গ্রীক 'এনথিয়স্মস্' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল enthusiasm. গ্রীক 'থিয়স্' শব্দের অর্থ দেবতা। তাই এনথিয়স্মস্ কথাটির অর্থ দাঁড়াল কবির ওপর দেবতার প্রভাব। অর্থাৎ কবির ওপর দেবতা বা দৈবীশক্তি ভর করলেই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। তাই প্লেটোর মতে কবিপ্রতিভা হ'ল এক ধরণের 'দৈবী উন্মাদনা'।

পরবর্তীকালে কবি শেলী প্লেটোর 'আইয়ন' অনুবাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর Defence of Poetry-তে আইয়নের উক্তিটুকুকে নিজের উক্তির সপক্ষেই ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তাঁর 'Skylark' কবিতায় তিনি যে 'harmonious madness'-এর কথা বলছেন তা সম্ভবত, সক্রেটিস্-প্লেটোর প্রভাবেই ঘটেছে।

অ্যারিস্টটল অবশ্য দৈবী শক্তির প্রভাবের কথা বলেন নি। তবে Poetics গ্রন্থের ১৭শ অধ্যায়ে একস্থলে একবার মাত্র বলেছেন যে কবিরা হয় ভাবগ্রাহী, নয় তো ভাবোন্মাদ। তবে এই উন্মাদনা নিয়ে তিনি আলোচনা করতে বসেন নি। তাঁর মতে অনুকরণ করার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। সেই অনুকরণ প্রবৃত্তি থেকেই কাব্য-সাহিত্যের জন্ম। তবে সে অনুকরণ বাস্তব জগতের যথাযথ অনুকরণ নয়, বস্তুজগৎ কবিচিত্তে যে কল্পনাজগৎ সৃষ্টি করে সেই কল্পনা জগতের অনুকরণই সাহিত্য। অনুকরণ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অ্যারিস্টলের মৃত্যুর তিনশ বছর পরে ল্যাটিন সাহিত্য সমালোচক হোরেসের আবির্ভাব। তিনি তাঁর Ars Poetica বা Art of Poetry গ্রন্থের শেষাংশে কবির গুণাবলী ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হোরেস প্লেটোর মতো বিশ্বাস করতেন না যে কবির ওপর দৈবীশক্তির ভর হ'লেই কাব্য সৃষ্টি হয়। Divine madness বা দৈবী উন্মাদনার কথা তিনি স্বীকার করেন নি। তবে কবির সৃষ্টির পশ্চাতে প্রেরণার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি স্বীকার করেছেন। যে কোন লোক কবি হ'তে পারেন না প্রেরণা নেই ব'লেই। প্রেরণা এবং উন্মাদনা এক বস্তু নয়। কবির কর্তব্য জীবনকে সহজ ও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা। কারণ কাব্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁর মতে, "I would advise the well instructed imitator to take his model from life and custom and from this derive language faithful to life." কিন্তু প্রতিভা কি সত্যই কোনও অ-লৌকিক বা অতি-লৌকিক ঈশ্বরপ্রেরিত দৈব ব্যাপার? না, মানব-জীবনের কোনও

বিশেষ পরিবেশ-পটভূমিতে এর মূল কেন্দ্র নিহিত ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য আলঙ্কারিকেরা দিতে পারেন নি।

২

এতাবৎ প্রচলিত ধারণা ছিল কবিপ্রতিভা বা শিল্প সৃষ্টির কৃতিত্ব ঐশ্বরিক শক্তি-বিশেষ বা প্রাকৃতিক ব্যাপার-বিশেষ অথবা পূর্ব জন্মার্জিত কোন সুকর্মের ফল এবং এর কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রতিভাবান মানুষের মধ্যে এ কৃতিত্ব জন্ম থেকেই নাকি থাকে এবং যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করে। এবং এটি আয়ত্তগম্য বা চেষ্টাকৃত কোন ব্যাপারও নয়। যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। আরও ধারণা ছিল যে বিশেষ কোন মানুষের শারীর ও মানস গঠনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা দৈবীশক্তি নিহিত এবং তিনিই প্রতিভাবান। প্রমথ চৌধুরীর একদা কলেজপাঠ্য সুপরিচিত 'মন্ত্রশক্তি' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তবে এ্যারিস্টটলই হয়ত প্রথম ব্যক্তি এতকাল আগের লোক (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক) হয়েও যিনি দৈবী প্রেরণার কথা না বলে মানুষের অনুকরণেচ্ছার (মাইমেসিস্) প্রতিই সর্মাধক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

কিন্তু কবি মানুষটি যেমন বস্তু বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি কবিপ্রতিভা এবং কবি প্রতিভার গুণগত উৎকর্ষটিও কখনোই বস্তু বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সর্বৈব ব্যতিক্রমধর্মী বা exceptional কোন ব্যাপার হ'তে পারে না। তবে একথা ঠিক যে সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতা সকলের থাকে না, সেটি সুলভ ব্যাপারও নয়।

কবিপ্রতিভা অবশ্যই এক ধরনের কর্মদক্ষতা। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এক এক ধরনের কাজে একেক ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয়। প্রতিভা এক ধরনের কর্মদক্ষতা হ'লেও শুধু এই কথা বললে তাকে বোঝানো যাবে না। যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একজন লোককে গাড়ী চালানো হয়ত শেখানো যায়, কিন্তু কি ক'রে সার্থক কাব্য লিখতে হয় তা শেখানো কঠিন। কঠিন শুধু নয়, অসম্ভব ব্যাপার। হয়ত তাকে পদ্য শেখানো যায়, ছন্দ-অলঙ্কার শেখানো যায়, কিন্তু কাব্য লেখা নৈব নৈব চ।

এই কারণেই বোধ করি লোকের মধ্যে একটা রহস্যজনক, দুর্বোধ্য, বিচার শক্তিহীন, অযৌক্তিক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সাহিত্যিক-প্রতিভা জ্ঞান-বুদ্ধি বিচারের অতীত এক অ-লৌকিক ব্যাপার। আলংকারিকদের ভাষায় 'অপূর্ব বস্তু'।

৩

আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে দুটো কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার।

১. কাব্যের বহিরাঙ্গিক বিষয়, যা সহজ সাধ্য, তা শিক্ষা দেওয়া যায়। যেমন শব্দার্থজ্ঞান, ছন্দ-অলংকার-বোধ এবং পদ্য লেখার রীতি-নীতি-নিয়ম ইত্যাদি। ফলে আমাদের দেশে এবং সর্ব দেশেই অশিক্ষিত পটুত্বের বলে লোককবি বা কবিওয়ালা বা তর্জাওয়ালা জাতীয় পদ্যরচয়িতার

অজস্র সাক্ষাৎ মেলে। এই ধরনের পদ্য রচনা সামান্য শিক্ষা ও যত্ন সাপেক্ষ। কিন্তু যা কাউকে শেখানো যায় না তা হোল নতুন কিছু আবিষ্কার করা। তাই প্রতিভাকে বলা হয় 'নব নবোন্মেষশালিনী শক্তি'।

২. অন্যান্য সৃষ্টিমূলক কাজের মতো শিল্পসৃষ্টিও যত্ন, শিক্ষা ও শ্রম সাপেক্ষ। দেখা যায় অনেক লেখকই অল্প বিস্তর প্রতিভাবান। কিন্তু যত্ন, নিষ্ঠা ও শ্রমের অভাবে তাঁরা মহৎ শিল্পীতে পরিণত হ'তে পারেন নি। কাণ্ট genius বা প্রতিভাকে বলতে চেয়েছেন "a talent academically trained, so that it may be employed in such a way as to stand the test of judgement." অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে অর্জন ছাড়া শুধু প্রেরণায় কাজ হয় না।—"শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে জীবনকে দেখবার নবীনত্ব বা বৈশিষ্ট্য যেমন থাকা চাই অর্থাৎ জীবনের মধ্য থেকে নতুন কিছু আবিষ্কার করা চাই, তেমনি সেই শক্তিকে অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা অর্থাৎ শ্রমের সাহায্যে মহত্তর বৃহত্তর শিল্পশোভন রূপমূর্তি দান করা চাই। কিন্তু সবচেয়ে দুরূহ ও জটিল ব্যাপারটা হ'ল প্রতিভাবান ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক গঠন-প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন কোন বিশিষ্টতা আছে কি যা' অন্য সকলের চেয়ে তাঁকে পৃথক করে তুলেছে?

৪

মনস্তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ বলেন যে সৃষ্টিমূলক ব্যক্তিত্ব-শক্তির গঠনমূলে রয়েছে তিনটি জিনিসের যোগফল। যথা ঃ

১. স্বজ্ঞা বা Intuition.
২. যুক্তি পরম্পরাগত চিন্তা ও কার্য বা Discursive Power.
৩. ক্রিয়াশীলতা বা Activity.

এর মধ্যে তৃতীয় ব্যাপারটি অর্থাৎ 'ক্রিয়াশীলতা' না হয় বোঝা গেল। দ্বিতীয় ব্যাপারটিও দুর্বোধ্য নয়। তা হোল মানুষের আবেগ ও বাস্তব-জ্ঞানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জনিত কার্যাবলী অর্থাৎ যুক্তি-পারম্পর্য-পূর্ণ চিন্তা ও কার্য। কিন্তু 'স্বজ্ঞা' ব্যাপারটি আপাততঃ অস্পষ্ট থেকেই যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই 'স্বজ্ঞা' বা intuition-এর নামান্তর। তবুও এ কথার মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা বা রহস্যময়তা এখনও থেকেই যাচ্ছে। মানবচিত্তের চৈতন্যময় সত্তা অথবা আমাদের রক্তে রক্তে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার—ইত্যাদি নামেও তাকে কেউ কেউ বোঝাতে চেয়েছেন।

৫

কিন্তু প্রশ্ন হোল সৃষ্টিমূলক কাজে তার ভূমিকা কি ?

আসল কথা, মানব সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ বস্তুবিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব চেতনার স্তরেও নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। (মার্ক্স বলেছেন বস্তুবিশ্বকে পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদেরও পরিবর্তিত করি)। সেই পরিবর্তনের ফলেই মানব-চৈতন্যের ভিত্তিভূমিতে 'স্বজ্ঞা'-র জন্ম ও অধিষ্ঠান। সৃষ্টিমূলক কাজে মানব-চৈতন্যই যেহেতু প্রধান, সেহেতু সৃষ্টিমূলক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'স্বজ্ঞা'-র ভূমিকা বস্তুবাদী দর্শনে অস্বীকৃত নয়।

৬

কাজেই এটিকে 'প্রস্তাব' বা Premise হিসাবে ধ'রে নিয়ে চিন্তামূলক ও সৃষ্টিমূলক সমস্ত কার্যের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। V. F. Asmus তাঁর The Question of Intuition in Philosophy and Mathematics' গ্রন্থে বলেছেন যে '......Without special mathematical iniuition creativity is impossible in Mathematics, the most rigid of all Sciences.' এখানে 'Creativity' অর্থ নতুন কিছু আবিষ্কার এবং 'আবিষ্কার'-এর অর্থই হ'ল জানা থেকে অজানার সন্ধানে আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া। এখানে 'অজানা' শব্দের অর্থ ভাববাদীদের মতো 'অজ্ঞেয়' (unknowable) নয়, 'অজ্ঞাত' (unknown)। আমাদের চেতনার কাজই হল অজানাকে জানার কাজ। সভ্যতা ও সমাজবিকাশের ক্রম অগ্রগতিতে এই কাজ নিরন্তর চলেছে। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মেই চ'লেছে। ফলে আমরা নতুন নতুন তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করতে পারছি।

বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য—উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিভার যে স্বাভাবিক ভিত্তিভূমি তা এক ও অদ্বিতীয় 'স্বজ্ঞা' বা Intuition, এই 'স্বজ্ঞা'-ই মানুষের সহজাত সৃষ্টিশক্তি—এই সৃষ্টিশক্তি আকাশ থেকে আকস্মিক দৈববাণীর মতো আসে নি, হাজার হাজার বছর ধ'রে মানব-সমাজের বস্তুবাদী বিকাশের স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়েই এসেছে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে শিল্পী-প্রতিভার বিশিষ্টতা বা অদ্বিতীয়ত্ব নির্ভর করছে ব্যক্তির প্রাক্-নির্দিষ্ট শারীর-মানস-প্রক্রিয়ার ওপরে শুধু নয়, তাঁর 'স্বজ্ঞা'র অদ্বিতীয়ত্বের ওপরেও। তাই ব'লে এই অদ্বিতীয় স্বজ্ঞাশক্তির আলোচনা করলেই কবিপ্রতিভার স্বরূপ নির্ধারিত হয়ে যাবে না। শুধু কবিপ্রতিভার স্বরূপ সন্ধানের প্রাথমিক পর্বে আমরা পৌঁছতে পারব মাত্র। তার বেশি নয়। গভীরে প্রবেশ করবার আগে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে।

৭

প্রথমতঃ দু'ধরনের 'স্বজ্ঞা'-র কথা আমরা জানি। ১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ২. বুদ্ধিগ্রাহ্য।

প্রথমটি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র দ্বারা আমরা শব্দ-স্পর্শ-দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ ইত্যাদির মাধ্যমে বস্তুজগতের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ ক'রে থাকি, দ্বিতীয়টির দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র দ্বারা আমরা সেই বস্তুসত্যকেই মস্তিষ্কগম্য অর্থাৎ বুদ্ধিগম্য করে তুলি। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উভয়বিধ স্বজ্ঞা-ই প্রতিনিয়ত প্রযুক্ত হচ্ছে।

অনেকের ধারণা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বজ্ঞা-ই বোধকরি ক্রিয়াশীল। যদি তা-ই হ'ত তবে সাহিত্যসৃষ্টি অতি সুলভ ও সহজ ব্যাপার হ'য়ে যেত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু বোধ তা-ই সাহিত্য পদবাচ্য হ'ত। কিন্তু এভাবে দেখাটা অর্থাৎ শিল্পগত স্বজ্ঞার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করাটা একদেশদর্শিতা বা একপেশে দৃষ্টিরই নামান্তর।

আসলে স্বজ্ঞা-র অদ্বিতীয়ত্ব গড়ে ওঠে এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতার সংমিশ্রণ বা একীভবনের ওপর। বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাপারকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলাই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যকার প্রকাশ কলার বিষয়। অর্থাৎ বস্তুজগৎ লেখকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগতে রূপান্তরিত হয় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। সেই সাহিত্য সৃষ্টি আবার পাঠকের মধ্যেও অনুরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ সৃষ্টি করে তোলে। এবং সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ পাঠকের মনে বস্তু বিশ্বকেই আলোকিত করে তোলে। প্রক্রিয়াটি অনেকটা নিম্নরূপ :

বস্তুজগৎ > লেখক (ইন্দ্রিয় + বুদ্ধি) > পাঠক (ইন্দ্রিয় + বুদ্ধি) > বস্তুজগৎ

অর্থাৎ

বস্তুজগৎ > লেখকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ + বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ > পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ + বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ > বস্তুজগৎ।

অর্থাৎ

বস্তুসত্য > লেখক > সৃষ্টিকর্ম > পাঠক > বস্তুসত্য।

শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র ভূমিকাই অবশ্য মুখ্য। তাই বলে বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞা-র ভূমিকাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। শিল্পের বুদ্ধিগ্রাহ্যতা হ'ল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারই শিল্পশোভন ভদ্রভব্য বেশ মাত্র। দুয়ে মিলিয়েই তার পূর্ণতা, শোভা ও সৌন্দর্য। ভদ্রভব্য পোশাক পরা মানুষ যেমন সুন্দর ও শোভন, অনেকটা সেইরকম। অর্থাৎ ভেতরের রক্তমাংসের সজীব মানুষটা যেন শিল্পের 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা' এবং তার পোশাক-আশাক এবং সুরুচি-সংযমটা যেন তার 'বুদ্ধিগ্রাহ্যতা'।

৮

এছাড়া, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার স্বজ্ঞা-জনিত সামগ্রিক জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা স্টাইলের সম্পর্কও সুনিবিড়। স্টাইলের রহস্য ব্যক্তিত্ব-শক্তির

মর্মমূলেই নিহিত ; যে ব্যক্তিত্ব-শক্তি লেখকের সমকালীন যুগ, সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্টাইল সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। তাই এখানে বাগ্‌-বিস্তার না করাই ভালো।

৯

আর একটি কথা। লেখকের অভিজ্ঞতা একান্ত ব্যক্তিগত হ'লেও তার সাধারণীকরণ না হ'লে কোন মূল্য নেই। অবশ্য লেখকের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ-শক্তি খুবই সীমিত। সাহিত্যের পাতায় যে হাজার হাজার মানুষের জীবন-পরিচয় বিধৃত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্য দিয়ে যে বর্গ-চরিত্র বা type চরিত্র সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কোন লেখকেরই প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্ভব নয় কোন ক্রমেই। কোন লেখকই শারীরিকভাবে (Physically) জীবনের সর্বত্রগামী হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় 'আমার কবিতা জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'

তবু লেখককে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ যুগের বিশেষ শ্রেণীর 'টাইপ' চরিত্র বা 'বর্গ' চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। সেটি কি ক'রে সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল লেখক তাঁর সীমিত অভিজ্ঞতার ক্ষতিপূরণ করে থাকেন প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের অর্থাৎ কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে। এই অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ তিনি ক'রে থাকেন বইপত্র-সংবাদপত্র প'ড়ে, পরিচিত পরিমণ্ডলের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ও গল্প শুনে। তবুও শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই। যাঁর জীবন-সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যত বিচিত্র ও ব্যাপক, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিও তত বিচিত্র ও জীবনরসাসিক্ত। মানবরস বা human interest যাঁর রচনায় যত বেশি থাকবে পাঠকের সঙ্গেও তাঁর সাধারণীকরণ তত বেশি ঘটবে।

১০

এখানেই বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাহিত্যিকের পার্থক্য। বিজ্ঞানীকে প্রত্যক্ষ তথ্যের ভিত্তিতেই অগ্রসর হ'তে হয়, আর সাহিত্যিক অনুমান ও কল্পনার ওপর অর্থাৎ পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে পারেন। কোন পরিচিত ব্যক্তি বা চরিত্রকে তিনি মডেল হিসেবে নিয়ে তার কথাবার্তা, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ ইত্যাদি অবলম্বনে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র পুনর্গঠন (reconstruct) বা সৃষ্টি করতে পারেন যার মাধ্যমে মানবজীবনের মর্মোদ্‌ঘাটন সম্ভব।

আসলে লেখককে অনেক—অনেকখানি কল্পনা বা 'guess work' করে নিতে হয়। কল্পনায় তাঁকে বিশেষ যুগের, বিশেষ চরিত্রের মর্মস্থলে অনুপ্রবেশ করতে হয়।

কি বাস্তব জীবনভিত্তিক সামাজিক কাব্য-উপন্যাস-সাহিত্যে কিংবা ঐতিহাসিক কাল্পনিক রোমান্স-রস-সৃষ্টিতে—উভয়ত্রই। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস-সমূহে লেখক যে ঐতিহাসিক যুগ-পরিবেশ ও ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেখানে কল্পনার সাহায্যেই যেতে হয়েছে। বর্ণিত যুগের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, সেযুগের মানুষের পোশাক-আশাক, আহার-বিহার, সুখদুঃখ-হাসিকান্না-কাম-প্রেম-লোভ-মোহ-ঈর্ষা-বেদনা ইত্যাদি তাঁকে বাস্তবসম্মত বিশ্বাসযোগ্য আকারে তুলে ধরতে হয়েছে। এজন্য লেখককে দিনের পর দিন অসাধারণ পরিশ্রম করে ঐতিহাসিক তথ্যপুঞ্জ থেকে জীবন সত্য আবিষ্কার করে কল্পনাজগৎ তৈরী ক'রে নিতে হয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক গল্পে (শঙ্খকঙ্কন, গৌড়মল্লার, ইন্দ্রতুলক, তুঙ্গভদ্রার তীরে, তুমি সন্ধ্যার মেঘ) দেখি লেখক ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জ অবলম্বনে এক অপূর্ব কল্পনার জগৎ তৈরী ক'রে নিয়েছেন। ফলে লেখকের হাত ধ'রে আমরা অতীতের সেই রাজ্যে চলে যাই যখন মানুষ ছিল; তাদের বিচিত্র জীবনচর্যা, জীবনযন্ত্রণা, সুখদুঃখ-ঈর্ষা-বেদনা-কাম-প্রেম নিয়েও মানুষ ছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসের বাস্তব তথ্য লেখকের মনোরাজ্যে তাঁর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা ও বুদ্ধি-গ্রাহ্যতার সঙ্গে মিলে মিশে এক 'স্বজ্ঞা' বা intuition -এর জগৎ সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য সেই স্বজ্ঞার সৃষ্টি। সাহিত্যিক প্রতিভা সেই স্বজ্ঞা-শক্তিরই প্রকাশ,—কোন অলৌকিক অতিলৌকিক দৈব ব্যাপার নয়।

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। ইতিহাস পড়ে বা বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য শক্তির সাহায্যে সবাই কেন কল্পনাজগৎ তৈরী করে নিয়ে লেখক হতে পারেন না! এখানেই এক মনস্তাত্ত্বিক রহস্য বা ধাঁধাঁ রয়ে গেছে।

গোর্কীর 'মা', 'আর্তমানভ্স', 'লোয়ার ডেপথ্স' প্রভৃতি রচনায় বাস্তব জীবনের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই সেটি লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত 'স্বজ্ঞা'-রই সৃষ্টি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু তা' অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত কখনোই হ'তে পারে না। হ'লে এমন জীবন্ত ও বাস্তব হ'তে পারত না। তারাশঙ্করের গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, কালিন্দীতে পল্লী বাঙ্লার যে জীবননিষ্ঠ বাস্তবচিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা' লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই ফসল। তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে গ্রামীণ জীবনের এমনতরো অভিজ্ঞতা ত' আরও অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে! তবে তাঁরা কেন গোর্কী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর হ'তে পারেন না?

১১

আসলে লেখকের স্বজ্ঞা-শক্তির অদ্বিতীয়ত্বের ওপরই প্রতিভার অদ্বিতীয়ত্ব গড়ে ওঠে। অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের মধ্যে

যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞা-শক্তির জন্ম দেয় তা' একদিনের ব্যাপার নয়, ধীরে ধীরে লেখকের মনোজগতে অর্থাৎ চেতনার স্তরে স্তরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-মূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই স্বজ্ঞা-শক্তির অদ্বিতীয়ত্ব গড়ে ওঠে। এটি এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার হলেও কোন দৈব ব্যাপার কোনক্রমেই নয়।

১২

এইবার, প্রতিভার সঙ্গে শ্রমনিষ্ঠার সম্পর্কের প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

একথা খুবই সত্য যে সকল দেশের প্রতিভাবানকেই অনন্যসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। কার্লাইল সেইজন্য প্রতিভার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, '**Capacity for taking infinite pains**', আন্তন্ শেখভ যাকে ব'লেছেন, 'পিঠ-ভাঙ্গা খাটুনি' (**back-breaking intensity**)।

ফরাসী সাহিত্যিক **Emile zola** ও তাঁর শিল্পীবন্ধু **Cezane** (সেজান) প্যারীর একটা তেতালা বাড়ীর ওপরে বইপত্রে ঠাসা এক ছোট্ট ঘরে থাকতেন আর দুয়ে মিলে সাহিত্য-শিল্পচর্চা করতেন। কি পরিশ্রমটাই না তাঁরা করেছেন! তাঁদের জীবনী না পড়লে তা' জানা যায় না। ঘরের দেয়ালে তাঁরা লিখে রাখতেন, '**Nula dies sine Linea**', কথাটা ফরাসী। এর ইংরেজী মানে হল '**No day without a line.**' অর্থাৎ একটা দিনও তাঁরা এক লাইন না লিখে কিংবা এক আঁচড় ছবি না এঁকে ছাড়বেন না। এই নিষ্ঠাই এঁদের দুই বন্ধুকে সার্থক শিল্পী সাহিত্যিক ক'রে তুলেছিল। আমেরিকান লেখক হেমিংওয়ে তাঁর '**The Old man and the Sea**' বইটার জন্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বইটা নাকি তিনি দু'শ বার লিখে লিখে বদ্‌লেছেন, তারপর ছাপতে দিয়েছেন। কথাটা আমাদের মতো শ্রমবিমুখ বঙ্গ সন্তানের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে, কিন্তু জাত সাহিত্যিকের পক্ষে এ শ্রমনিষ্ঠা স্বাভাবিক।

Tolstoy এত বড়ো মহৎ শিল্পী হয়েছিলেন শুধু অভিজ্ঞতা-সম্পদে নয়, জীবনবোধের গভীরতায় শুধু নয়; তাঁর অতিমানবিক শ্রমনিষ্ঠার জোরেও। তাঁর মহত্তম সৃষ্টি **War and Peace** উপন্যাসখানা লিখবার আগে নেপোলনীয় আক্রমণ-কালীন রুশিয়াকে জানবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তা' ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছেও পরম বিস্ময়ের বিষয়। মস্ত বড়ো এক ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত কাগজপত্রের মধ্যখানে ব'সে তিনি লিখতেন—কী অসাধারণ নিষ্ঠা, কি পরিশ্রম, কি ধৈর্য, ভাবলে আশ্চর্য বোধ না করে পারা যায় না।

ফরাসী লেখক **Balzac**-এর জীবনও অসাধারণ শ্রমনিষ্ঠা ও নিরলস সাধনার ইতিহাস। অতি শ্রমের ফলে ত তিনি অকালেই মারা গেলেন। আমাদের দেশের মাইকেল মধুসূদনও কি কম পরিশ্রমটা করেছিলেন? ১৮৪৯ সালে ১৮ই আগস্ট

মাদ্রাজ থেকে বন্ধুকে লেখা এক পত্র থেকে জানা যায় যে সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত তিনি হিব্রু, গ্রীক, তেলুগু, সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা কি অধ্যবসায় সহকারেই না শিক্ষা করেছেন! "I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12—2 Greek, 2—5 Telegu and Sanskrit, 5 to 7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?"

কাজেই প্রতিভার সঙ্গে শ্রমনিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত। সেই জন্য বোধ করি বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন যে 'Genius is ninety nine percent perspiration and one percent inspiration.'

১৩

দেশী-বিদেশী সাহিত্যিকদের দৃষ্টান্ত আরও ভুরি ভুরি তোলা যায়। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই।

তাহলে, সাহিত্যিক প্রতিভার স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখা গেল যে, লেখকের অদ্বিতীয় স্বজ্ঞা-শক্তি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বস্তু-বিশ্বের সমাজ-পরিবেশ থেকেই এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে যদি অসাধারণ শ্রমনিষ্ঠা যুক্ত হয় তবেই তার সার্থক প্রকাশ ঘটে। কাজেই সাহিত্যিক প্রতিভার মধ্যে কোন অলৌকিক, অতিলৌকিক বা ঐশ্বরিক ব্যাপার নেই, তা নিতান্তই বাস্তবিক এবং মানসিক (Psychological) ব্যাপার। লেখক-চিত্তে বস্তু ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বমূলক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তা' গড়ে ওঠে।

সাহিত্যের স্টাইল : প্রচলিত ধারণা ও বস্তুবাদী বিচার

১

স্টাইল কথাটার ঠিক বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ নেই। যে কথাগুলো দিয়ে সাধারণতঃ Style কথাটা বাঙ্‌লায় বোঝাবার চেষ্টা হয়ে থাকে সেগুলো হ'ল রীতি, ভঙ্গি, ঢঙ্‌, ছাঁদ, ধাঁচ, চাল, বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। কিন্তু উদ্ধৃত শব্দগুলির কোনটিতেও Style কথাটার মূল রহস্য ধরা পড়েনি। এ কথাগুলো নেহাৎই বহিরাঙ্গিক। স্টাইল হ'ল লেখকের গভীর গহন ব্যক্তি-চৈতন্যের তথা বিশেষ যুগের সংস্কৃতির বাঙ্‌ময় প্রকাশ এবং ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাষাকে অতিক্রম করে যে গুণ সাহিত্যকে সত্যিকার সাহিত্য করে তোলে তা-ই স্টাইল, সেটিই আমাদের আলোচ্য।

Style কথাটার লাতিন-ব্যুৎপত্তিগত (Stilus) অর্থ হোল লৌহশলাকা বা লোহার কলম। মজার ব্যাপার এই যে, এই বহুল প্রচলিত খুব সহজ কথাটা (Style) এবং এই অতি পরিচিত জিনিসটা (কলম) সাহিত্যের সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং সব থেকে দুরূহ বিষয়ের নামে প্রযুক্ত হয়েছে।

স্টাইল কথাটির প্রয়োগসীমাও খুব প্রসারিত। সাহিত্য ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পে, মানুষের বৃহৎ জীবনের বহু বিচিত্র কর্মে এ কথাটির প্রয়োগব্যাপ্তিও লক্ষ্য করবার মতো। যথা, লেখার স্টাইল, বলার স্টাইল, চলার স্টাইল, নাচের স্টাইল, পোশাক-পরিচ্ছদে স্টাইল, আচার-ব্যবহারে স্টাইল, চিত্রে-সংগীতে-ভাস্কর্যে-সাহিত্যে-শিল্পে-অভিনয়ে—সর্বত্রই স্টাইল কথাটির বহুল ব্যবহার। ফলে কথাটি এর গূঢ়ার্থ এবং সাহিত্যিক তাৎপর্য অনেক পরিমাণে হারিয়ে খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে। স্টাইল ও ফ্যাশানকে আমরা, তাই, অনেক সময় সমার্থক ক'রে ফেলি। 'শেষের কবিতা'য় অমিট রে'র মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ফ্যাশন হোল মুখোস, স্টাইল হোল মুখশ্রী।" এই মুখোস ও মুখশ্রীকে আমরা এক ক'রে ফেলি। ফলে, সাহিত্যের রাজ্যে নতুন বা উদ্ভট এবং চটকদার কিছুর আবির্ভাব ঘটলেই আমরা তার 'স্টাইল' নিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাতে থাকি। কিন্তু 'স্টাইল' ব্যাপারটি অত সুলভ নয়। স্টাইল কথাটির স্বরূপ-বিশ্লেষণ খুবই দুরূহ ব্যাপার এবং আমাদের বোধ ও বোধির পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে প্রতারক। সজাগ সমালোচক এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

২

স্টাইল সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কি প্রথমে সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা সেরে নেওয়া যাক। অনেকে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত "রীতিবাদের" সঙ্গে স্টাইলকে সমার্থক ক'রে দেখেন। কিন্তু রীতিবাদের মধ্যেও অপূর্ণতা আছে,—যা Style কথায় নেই। রীতিবাদের প্রবক্তা বামন (৮ম / ৯ম শতাব্দী) বলেছেন, 'রীতিরাত্মা

কাব্যস্য' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা রীতি। আর রীতি কি, না, "বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।" এবং 'বিশেষো গুণাত্মা' অর্থাৎ কিনা রীতির আত্মা গুণ—ওজঃ মাধুর্যাদি গুণ। কিন্তু কোন্ শক্তিতে যে পদরচনা বিশিষ্টতা লাভ করে এবং কোন শক্তিতেই বা পদসমূহ ওজঃ-মাধুর্যাদি গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে বামন কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেন নি। রীতির প্রসঙ্গেই গুণের ও দোষের কথা এসেছে। সাধারণতঃ দশটি গুণ ও দশটি দোষের কথা এঁরা বলেছেন। বামন রীতিকে গুণানুসারে তিনভাগে ভাগ করলেন : বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। প্রধানতঃ ওজঃ ও প্রসাদ এবং গৌণতঃ অন্যান্য গুণে ভূষিত রীতির নাম বৈদর্ভী। ওজঃ এবং কান্তি গুণে ভূষিত রীতি হ'ল গৌড়ী এবং মাধুর্য ও সৌকুমার্যে ভূষিত রীতির নাম দেওয়া হ'ল পাঞ্চালী। প্রথমতঃ দেশের নামে রীতির নামকরণ করা হ'লেও দেশভেদে নয়, কার্যত গুণভেদেই রীতির নামকরণ করা হয়েছে। রাজশেখর বৈদর্ভী রীতিকে শ্রেষ্ঠ রীতি বললেও আর এক নতুন রীতির কথাও তিনি বললেন—মৈথিলী। ভোজ ও রুদ্রট আরও দুটি রীতির কথা বললেন—আবন্তিকা ও মগধী। এভাবে রীতির সংখ্যা বেড়েই চলল।

কুন্তক অবশ্য একটু নতুন কথা শোনালেন। তিনি বললেন যে কবিস্বভাব ভেদেই কাব্য রীতির ভেদ ঘটে থাকে। এ মত অবশ্য অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কারণ তা হ'লে ত' প্রত্যেক কবির স্বভাব অনুযায়ী অজস্র রীতির ভেদ গ'ড়ে উঠবে। এটি অবশ্য আলংকারিকদের কাম্য ছিল না। তাঁরা দোষগুণের ওপর জোর দিয়েই রীতির ভেদ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কুন্তক যে সেই যুগে কবিস্বভাব বা কবিব্যক্তিত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এ যুগে আমাদের কাছে সেটিই বড়ো প্রাপ্তি। তবে তিনি স্টাইলের রহস্য খানিকটা যেন ধরতে পেরেও এর রহস্য ভেদ করতে পারেন নি। এজন্য তাঁর এবং তাঁর মতো আরো অনেক আলংকারিকের কাব্য-দেহাত্মবাদিতাই দায়ী। অর্থাৎ কাব্যদেহের বহিরাঙ্গিক প্রকরণ-প্রক্রিয়া নিয়েই এঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ। অন্তরের অন্তঃপুরে এঁরা প্রবেশ করতে পারেন নি। সাহিত্যদর্পণ-কার ত' 'স্পষ্টতঃই বলেছেন, "অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ, রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ।" প্রাগাধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে স্টাইল বলতে যা বোঝায় তার যদি কোনও মিল সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নেহাৎ খুঁজতেই হয়, তবে আমার মতে তা' ধ্বনিবাদীদের ও বক্রোক্তিবাদীদের আলোচনাতেই অন্ততঃ কিছুটা হয়ত বা পাওয়া যাবে। কারণ, একমাত্র তাঁরাই শব্দের অর্থশক্তিকে ছাড়িয়ে আরো অনেকখানি গহন প্রদেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তবুও পাশ্চাত্ত্য-দৃষ্টি এবং এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার পার্থক্য বিস্তর। সে আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। অতএব এখানেই ক্ষান্ত হওয়া যাক।

৩

ওদেশে সাহিত্যের স্টাইল সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলেছেন। সব মতগুলো নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, করে লাভও নেই।

Matthew Arnold-এর সর্বজনপ্রিয় অথচ ব্যবহার-মলিন সাহিত্যের (স্টাইলের নয়) সংজ্ঞাটির কথা প্রথমে ধরা যাক।—Literature is the criticism of life,' এই কথাটাকেই Hudson আরও বিশদ ক'রে যা' বলেছেন, সেটি প্রণিধানযোগ্য।—"It is an interpretation of life as life shapes itself in the mind of the interpreter (writer)."—এই কথার মধ্যেই Style-এর আভাস খানিকটা যেন রয়েছে। অর্থাৎ জীবন সমালোচনাই সাহিত্য নয়, জীবন সমালোচকের অর্থাৎ লেখকের বিশেষ মানস-দৃষ্টি, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্যশক্তিই সাহিত্য তথা স্টাইলেরও জনক। এই ভাবটিকেই Lucas বলতে চেয়েছেন এইভাবে,—"It is personality clothed in words, character embodied in speech." কিন্তু এহ বাহ্য,' এখানেই স্টাইলের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়ে গেল না। এর জন্যে আরও আলোচনার অবকাশ আছে। নিম্নে সে চেষ্টা করা গেল।

৪

স্টাইল সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান কথা হোল সেটি ব্যক্তি-বিশেষের (অর্থাৎ লেখকের) বিশেষ এক বাণীভঙ্গি যাকে Middleton Murry বলেছেন, Personal idiosyncrasy of expression by which we recognise a writer.' অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিচিহ্নটি চিনতে পারলেই তাঁর Style-ও খানিকটা ধরা যায়। কিন্তু সেইটিই সব নয়। অনেক সময় একটি বা দু'টি কিংবা কয়েকটি পংক্তি পড়লেই কোন লেখককে চেনা যায়। আবার অনেক সময় দু'চারটি পংক্তিতে চেনা শক্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমের গদ্যের কথাই ধরা যাক। এ গদ্যের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা অননুকরণীয়। কিন্তু রামেন্দ্র সুন্দরের বা অক্ষয় সরকারের বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কিংবা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি পংক্তি বঙ্কিমের ব'লে অনেক সময় চালিয়ে দেওয়া যায়। বড় জোর ১০টি কি ২০টি লাইন। কিন্তু এক/দেড় পৃষ্ঠা প'ড়ে গেলেই নকলটি ধরা পড়বে। মনে হবে এ তো বঙ্কিমের গদ্য নয় কিছুতেই। বঙ্কিমের সেই মনন-মনীষা-দীপ্ত ভাষার রাজরাজেশ্বর মূর্তি কই? ভাষার সেই আভিজাত্য কই? বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো সে গাম্ভীর্য, তেজ ও দীপ্তি কই? সেই কৌতুক-প্রফুল্ল-স্মিত-সুন্দর হাস্যের আলোকচ্ছটাদীপ্ত ভাষা কই? মনে হবে কি যেন নেই। সেটিই বঙ্কিমের নিজস্ব স্টাইল। তা' কোনক্রমেই ধার করা যায় না। একজন লোক যেমন হাজার চেষ্টা ক'রেও হুবহু অন্য লোকে রূপান্তরিত হ'তে পারে না, এও তেমনি।

কোনও প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত গায়কের কন্ঠে কোন বিশেষ একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুকরণ যখন অন্য এক অখ্যাত অথচ মিষ্টি গলায় শুনি, তখন মনে হয় সবই সুন্দর, তবু কি যেন একটা অভাব রয়েছে এর কন্ঠে। সেটিই স্টাইল—অনুভূতির প্রগাঢ়তায় এর জন্ম।

রচনার ব্যক্তি-লক্ষণ-ই যদি স্টাইল হ'ত তাহ'লে স্টাইল কথাটা খুব সুলভ বা সস্তা হয়ে যেত, বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুকরণ করলেই স্টাইল আয়ত্ত করা যেত।

৫

কিন্তু সব ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যই স্টাইল নয়। নাকা গলায় কথা বলা বা খুঁড়িয়ে চলা কারও কারও অভ্যাস,—ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপার আর যা-ই হোক স্টাইল নয়। তাহলে তো প্রত্যেক মানুষের কোন না কোন মুদ্রাদোষই Style আখ্যা পেতে পারত। এখানেই সত্যকার স্টাইল ও mannerism বা personal idiosyncrasy-র পার্থক্য।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে অধুনা-প্রায়-বিস্মৃত ও প্রায় অ-পঠিত লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষের গদ্যভাষার ফেনোচ্ছ্বাস ভাবদৈন্যের মধ্যে তাঁর ব্যক্তি লক্ষণটিকে বেশ চেনা যায়। কিন্তু তার পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও কমলাকান্তের দপ্তর, কিংবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জিজ্ঞাসা, অথবা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ, লিপিকা, শান্তিনিকেতন, জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলার গদ্য, কিংবা প্রমথ চৌধুরীর বীরবলের হালখাতার গদ্য কি এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গদ্য কি এক জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে দিব্যবিভাদীপ্ত ;—তা ব্যক্তিগত হয়েও ব্যক্তিসীমাকে ছাড়িয়ে গেছে।

৬

গদ্যের কথা থাক। কবিতার কথায় আসা যাক। ঈশ্বর গুপ্তের ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাশাপাশি তুলনা করলেও এটি বেশ বোঝানো যায়। গুপ্ত কবির প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার কথা ধরা যাক। এতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রকাশ রীতিটি, এক কথায়, তাঁর ব্যক্তি লক্ষণটি বেশ চেনা যায়। যথা—

আর তো বাঁচিনে প্রাণে, বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ্‌।
বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ্‌ একি গুমটের দাপ॥

উদ্ধৃত গ্রীষ্মের কবিতায় কবির ব্যক্তিলক্ষণটি অতি পরিস্ফুট—এটিকে নেহাৎ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ব'লেই চেনা যায়। এর পাশে রবীন্দ্রনাথের "নাই রস নাই, দারুণ দাহন বেলা" কিংবা "দারুণ অগ্নি বাণে রে, হৃদয় তৃষায় হানে রে" গান দু'টিতে ভাষার ব্যক্তিলক্ষণ বা ভঙ্গিকে ছাড়িয়েও গভীর অনুভূতির বৃহত্তর আবেগে ব্যক্তিগত সীমাবন্ধন ভেঙে গিয়েছে এবং কাব্যভাষা অপূর্ব ভাবদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহ ও ক্লান্তি, অবসাদ ও বেদনা কি এক বিশ্বব্যাপী সুরমূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছে।

কিংবা ঈশ্বর গুপ্তের একটি বর্ষার কবিতা—

সুমধুর কত সুর ভেকে গীত গায়।
ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ জলদ বাজায়॥

এ কবিতার পাশে রবীন্দ্রনাথের অজস্র বর্ষার কবিতা ও গান থেকে যে কোন একটি নেওয়া যাক ; ধরা যাক :

চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে
ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে,
লাগলো যে দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে
যে বাণী ওই ধানের ক্ষেতে
আকুল হ'ল অঙ্কুরেতে
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।—

এই দুটি কবিতাংশ পাশাপাশি তুলনা করলেই বোঝা যায় যে শুধু ব্যক্তিলক্ষণ নয়, তাকে ছাড়িয়েও আরও কিছু একটা বস্তুতেই স্টাইলের রহস্য নিহিত। তাকে এককথায় বলা যায় ব্যক্তিত্ব ও নৈর্ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক মিলন ; যা রবীন্দ্রনাথে আছে, ঈশ্বর গুপ্তে একেবারেই নেই। 'ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে' বা 'মল্লার গান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে'—এমন কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে-ই বা লিখতে পারেন ? ব্যক্তিগত হয়েও তা নৈর্ব্যক্তিক। এই নৈর্ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় লেখকের ব্যক্তিগত প্রতিভা, বস্তুগত যুগপরিবেশ ও যুগ যুগ বাহিত ঐতিহ্যধারাকে আত্মসাৎ করবার শক্তির ওপর। এ বিষয়ে পরে আলোচনায় আসছি।

৭

প্রচলিত অর্থে স্টাইল সম্পর্কে দ্বিতীয় কথা……"The power of lucid exposition of a sequence of ideas" অর্থাৎ এক কথায়, সহজ প্রাঞ্জল রচনানৈপুণ্য। কিন্তু এতেও স্টাইলের রহস্য ধরা পড়ে নি।

রচনা নৈপুণ্যই উচ্চতর স্টাইলের একমাত্র লক্ষণ নয়। অনেক সময় রচনা-নৈপুণ্য শিক্ষা ও যত্ন দ্বারা আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু যদি না তার পেছনে বিশেষ যুগের, বিশেষ সংস্কৃতির অন্তর্গত বিশেষ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি-প্রেরণা থাকে, তবে তা' শ্রেষ্ঠ স্টাইল নয় ; যত্নকৃত, চেষ্টাকৃত বা সজ্ঞীকৃত সুললিত রচনা মাত্র।

'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কথা ধরা যাক। এতে ভাষাগত, ব্যাকরণগত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আলঙ্কারিকেরা ধরেছেন, এর exposition মোটেই lucid নয়, বরং উল্টো। তবু মেঘনাদ বধ কাব্য তার স্খলন-পতন-ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও সার্থক কাব্য। এবং মেঘনাদ বধ যদি সার্থক কাব্য হয়ে থাকে তবে তার স্টাইলও তার মতই—অর্থাৎ সার্থক। আসলে ভাষার সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বড় কথা নয়, তার

পেছনে যে ব্যক্তিস্বরূপ রয়েছে সেটিই বড় কথা। এবং সেই ব্যক্তিস্বরূপের পশ্চাতে রয়েছে সমকালীন যুগ ও জীবন এবং পূর্বতন ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। আর সেই যুগ, জীবন ও ঐতিহ্য যে ব্যক্তিত্বের আধারে বিধৃত তার নাম মধুসূদন দত্ত।

মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার পশ্চাতে মধুসূদনের বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্রের উদ্দাম উচ্ছৃংখলতা, উনিশ শতকীয় নব্য বাঙালীর জীবনোপভোগের উন্মত্ত অস্থিরতা, অথচ তৎকালীন তথাকথিত রেনেসাঁসের খর্বিত ও খণ্ডিত রূপের মধ্যে নব্য বাঙালীর আশা ও আশাভঙ্গজনিত ব্যর্থতাবোধ, জীবনের আর্ত ক্রন্দন-ধ্বনি, সমকালীন যুগ-জীবনের দ্বন্দ্ব-সংশয়-সংকট-অস্থিরতা—সমস্তই যেন অমিত্রচ্ছন্দের চলোর্মি আঘাতে আমাদের হৃদয়ের তটে এসে আছড়ে পড়েছে। এ কাব্যের যা' দোষ এবং যা গুণ তার সমস্তই সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাবজাত। আবার সে ব্যক্তিত্বের গঠনমূলে রয়েছে দেশ-বিদেশের প্রাচীন সাহিত্য-মন্থনজাত সংস্কৃতির ঐতিহ্য-সম্পদ ও তৎসহ তৎকালীন রেনেসাঁস যুগ। তাই, স্টাইল শুধু ব্যক্তির নয়, বহু কালাগত ঐতিহ্যের এবং সমকালবিধৃত যুগজীবনেরও। ব্যক্তি, ঐতিহ্য ও সমকালীন যুগের একাত্মক শক্তিই স্টাইলের জনক। সে শক্তি শুধু বাইরের নয়, ভিতরেরও। তাই কেবল বাইরের ভাষা-সজ্জা বা 'ভাষার প্রসাধনকলা' দেখেই তাকে বোঝার উপায় নেই, 'অন্তরের সাধনবেগ' ও লক্ষ্য করতে হবে।

৮

যা বলছিলাম সেই কথার পূর্বসূত্র ধ'রে বলা যায় অনেক সাধারণ লেখকও শিক্ষা ও প্রযত্ন দ্বারা রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' কিংবা রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'-র ভাষা লক্ষ্য করলে এদের মধ্যে আয়াসসাধ্য যত্নকৃততার যথেষ্ট স্বাক্ষর স্পষ্টই বোঝা যায়, যাকে বলা যেতে পারে 'tour de force'. আমাদের বিশিষ্ট গদ্য-স্টাইলিস্ট্ প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের লেখায়ও এটি বর্তমান। তবে বীরবলের বেলায় যে যত্নকৃত্য সহজাত ও স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়, অন্যের বেলায় তা নয়। সযত্ন প্রয়াসের শ্রমকিণাঙ্ক তাদের লেখার ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ে।

রচনায় সযত্নকৃততা ও শ্রমনিষ্ঠা সর্বত্র নিন্দনীয় নয়। যত্ন ও শিক্ষার পালিশ সাহিত্যকর্মের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দিক নয়। সেটি নেপথ্য ঘটনা। গ্রীণরুমের ব্যাপার। গ্রীণরুম স্টেজে উঠে আসুক এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কৃত ও কাব্যঋদ্ধ গদ্য অথবা শরৎচন্দ্রের নিরাভরণ গদ্য পড়লে মনে হয় কি অনায়াস সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে এরা প্রবাহিত হয়েছে। এঁদের রচনার পশ্চাতে যত্ন ও আয়াস অবশ্যই আছে। কিন্তু সেটি নেহাৎই নেপথ্য ঘটনা, সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে তা' হাত-পা নেড়ে নিজেকে অতি প্রকটভাবে জানান

দেয় নি। ভাষা ও বিষয়বস্তু এখানে এক 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' বেণি-বন্ধনে কি রহস্যে বাঁধা পড়েছে। সেই রহস্যটিই স্টাইল।

৯

স্টাইল সম্পর্কে তৃতীয় কথা হ'ল তা ব্যক্তিচিহ্নকে সার্বভৌমতার অসীমতায় বিলীন ক'রে দেয়। M. Murry-র কথায় 'Complete fusion of the personal and the universal; ভাব ও ভাষার অর্দ্ধ-নারীশ্বর বিশেষ মূর্তির মধ্যে একাধারে যে নির্বিশেষ ও একেশ্বর শক্তির ব্যঞ্জনা তা-ই স্টাইল।

১০

প্রশ্ন হ'তে পারে স্টাইল তাহলে কিসের? উত্তর—ভাষারই স্টাইল—দৃশ্যতঃ স্টাইলের আদি ও চরম পরিচয় ভাষাতেই। তা না হ'লে ত' স্টাইল হয়ে পড়ে বায়ুভূত নিরবলম্ব বস্তু। ভাষাকে ভিত্তি করেই স্টাইল, কিন্তু ভাষার ভঙ্গিই স্টাইল নয়। অনেক সময় ভিতরের দৈন্য ঢাকবার জন্য অনেকে ভাষার কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন ক'রে থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, "শুধু ভঙ্গি দিয়েই যেন না ভোলায় চোখ।"

১১

Style সম্বন্ধে ফরাসী প্রকৃতিবিদ্‌ Buffon-এর (বুফোঁ-র) সংজ্ঞাটি বহু আলোচিত, বহুপঠিত ও ব্যবহারমলিন হ'লেও বোধকরি এটিই Style সম্পর্কে এতাবৎ প্রচলিত বহুজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা। তাঁর 'Style is the man himself' কথাটি যত্রতত্র উদ্ধৃতিবাহুল্য লাভ ক'রে এর ধার ও ভার অনেকখানি হারিয়ে ফেল্‌লেও এর গূঢ়ার্থটুকু অনুধাবন করলেই স্টাইলের রহস্য অন্ততঃ কিছুটা খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে এ মতের অপূর্ণতা বা ত্রুটি হ'ল এই যে এতে ব্যক্তির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১২

ফুল সত্য, ফুল সুন্দর, কিন্তু বৃক্ষজীবনের অন্তর্গূঢ় যে জীবনী-শক্তিতে এবং যে জল-মাটি-হাওয়া-আলো-উত্তাপ-সহযোগে ফুল সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্মমূলেও তেমনি কোন এক কবিব্যক্তিত্বশক্তিই বা চারিত্রশক্তিই স্টাইলের জনক। ব্যক্তিচৈতন্যের সুনিবিড় স্পর্শেই ভাষা দিব্যবিভাদীপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সে ব্যক্তিচরিত্র ও ব্যক্তিচৈতন্য আবার বস্তুজগতের দ্বন্দ্বমূলক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। এ বিষয়ে অন্যত্র (সাহিত্যিক প্রতিভার স্বরূপ : বস্তুবাদী বিচার / শারদীয় ক্রান্তিক / ১৩৯১) আলোচনা করেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কাগজের ফুলও কম সুন্দর নয়, কিন্তু তাতে কি যেন একটার

অভাব, সেটি সজীবতার, প্রাণশক্তির। গাছের ফুল ও কাগজের ফুলে যে পার্থক্য, মুখশ্রী আর মুখোসে যে পার্থক্য, ছবি আর ফটোগ্রাফীতে যে পার্থক্য, সার্থক স্টাইল ও কৃত্রিম (তথাকথিত) স্টাইলেও সেই তফাৎ। কাজেই 'Style is the man himself' কথাটার মধ্যকার অর্থবহ সত্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

১৩

বস্তুবিশ্বের দ্বন্দ্বমূলক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-শক্তিই গোলাপ হয়ে ফোটে, মানুষ হয়ে হাসে, গায়, নাচে। সাহিত্যের মধ্যেও তেমনি কোন এক চারিত্র্য-শক্তিই সার্থক সৃষ্টি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। Walter Raleigh সুন্দর ক'রে বলেছেন, 'The flowers and fruits of style grow on the tree of character (দ্রঃ : On Writing and writers/P. 33)

বস্তুবিশ্বের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জের নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে সৃষ্টিরহস্যের স্বরূপ ধরা পড়েছে এই অনিন্দ্যসুন্দর বিশ্বরচনার মধ্যে —'রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।' সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখি সেই বস্তুবিশ্বকে ও যুগের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে আত্মস্থ ক'রে লেখকের কি এক অন্তরশায়ী ব্যক্তিত্বশক্তিই সাহিত্য-সৃষ্টির ফুল হয়ে কত শত রূপে ফুটে উঠেছে।

১৪

Style-এর জন্মমূলে ব্যক্তি-চৈতন্যের সঙ্গে যুগ প্রেরণার কথা আগে একবার বলা হয়েছে। কারণ ব্যক্তিত্ব যুগ-নিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তির Style মানে যুগেরও Style। মেঘনাদ বধ কাব্যের রচনা মধ্যযুগে বা অন্য কোন কালে ভিন্ন কোন কবির দ্বারা সম্ভব হ'ত না। মেঘনাদ বধ কাব্য বিশেষ যুগের বিশেষ কালের রূপ-বৈশিষ্ট্য ও চেতনা দিয়েই রচিত—সে চেতনা যে আধারে আশ্রয় নিয়েছে তার নাম শ্রীমধুসূদন দত্ত। এবং শ্রীমধুসূদন দত্ত যে আধারে অবস্থিত তার নাম ঊনবিংশ শতকের বাঙ্‌লাদেশ।

১৫

বঙ্কিমী গদ্যে (প্রধানতঃ উপন্যাসেব গদ্যে) এবং রবীন্দ্রনাথেব কবিজীবনের প্রথম দিককার বঙ্কিম-প্রভাবিত গদ্য ভাষায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শক্তি ও সংযম, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিই ফুটে উঠেছে। সে যুগের ধনাঢ্য ব্যক্তির বিত্ত-প্রাচুর্য, তার সুখী স্বচ্ছল, পবিতৃপ্ত, খানিকটা মেদস্ফীত অথচ লাবণ্যময় রূপের মতোই সে ভাষা শব্দাঢ্য বর্ণাঢ্য ও অলংকৃত, সাধু ক্রিয়াপদে ও সন্ধি-সমাস-পিনদ্ধকায়ায় ও তৎসম-শব্দবাহুল্য-ভারে ধীর মন্থর গতি। আর এ যুগের ভাষা? এ যুগের অভাব, অশান্তি ও অস্থিরতার ছাপ পড়েছে বর্তমানের গদ্যভাষাব সর্ব অবয়বে। এযুগের গদ্যভাষা তাই অলংকৃত নয়, ধীর মন্থর গতিসম্পন্ন নয়, এ ভাষা ক্ষিপ্রগতি ও শীর্ণকায়া। চলিত ক্রিয়াপদে, স্বল্পাক্ষর বাক্যে ও শাণিত সংক্ষিপ্ত রূপে এ ভাষা যুগের চিহ্নবাহী। ভবিষ্যতেব বাঙ্‌লা গদ্যভাষা যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরও স্বল্পাক্ষর, গাঢ়বন্ধ, শাণিত সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র শীর্ণ যে হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমেয়।

১৬

কবিতার ক্ষেত্রে দৃক্‌পাত করলে দেখি গত শতকীয় ব্রিটিশ ভারতের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত জীবনের তথাকথিত শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগে কবিতার অঙ্গে অঙ্গে যে ছন্দ-অলংকারের ভূষণ ভার লগ্ন হয়েছিল, এ শতকে দু'দুটো মহাযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও শোষণ-বঞ্চনা-পীড়িত ক্ষিন্ন শীর্ণ বুদ্ধিবাদী বাঙালীর বিজ্ঞান বুদ্ধি ও প্রযুক্তি বিদ্যা-প্রভাবিত ত্বরাতাড়িত জীবনে তা' শিথিল হয়েছে এবং প্রায় খসে পড়েছে। এ যুগের কবিতার ভাষা, তাই, যথাসম্ভব নিরলংকৃত, অপেক্ষাকৃত নিরাবেগ, উপরন্তু যুক্তিবুদ্ধি শাণিত ; এবং ক্ষিপ্রগতি ও শীর্ণকায়া। যুগের যন্ত্রণা ও ক্লান্তি, আশা ও নৈরাশ্য, ক্ষুধা ও বঞ্চনা, বিদ্রোহ ও বেদনা এর অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশমান।

১৭

বস্তুবাদী দৃষ্টিতে স্টাইল কথাটা এক ব্যাপক সংস্কৃতিগত অর্থবহ শব্দ (wide culturological meaning)। অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির গঠনমূলক সূত্রসমূহই স্টাইল নামে চিহ্নিত। কথাটা এতাবৎ-প্রচলিত স্টাইল সম্পর্কিত ট্র্যাডিশনাল ধারণার ক্ষেত্রে নতুন বা অভিনব মনে হ'তে পারে। কিন্তু সত্য। কোন বস্তুর সবচেয়ে মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ হ'ল স্টাইল, কারণ কোন বস্তুর বিশেষ নাম, ও বিশেষ স্বীকৃতি নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে বিশেষ যুগের বিশেষ মানুষের বা বিশেষ শ্রেণীর শ্রমশক্তি, জীবনাচরণ ও কার্যাবলীর দ্বারাই এবং এই প্রক্রিয়াই তার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব গড়ে তোলে। কোনও বস্তুর স্টাইল, তাই, তার বহিরাঙ্গিক রূপকর্ম শুধু নয়, বরং সেই বস্তুর অন্তর্নিহিত চারিত্র্য শক্তি ; সে কথা আগেই বলেছি। অর্থাৎ বিশেষ সংস্কৃতির বস্তুগত উপযোগিতা এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্টাইলের মাধ্যমেই ধরা পড়ে। এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকেই সাহিত্য-শিল্প সমালোচনা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁজে নিতে হবে।

১৮

প্রাণতত্ত্বে সজীব জীবদেহের ক্ষেত্রে যেমন জীন্ (Gene)-এর ভূমিকা, সাহিত্যতত্ত্বে বা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমনি স্টাইলের। জীন্-এর মধ্যে যেমন কোন প্রজাতির সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, তেমনি স্টাইলের মধ্যেও ধরা পড়েকোন দেশের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্য সৃষ্টির রহস্য। শুধু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নয়।

উপমা দিয়ে বলা চলে স্টাইল হ'ল কোন বিশেষ দেশের, বিশেষ যুগের বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ সংস্কৃতির প্রাণগত বা ভ্রূণগত জেনেটিক প্রক্রিয়া। এবং ১. দেশের বহুকালাগত শিল্প-সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পদ ; ২. লেখকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বশক্তি

৩. লেখকের সমকালীন যুগের বৈশিষ্ট্য। এই তিনের ত্রিবেণী সঙ্গমেই তার উদ্ভব। প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঃ

১. দেশের বহুকালাগত শিল্প সাহিত্যের ঐতিহ্যসম্পদ
২. লেখকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব শক্তি
৩. লেখকের সমকালীন যুগের বৈশিষ্ট্য

১৯

প্রতিটি রচনা কর্মের অঙ্গে অঙ্গে তার সামগ্রিকতার প্রতিনিধি হয়ে স্বতঃ সম্বদ্ধ হয়ে থাকে স্টাইল। অর্থাৎ রচনাকর্মের সমগ্র অবয়বের প্রতিটি অংশে তার অস্তিত্ব রূপলাবণ্যের মতো স্বতঃ প্রকাশ। জীবদেহের জন্মমূল থেকে প্রতিটি পর্বে যেমন জীন্-এর অস্তিত্ব অবধারিত প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, তেমনি সাহিত্যের সৃষ্টি মূল থেকে শুরু ক'রে বিষয়বস্তু (content) ও রূপ কর্মের (form) বিশিষ্টতা-প্রাপ্তি বা প্রকাশকলা পর্যন্ত স্টাইলের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে অনুস্যূত। অর্থাৎ লেখকের শৈল্পিক ভাবনা-কল্পনার স্তর থেকে রূপকর্মের স্তর পর্যন্ত বা বাহ্যিক আকৃতি-(configuration) প্রাপ্তি পর্যন্ত সব কিছুর নিয়ন্তাই স্টাইল। মনে রাখতে হবে যে লেখকের সৃষ্টি শক্তি একক স্বয়ম্ভূশক্তি নয়, তার সঙ্গে জড়িত-মিশ্রিত হয়ে থাকে যুগ যুগ বাহিত ঐতিহ্যধারা এবং সমকালের যুগ প্রভাব।

যেমন বটবৃক্ষের জন্মমূলে থাকে বটবৃক্ষের বীজ। সেই বীজের মধ্যে থাকে ভবিষ্যৎ মহীরুহের সম্ভাবনা। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ দেশের বহুকালাগত জল-মাটি অর্থাৎ ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং সমকাল-জাত আলো হাওয়া না পেলে সে মুকুলিত, পল্লবিত ও পত্র-পুষ্পশোভিত হতে পারে না।

তেমনি লেখকের জেনেটিক্-শক্তিই সবটুকু নয়। তার সঙ্গে চাই দেশের যুগযুগ-বাহিত ঐতিহ্য-সম্পদ, সমকালীন যুগ-পরিবেশ, যুগের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সর্বোপরি লেখকের মানস-স্বাতন্ত্র্য—যা' লেখক-চিত্তে বস্তু ও চৈতন্যের দ্বন্দ্বমূলক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় গ'ড়ে ওঠে।

২০

এখন দেখা যাক স্টাইলের কাজ কি ?

বস্তুবাদী দৃষ্টিতে এর উত্তর আমাদের সাহিত্যবস্তুর শৈল্প-সামাজিক (Socio-æsthetic) প্রকৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে।

১. এর প্রথম কাজ বস্তুজগতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও বিচিত্র রূপকর্মের (content and form) একীভূত শৈল্পিক আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ একক ও অবিচ্ছেদ্য সমগ্রতায় (integral) তার রূপান্তর সাধন।

২. দ্বিতীয় কাজ হ'ল কোন বিশেষ দেশের শৈল্পিক ভাবনা ও ঐতিহ্যসম্পদকে এক অভিনব ও অদ্বিতীয় ভিত্তির উপর প্রস্থাপন। বস্তু ও চৈতন্যের নিয়ত ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লেখক-চিত্তে যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলে, তা' একক ও অনন্যপরতন্ত্র শিল্পকর্ম রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। এবং বিশেষ যুগের পরিবেশ এবং ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করেই তা' প্রকাশ লাভ করে।

৩. এর তৃতীয় কাজ হ'ল এমন এক শৈল্পিক সামগ্রিকতা ও সংহতি-(artistic integrity) সৃষ্টি, যার মধ্যে বস্তুজগতের সারসত্য (ontology) ও সমাজ-সত্য এক ঘনীভূত সম্পূর্ণতা লাভ করে।

সমাজের সঙ্গে লেখকের আত্মিক নিবিড়তা কতখানি অর্থাৎ লেখকের সামাজিক আত্মীকরণ কতখানি তা' ধরা পড়ে স্টাইলের মধ্যেই। সর্বদেশের, সর্বকালের বড়ো লেখকের মধ্যেই এটি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ Shakespeare, Dickens, Balzac, Tolstoy, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করলেই তা' ধরা পড়বে। কারণ রচনাকর্মের সামগ্রিকতার মধ্যেই লেখকের স্টাইল যে অনুস্যূত হয়ে থাকে, সেকথা আগেই বলেছি।

৪. এর চতুর্থ কাজ হ'ল বিশেষ ধরনের শৈল্পিক রীতি-প্রকৃতি গড়ে তোলা (এটি 'স্টাইলের' পক্ষেই সম্ভব) যা' পাঠক-মানসে এক নতুন ধরনের শৈল্পিক প্রভাব সৃষ্টি ক'রে নতুন মান (standard), নতুন রুচি গড়ে তুলবে, যার ফলে লেখক-পাঠক-'কমিউনিকেশন' বা 'সংযোগ' সাধিত হবে অতি সহজেই। এবং সহজেই দেশের ও বিদেশের বহুকালাগত ঐতিহ্য-সম্পদ আত্মসাৎ করে এক সাংস্কৃতিক সামগ্রিকতার (wide culturological meaning) অর্থবহ হয়ে উঠবে।

তাই তো দেখি 'মেঘনাদ বধ' রচিত হবার পর বাঙালী পাঠকের রুচি গেল বদলে, বহুকালাগত মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী-সাহিত্য-লালিত বাঙালী পাঠক সমাজে এবং সমকাল-প্রচলিত কবি-তর্জাগান ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতারসিক পুরানো বাঙালী সমাজে নতুন রুচি, নতুন মান (standard) অনিবার্য ভাবে গ'ড়ে উঠল। নতুন করে লেখক-পাঠক সংযোগ বা 'কমিউনিকেশন'-ও সাধিত হ'ল। এর জন্য বিশেষ যুগের ও বিশেষ ব্যক্তির (মাইকেলের) অভিনব 'স্টাইল'-ই একমাত্র দায়ী। একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য।

আর, লেখক-পাঠক সংযোগ বা কমিউনিকেশন সাধিত হয় নিম্নলিখিত রূপে :

Reality > Writer > Work > Reader > Reality (cultural reality)

বস্তুজগৎ > লেখক > সৃষ্টিকর্ম > পাঠক > বস্তুসত্য(cultural reality)

এবং এটি ঘটে একমাত্র 'স্টাইল'-এর সাহায্যেই। তাই, 'স্টাইল' কোন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির সামগ্রিকতার তথা বিশিষ্টতারই অর্থবহ, কোন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ কোন রচনা 'রীতির' প্রকাশক মাত্র নয়।

অর্থাৎ ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই স্টাইল গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি যুগাশ্রিত এবং সে যুগ আবার বহু বহু যুগের ঐতিহ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িতমিশ্রিত।

বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যে স্টাইল' প্রসঙ্গ

১

বাঙ্‌লা ভাষায় 'সাহিত্যের স্টাইল' নিয়ে আজ পর্যন্ত বড় একটা আলোচনা হয়নি। বিদেশী সাহিত্যে, বিশেষতঃ ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে স্টাইল নিয়ে যে-পরিমাণ ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয়েছে বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যে স্টাইল-সম্পর্কিত আলোচনা সে তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এমন কি Style কথাটির বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ আজও ঠিক গড়ে ওঠেনি। রীতি, ভঙ্গি, ছাঁদ, ঢঙ্, ধাঁচ, বাক্-রীতি, বাক্-ভঙ্গি ইত্যাদি কত নামেই না Style-কে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু উপরি-কথিত শব্দাবলীর কোনটিতেই স্টাইলের স্বরূপ ও রহস্য ধরা পড়েনি। তাই ইংরেজী 'Style' কথাটা বোঝাতে বাঙ্‌লা হরফে 'স্টাইল' লেখাটাই চ'লে আসছে। আমিও বর্তমান নিবন্ধে সেই রীতিই অনুসরণ করেছি।

২

অথচ গত শতকেই ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্য-সূত্রের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হয়েছিল। কিন্তু স্টাইল নিয়ে আলোচনা গত শতকে বিশেষ চোখে পড়ে না। এর কারণ কি?

আমার মতে, যথাক্রমে এর কারণসমূহ হ'ল:

১. সাহিত্যের স্টাইল প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সাহিত্যবিচারের সূক্ষ্ম, দুরূহ ও জটিল পদ্ধতি এবং কোনো দেশে সমালোচনা সাহিত্যের জন্মলগ্নে বা প্রাথমিক পর্বে এই দুরূহ ও জটিল পদ্ধতির অনুসরণ বা অনুশীলন প্রথমেই আশা করা যায় না।

২. বাঙ্‌লা আধুনিক সমালোচনা সাহিত্যের জন্ম ইংরেজী সাহিত্য প্রভাবে হ'লেও সাহিত্য সমালোচনার কোন সুনির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি বা মানদণ্ড তখনও গড়ে ওঠেনি। কারণ তখন ছিল বাঙ্‌লা গদ্যভাষা ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের গঠনপর্ব। গদ্যভাষা ও প্রবন্ধ-সাহিত্য সুগঠিত হ'লেই তো সমালোচনার অনুশীলন কার্য সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

৩. নব্য শিক্ষিত ও নবজাগ্রত (renascant) বাঙালীর কাছে সে সময় কর্মই ছিল মুখ্য, সে কর্মের বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছিল গৌণ এবং পরবর্তীকালের ব্যাপার। জাতি সংগঠন কর্মে তৎকালীন সাহিত্য নায়কেরা প্রধানতঃ ব্যাপৃত ছিলেন ব'লে সাহিত্যবিচারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-কর্মে স্বভাবতঃই তাঁরা মনোনিবেশ করেননি।

৪. বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ও পরবর্তীকালে 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩)-সম্পাদক ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র

পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে প্রথম সাহিত্য-গ্রন্থ সমালোচনায় ব্রতী হ'লেও তৎকালীন পাঠকদের সঙ্গে পুস্তক পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য লক্ষ্য ছিল।
বাঙ্‌লা সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভবযুগে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের দীর্ঘ-স্থায়ী আধিপত্য ও দৃঢ়মূল সংস্কার কাটিয়ে ওঠা ছিল দুরূহ ব্যাপার।

স্টাইলের প্রতিশব্দ হিসাবে সংস্কৃত 'রীতি' ও তৎসহ 'রীতিবাদ' (রীতিরাত্মা কাব্যস্য) প্রভৃতি শব্দের পূর্ব-সংস্কার তৎকালীন সমালোচকদের মধ্যে দৃঢ়মূল ছিল। কিন্তু অলংকার-শাস্ত্রোক্ত রীতিবাদ যে স্টাইল নয় এ ধারণার নিরসন তখনও হয়নি। এজন্য বহু আলোচনা অপেক্ষিত ছিল। কারণ রীতির সংজ্ঞা হ'ল 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ' এবং 'বিশেষো গুণাত্মা।' কিন্তু কোন্ গুণে যে পদরচনা 'বিশিষ্টা' ও কোন্ শক্তিতে যে বিশেষ গুণাত্মক হয়ে ওঠে, শুধু অলংকার শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি বহিরাঙ্গিক বিশেষ গুণমাত্রে নয়, সে রহস্যভেদ তাঁরা করতে পারেননি। স্টাইল যে শুধু লেখার গুণ নয়, লেখকের গুণ এবং তা' যে লেখকের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিরহস্যের মর্মমূলে নিহিত, সে-ধারণা তখনও দেখা দেয়নি।

গত শতকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ বা হিন্দু জাতীয়তাবোধ অনেকাংশে সাহিত্য-বিচারের মুক্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ছিল। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি যদি কোন প্রাঙ্-নির্দিষ্ট আদর্শের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে তবে সাহিত্যবিচারের উদার ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এমনটি ঘটেছে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' (সাহিত্য/১২৯৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি' (বঙ্গদর্শন/১২৮৫) প্রমুখ সমালোচনায় এবং বীরেশ্বর পাঁড়ে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পর্কিত আলোচনায় এবং 'সাহিত্য'-খ্যাত সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বা যতীন্দ্র মোহন সিংহের ('সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা' প্রণেতা) অনুদার সঙ্কীর্ণ সমালোচনায়। সনাতন হিন্দু আদর্শ ও আর্য গৌরবের লুপ্ত-স্মৃতির প্রতি এঁদের দৃষ্টি মূলতঃ নিবদ্ধ থাকায় সাহিত্য সমালোচনার মৌল মানবিক দিকটিই উপেক্ষিত হয়েছে। স্টাইল সম্পর্কিত সূক্ষ্ম আলোচনা ত' আরও পরের কথা। অবশ্য এঁদের কাছে সেটি আশাও করা যায় না। তবে সাহিত্য সমালোচনায় এঁদের অনেকেই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা পদ্ধতির সমন্বয়-প্রয়াস করেছিলেন সেটি উপেক্ষণীয় নয়।

তৎকালীন সাহিত্য সমালোচনায়, প্রধানতঃ বঙ্কিমের রচনায়, লেখার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্ব (যথা : 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবির কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' দ্রঃ : গুপ্তের কবিত্ব) অল্পবিস্তর গুরুত্ব পেলেও ঠিক স্টাইল প্রসঙ্গ আসেনি। বঙ্কিম জনসনের মতোই কাব্যের সঙ্গে কবিকে মিলিয়ে আলোচনা করেছেন, বিশেষতঃ তাঁর 'গুপ্তের কবিত্ব' ও দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিত বিখ্যাত ও মূল্যবান

আলোচনায়, যেখানে তিনি এঁদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ধরবার চেষ্টা করেছেন। তবে পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-সুলভ 'স্টাইল' ব্যাপারটি তাতে ঠিক ধরা পড়েনি।

৩

'স্টাইল' সম্পর্কে সর্বপ্রথম সচেতন ও সপ্রতিভ উক্তি করেন বোধ করি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যে সু-অধীতী কবি মধুসূদন দত্ত। তাও ইংরেজীতে লেখা একটি পত্রে। বাঙলা ভাষায় বা স্বতন্ত্র কোন প্রবন্ধে লেখা না হলেও এটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্ততঃ ঐতিহাসিক দিক থেকে।

কবির প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)-র ভাষা-সংশোধনের ভার দেওয়া হয়েছিল রামনারায়ণ তর্করত্নের ওপর। রামনারায়ণ কি পরিমাণ সংশোধন ও পরিবর্তন করেছিলেন তা জানা যায় না, তবে মধুসূদন যে মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা এক পত্র থেকে। সেই পত্রেই Style কথাটার উল্লেখ পাচ্ছি।

"Ramnarain's version, as you justly call it; disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ramnarain to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and poor self." (দ্রঃ মধুস্মৃতি/ভাদ্র, ১৩৬১/পৃ. ৯৩)

উদ্ধৃত পত্রাংশ থেকে স্টাইল সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যথা :

ক. স্টাইল যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার অর্থাৎ ব্যক্তিস্বরূপের বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশক, তা বোঝা যাচ্ছে উদ্ধৃত পত্রের 'I shall either stand or fall by myself' উক্তি থেকে।

খ. ব্যক্তিত্বশক্তি থেকেই যে শব্দ ও বাক্য—এক কথায় ভাষার জন্ম এবং সে ভাষা যে সম্পূর্ণ ব্যক্তির নিজস্ব এবং অপরের দ্বারা অ-পরিমার্জন ও অ-পরিবর্তন-যোগ্য, তারও ইঙ্গিত পাচ্ছি, "I did not wish Ramnarain to recast my sentences—most assuredly not"—অংশে।

গ. স্টাইল যে সম্পূর্ণতঃ ব্যক্তিত্ব-আশ্রয়ী এবং ব্যক্তিত্বে-ব্যক্তিত্বে যে-পার্থক্য আছে তা' স্পষ্ট হচ্ছে পত্রের নিম্নোদ্ধৃত গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে…" a man's style is the reflection of his mind and I am afraid there is but little congeniality between our friend and poor self."

মনে হয় রামনারায়ণ শর্মিষ্ঠা নাটকের স্ত্রী চরিত্রগুলির মুখে সাধু ও পন্ডিতী গদ্য ব্যবহার করেছিলেন। তাতে চরিত্রগুলির সজীবতা ও স্বাভাবিকতা বিনষ্ট হয়ে-

ছিল এবং বলা বাহুল্য, মধুসূদন এই সংশোধন গ্রহণ করেননি, উল্লেখিত পত্রের একটি অংশে তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছেন: "He has made my poor girls talk d-d-cold prose."

আমার মনে হয়, ইংরেজীতে লেখা হ'লেও, এদেশে 'স্টাইল' সম্পর্কে এটিই প্রথম সচেতন উক্তি।

৪

এরপর স্টাইল সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় বিস্তারিত আলোচনা করেন সাহিত্যের 'সাত সমুদ্রের নাবিক' (দ্রঃ জীবনস্মৃতি/রবীন্দ্রনাথ) অধুনা প্রায়-বিস্মৃত কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ সেন তাঁর সুবিখ্যাত 'রস্কিন' প্রবন্ধে। সুদীর্ঘ 'রস্কিন' প্রবন্ধটি প্রথমে 'প্রদীপ' পত্রের তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল (দ্রঃ প্রদীপ/বৈশাখ/১৩০৭/পৃ. ১৬১-৬৭ ; ঐ/আষাঢ়/পৃ. ২৩৪-৩৯ ; ঐ/ভাদ্র/পৃ. ২৯৮-৩০২)। পরবর্তীকালে এটি 'প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে (দ্রঃ পৃঃ ১৩৮-২০৭) সংকলিত হয়। প্রিয়নাথ সেনের রচনাতেই স্টাইলের স্বরূপ সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম বাঙলায় লেখা বিশদ আলোচনা পেলাম। অবশ্য স্টাইল সম্পর্কিত এ ধারণা তৎকাল-প্রচলিত স্টাইলের সুপরিচিত সংজ্ঞানুসারী। অর্থাৎ 'style is the man himself, —বুঁফো-র এই সুপরিচিত সংজ্ঞারই বিশ্বস্ত অনুসরণ ও বিশদ ব্যাখ্যা মাত্র। Style ও Stylistics সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে যে নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে, বলা বাহুল্য, তার সাক্ষাৎ সে যুগে পাওয়া সম্ভব ছিল না।

রস্কিনের গদ্য রচনার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ যথার্থ ভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'আমার বিশ্বাস যাহাকে ইংরাজীতে style বলে, রচনার সেই বিশেষত্ব বাঙালী পাঠক ধরিতে পারেন না। বাঙ্গলা সাহিত্যে আধুনিক পাঠ্যগ্রন্থও খুব কম। বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্য তো সেদিনকার।……সাহিত্যচর্চার এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে রুচিশিক্ষা দুর্ঘট।" (দ্রঃ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি/ পৃ. ১৯১)।

উদ্ধৃত মন্তব্যে সাহিত্যের স্টাইল সম্পর্কে সাধারণ বাঙালী পাঠকদের অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও অপরিচয়ের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি তৎকালীন সাহিত্য গ্রন্থের অপ্রতুলতার কথাও প্রিয়নাথ সেন জানিয়েছেন। বাঙালী লেখক-পাঠক সমাজে সাহিত্যচর্চার স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্টাইল-সচেতনতা বা রুচি বোধ গড়ে ওঠা যে দুরূহ ব্যাপার সে কথাও যথার্থভাবেই তিনি লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ সাহিত্য গ্রন্থই যেখানে স্বল্পসংখ্যক, স্টাইল সম্পর্কিত আলোচনা সেখানে গড়ে ওঠাও সহজ নয়।

আলোচ্য প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'রচনার যে বিশেষ উৎকর্ষকে style বলে, তাহারই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছিলাম। রস্কিনের প্রতিপত্তি এই style লইয়া। ইহাতেই তাঁহার গৌরব এবং সাহিত্যকলায় শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। রস্কিনের style-ই কলা-বিশেষ। এই style কথাটির ঠিক প্রতিবাক্য আমাদের বাঙ্গলায় নাই। রচনা বলিলে Composition বুঝায়। এদিকে আমরা বলিয়া থাকি অমুক

লেখকের ভাষাটি বেশ, তখন আমরা ভাষা শব্দটি style অর্থেই অনেকটা ব্যবহার করি। কিন্তু ভাষা শব্দের অপর একটি অর্থ আছে—language। ইংরেজীতেও কখনও কখনও language style অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তথাপি style কথাটির ইংরাজীতে একটি স্বতন্ত্র এবং বিশেষ অর্থ আছে। বাঙলায় তদনুরূপ বিশেষার্থ বোধক শব্দ নাই। নামাবধারণে যখন গোল, তখন ভাবাবধারণে একটু গোল থাকিবারই কথা। বাস্তবিক style অর্থে প্রতীচ্য সাহিত্য রসিকেরা যাহা বুঝেন, আমাদের পাঠক সাধারণের তাহা নাই। বোধ হয়, আমাদের লেখক সাধারণের লেখায় উক্ত পদার্থের অভাব আছে। সুতরাং style কাহাকে বলে আমরা তাহা বুঝিতে এবং বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।" (দ্রঃ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি/পৃ ১৯৩-৯৪)।

এর পর প্রিয়নাথ সেন স্টাইলের রহস্য সন্ধানে ও সংজ্ঞা নির্ণয়ে যথেষ্ট মনন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং মনে হয় বাঙলা ভাষায় স্টাইল সম্পর্কিত আলোচনা বোধ করি এটিই প্রথম।

স্টাইলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই দুইটি স্তরের কথা বলেছেন। ১. রচনার প্রাঞ্জলতা বা বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতা। ২. শব্দনির্বাচন ও বাক্যবিন্যাস। (দ্রঃ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি / পৃ ১৯৪-৯৫) কিন্তু শুধু এটুকুতেই স্টাইলের পরিচয় সম্পূর্ণ হলনা। তাই তিনি বলেছেন, 'কিন্তু style এই দু'টি হইতে আরও কিছু অর্থাৎ style-এ এই দুইটিও আছে এবং এই দু'টি হইতে অতিরিক্ত আর একটি পদার্থ আছে। এমন অনেক রচনা আছে যাহা বেশ প্রাঞ্জল—শব্দনির্বাচন ও বাক্যবিন্যাসে যাহা নির্দোষ—রসোদ্ভাবনে যাহা অমোঘ সন্ধান—কিন্তু যাহাকে style বলে তাহার কিছুই তাহাতে নাই। এই যে অতিরিক্ত পদার্থ উহা যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি মনোহর। তাহাতেই লেখকের বিশেষত্ব। সেটি লেখকের নিজের বলিবার প্রথা—তাঁহার ভঙ্গী। এই বিশেষত্ব—লেখকের এই ভঙ্গী—ইউরোপীয় সাহিত্যে style বলিয়া অভিহিত। ইহা শিখিবার বা বাহির হইতে অর্জন করিবার বিষয় নয়—স্বভাবসিদ্ধ গুণ, যাহার আছে তাহার রচনাতে প্রকাশ পাইবেই। কলা-ব্যবসায়ীর গৌরব যেমন সৌন্দর্যের একটি বিশেষ বিকাশ সাধনে, তেমনি লেখকের গৌরব—রচনায়, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব বা ভঙ্গীপ্রকাশে।' (দ্রঃ ঐ/পৃ. ১৯৫)।

উদ্ধৃত মন্তব্যে প্রিয়নাথ সেন স্টাইল যে রচনার প্রাঞ্জলতা, শব্দনির্বাচন ও বাক্য-বিন্যাস থেকে অতিরিক্ত কিছু এবং স্টাইলের স্বরূপ যে লেখকেরই নিজস্বতায় বা বিশেষত্বে বা বিশেষ ভঙ্গিতে নিহিত, তা বেশ ধরতে পেরেছেন এবং বুফোর সুপরিচিত সংজ্ঞা 'style is the man himself' কথাটিই যেন বিশদভাবে বাঙলায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এখানেও স্টাইলের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হলনা। প্রিয়নাথ সেন বলেছেন, 'প্রত্যেক কলা-ব্যবসায়ীকে তাঁহার স্বকীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে বা সৌন্দর্যের বিকাশ দেখাইতে হইবে। ...কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, এই সৌন্দর্য-বিকাশ ও

রসোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের বিশেষত্ব দেখাইতে হইবে—অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্যরচনার ভিতর এমন একটা সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য থাকিবে যাহা অপর কবিদিগের সৌন্দর্য রচনা হইতে তাহাকে বিভিন্ন এবং পৃথক করিয়া তুলিবে। এই বৈলক্ষণ্যই কবির স্বকীয় অভিব্যক্তি।' (দ্রঃ ঐ/পৃ ১৯৬)।

এই 'স্বকীয় বৈলক্ষণ্যের' অভাবে একমাত্র Poe ছাড়া মার্কিন দেশের লঙ্‌ফেলো, এমারসন্, ব্রায়াণ্ট প্রভৃতি কবিরা সাহিত্যসমাজে আভিজাত্য গৌরব লাভ করতে পারেননি। কারণ 'তাঁহাদের ছন্দ বা ঝঙ্কারে অভিনবত্ব নাই—স্বরভঙ্গীতে নতুন কণ্ঠের পরিচয় নাই।' ...কিন্তু পোর (Poe) কবিতা পাঠে আমরা যেন একটি অদৃষ্ট-পূর্ব জগতে যাই—নূতন রসের আস্বাদন পাই—অপরিচিত স্পর্শের পুলক-হর্ষ অনুভব করি। পাঠমাত্রেই বোধ হয়, ইহার তুল্য বা অনুরূপ কিছুই ইতিপূর্বে দেখি নাই। তাই মার্কিন সাহিত্যে, পদ্যে পো (Poe) এবং গদ্যে হথরন (Hawthorne)—কেবলমাত্র এই দুই জনই মৌলিক-গৌরবে গৌরবান্বিত। ইংরাজী সাহিত্যে ইঁহাদিগের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর অনেক লেখক আছেন, কিন্তু ইঁহারা যেমন, তেমনটি আর নাই।' (দ্র. ঐ/পৃ ১৯৭)।

উদ্ধৃত মন্তব্যে লক্ষ্য করা যায় যে প্রিয়নাথ সেন লেখকের অনন্যদুর্লভ স্বাতন্ত্র্য এবং সেই সঙ্গে স্টাইলের রহস্যটি বেশ ধরতে পেরেছেন। এই আলোচনাকে বিশদ করবার জন্য তিনি আরও বলেছেন, 'ইহাদের কাছে আমরা যাহা পাই, অপর কাহারও কাছে তাহা পাইনা। তাহাতেই ইঁহাদের বিশেষত্ব, তাহাতেই ইঁহাদের এত আদর। কারণ যে কবিরই এই বিশেষত্ব আছে, তাঁহারই তজ্জনিত একটি চিরন্তন এবং অমোঘ আকর্ষণ আছে।' এই রচনাভঙ্গী বা স্টাইলের অপর একটি উপযোগিতার কথাও প্রিয়নাথ সেন বলেছেন। সেটি হল এই যে ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টির জন্যও যুগে যুগে নতুন রচনাভঙ্গি বা স্টাইলের প্রয়োজন। কারণ, 'একই রচনা প্রণালীর মধ্যে বহুদিন বদ্ধ থাকিলে ভাষার জীবনী-স্রোত ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হয়। সেই সময়ে এই ব্যক্তিগত নূতন ভঙ্গী-বৈচিত্র্য আসিয়া ভাষাকে আবার জাগাইয়া তুলে।' উদাহরণতঃ তিনি গত শতকের ফরাসী গদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং জর্জ সাঁ (George Sand) ফরাসী গদ্যে নতুন style এনে কি ভাবে নব প্রাণ-সঞ্চার ও নবযুগের প্রবর্তন করলেন সে কথাও বলেছেন। তারপর মন্তব্য করেছেন, 'ইহা হইতেই সহজে বুঝা যায় রচনাভঙ্গী—style—কি অমূল্য পদার্থ—ইহার প্রভাব কিরূপ সুদূরব্যাপী—প্রয়োজনীয়তা কিরূপ বিস্তৃত।'

এরপর তিনি দেখিয়েছেন যে রচনাভঙ্গী বা style লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশক হলেও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনায় লেখক আত্মগোপন করেই থাকেন, অর্থাৎ 'তোমার ব্যক্তি-গত চেষ্টা যেন তাহার কোথাও কোন প্রকারে না বাহির হইয়া পড়ে।' ফরাসী সমালোচক St. Beuve-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে প্রিয়নাথ বোঝাতে চেয়েছেন যে স্টাইল লেখকের নিজস্ব ব্যাপার হলেও পাঠকেরা পড়বার সময় সেটিকে তাদের নিজের

নিজের রচনাভঙ্গী বলে যদি মনে করে তবে সেই স্টাইলই আধুনিক, প্রাচীন এবং সকল যুগের সমসাময়িক। অর্থাৎ কালজয়ী।

এরপরই প্রিয়নাথ স্টাইল সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। সেটি হল স্টাইল ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক, তাঁর ভাষায় 'ন-ব্যক্তিগত' অর্থাৎ একই সময়ে তা Personal ও impersonal. পরবর্তীকালে সমালোচক Middleton Murry যে ব্যক্তিচিহ্নকে বলেছেন Personal idiosyncrasy এবং শ্রেষ্ঠ স্টাইল সম্পর্কে বলেছেন, Complete fusion of the Personal and the universal"—তারই ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি। প্রিয়নাথ 'impersonal' শব্দের বাঙলা করেছেন 'ন-ব্যক্তিগত'। ফরাসী সাহিত্যে জর্জ সাঁ (George Sand) এবং ইংরেজী সাহিত্যে Newman-এর গদ্য, তাঁর মতে, 'ন-ব্যক্তিগত' রচনার উত্তম দৃষ্টান্ত।

এরপর প্রিয়নাথ সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সরলতা ও প্রাঞ্জলতা ভাষার একটি মস্তবড়ো গুণ। কিন্তু ইংরেজীতে প্রয়োজন-বোধে যেমন গ্রীক, ল্যাটিন শব্দের, তেমনি বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'ভাবপ্রকাশে সর্বাঙ্গীণ পটুতাই পরিণত ভাষার লক্ষণ। যে শ্রেণীর শব্দ যে ভাবপ্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, সেই ভাব-প্রকাশের জন্য সেই শ্রেণীর শব্দই অবলম্বনীয়—সর্বথা অবলম্বনীয় এবং নিঃসংকোচে অবলম্বনীয়। ………ভাবের স্বরগ্রামের সহিত ভাষার স্বরগ্রামের মিলন বাঞ্ছনীয়।' উদাহরণতঃ তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভাষা-ব্যবহার ও শব্দ-নির্বাচনের কথা তুলেছেন।

কিন্তু শব্দ-নির্বাচনে কেবল ভাবপ্রকাশ-পটুত্বের ওপর দৃষ্টি না দিয়ে 'বাক্যের ছন্দ ও শ্রুতিসুখের' প্রতি দৃষ্টির কথাও প্রিয়নাথ বলেছেন এবং ফরাসী লেখক ফ্লবেয়ারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "বাক্যাংশ বা পদসমষ্টি এমনরূপে গঠিত হওয়া চাই যে, পাঠকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মের সঙ্গে তাহা যেন বেশ সুমিলিত হয়। পড়িবার সময় যে বাক্যাংশ বুকে চাপিয়া ধরে—হৃদয়ের উত্থান-পতনের তালে ব্যত্যয় ঘটায়—তাহা সুগঠিত নয়।"ফ্লবেয়ারের উক্তি উদ্ধৃত করে আরো বলেছেন,'একটি বিষয় বলিবার জন্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট ভাষা আছে—নামকরণে একটিমাত্র বিশেষ্য—তাহার গুণ নির্দেশে একটিমাত্র বিশেষণ—এবং তাহাকে জীবিত জাগ্রত করিয়া তুলিতে একটিমাত্র ক্রিয়া! ভাষা ছাড়া ভাব নাই—ভাব ছাড়া ভাষা নাই। সুতরাং কোন একটি ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, যে ভাবের সঙ্গে যে ভাষার আজন্ম বন্ধন, সেই ভাষাই প্রয়োগ করিতে হইবে।'

আর একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে প্রিয়নাথ সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করেছেন। তা হল গদ্য-পদ্যের পার্থক্য। অনেক সময় অনেক লেখকের হাতে গদ্য পদ্যধর্মী এবং পদ্য গদ্যাত্মক হয়ে ওঠে। কিন্তু গদ্যের ছন্দ পদ্যের ছন্দ থেকে পৃথক। এসম্পর্কে লেখকদের অবহিত থাকতে হবে।

'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে তিনি বলেন্দ্রনাথের রচনায় বিশিষ্টতা ঠিকই লক্ষ্য করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন....

"....যাঁহার মূলধন আছে, প্রকৃতির হাত হইতে যিনি কোনরূপ বিশেষত্ব পাইয়াছেন, বিলম্বে অবিলম্বে তাঁহার প্রতিভা-গৌরব স্বাধীন আকারে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। বলেন্দ্রনাথের সেই বিশেষত্ব ছিল। ফলকথা, তিনি জন্ম কবি—আজন্ম রচনা রসিক (Stylist)। গদ্যে এবং পদ্যে উভয়েই তাহার নিজত্ব ছিল—এবং উভয়েই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।" (দ্রঃ প্রিয় পুষ্পাঞ্জলি/২২৩)

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রিয়নাথ সেন বহুদিন আগেই সাহিত্যের স্টাইল সম্পর্কে বাঙ্‌লা ভাষায় মূল্যবান আলোচনা করে গেছেন। অথচ এ বিষয়টা এতদিন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বাঙ্‌লা ভাষায় স্টাইল সম্পর্কে আজও আমরা বিশেষ আলোচনা করিনি।

৫

প্রিয়নাথ সেনের পূর্বোক্ত রচনার দু বছর পরে (১৩০৯) আরেকজন প্রায়বিস্মৃত লেখকের রচনায় স্টাইল প্রসঙ্গ পাচ্ছি। তিনি হলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বের তরুণ শিক্ষক রবীন্দ্র-প্রাণ কবি-তাপস সতীশ চন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪)।

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' (১৯০০) তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। তরুণ সতীশচন্দ্র 'সমালোচনী' পত্রে তার যে আলোচনা (পরে 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' (১৩১৯) তে সংকলিত পৃ. ২২৬ দ্রঃ) করলেন তাতে স্টাইল-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। 'ক্ষণিকা' যে রবীন্দ্রকাব্যে তথা বাঙ্‌লা কাব্যে কি বিষয়বস্তু, কি ভাষাভঙ্গি, কি রচনারীতিতে অদৃষ্টপূর্ব নতুনত্ব নিয়ে এল, তরুণ সতীশচন্দ্রের সূক্ষ্মদর্শিতায় তা চমৎকার ধরা পড়েছে। বাঙ্‌লা কাব্যে সংস্কৃতানুগ 'কাব্যিক শব্দ' বা Poetic language পরিহার করে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ সহজ ভাব ও স্বচ্ছন্দ ভাষাকে কাব্যের আঙিনা-ভুক্ত করলেন। এটি তরুণ সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। —'এ কি চমৎকার! এ যে স্টাইল,—ঠিক মনের কথা ভাবের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে ছন্দ বাঁধিয়া অক্লেশ-উপমায়, অনায়াস সাজ-সজ্জায় ছুটিয়া বাহির হইতেছে! আমরা যতদিন সংস্কৃত দিয়া লিখিব, ততদিন আমাদের স্টাইল হইবে না। আমরা লিখিবার সময় সংস্কৃতের স্থূল ঢাকনীতে আমাদের মনের গতিভঙ্গী আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলি, তাই আমাদের স্টাইল এত অল্প।' (দ্রঃ সতীশচন্দ্রের রচনাবলী পৃ. ২২৭)। এর পর 'ক্ষণিকা' থেকে কবিতা উদ্ধৃত করে সতীশচন্দ্র সেই সহজ ভাবলাবণ্য ও বাণীভঙ্গির পরিচয় পাঠকসমক্ষে তুলে ধরেছেন এবং স্টাইলের রহস্য যে আরও গভীরে, সে বিষয়েও তিনি সচেতন মন্তব্য করেছেন, 'ছন্দ চাই, অলঙ্কার চাই—এ সমস্তই লিরিকের বাহ্যিক উপাদান। কিন্তু এই যে কামিনীফুলদলের মত অলঙ্কারগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে

ইহার নিগূঢ় কারণ এটি মুক্তপ্রাণের হাওয়া বই আর কিছুই নহে। 'ক্ষণিকা'র আদ্যোপান্ত সেই প্রাণটির সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব।'

উদ্ধৃত অংশের—'এ সমস্তই লিরিকের বাহ্যিক উপাদান'—মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছে যে লেখক সতীশচন্দ্র শুধু সেই উপাদানই লক্ষ্য করেননি, স্টাইল যে আরও গভীরতর অন্য কিছু তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। 'এটি মুক্ত প্রাণের হাওয়া' বা 'সেই প্রাণটির সন্ধান লইয়া তৃপ্ত হইব'—ইত্যাদি অংশে স্টাইলের রহস্য যে কবিপ্রাণের বা কবি-ব্যক্তিত্বের মর্মমূলে নিহিত, সেটি সতীশচন্দ্র বেশ ধরতে পেরেছেন।

এই কথাটিকে বিশদ করবার জন্য আরও বলেছেন, 'ক্ষণিকা লিরিক। তাই যত কিছু ছবি সমস্তের মধ্যেই কবির প্রাণটি বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই।'

এরপর 'ক্ষণিকা'-র কবিতাগুলির রসবৈশিষ্ট্য সতীশচন্দ্র কবির অনুভূতি ও সমালোচকের প্রজ্ঞাদৃষ্টি নিয়ে বিচার করেছেন। স্টাইল সম্পর্কে আর আলোচনা করেননি, আলোচনার অবকাশও এখানে নেই। তবুও দু'চার কথায় যেটুকু মন্তব্য করেছেন তার মধ্যেই তরুণ কবি-সমালোচকের অনুভব শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়।

৬.

রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্রভাবে স্টাইল নিয়ে আলোচনা না করলেও তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত বহুবিধ আলোচনায় বারবার সাহিত্যে কবির ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গটি অপরিসীম গুরুত্বসহ আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য স্টাইল-সম্পর্কিত আলোচনার বাঁধা রাস্তায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো করে সাহিত্যের তত্ত্ব এবং কবি-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তাই তাঁর এতৎ-সম্পর্কিত আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-সুলভ যথারীতি স্টাইল-সম্পর্কিত আলোচনার সাক্ষ্য পাবনা বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ স্বকীয় অনুভব-বেদ্য অথচ অসাধারণ মনন-মনীষা-দীপ্ত এক স্বতন্ত্র স্বাদের সাহিত্যালোচনার সাক্ষাৎ পাব। বাঁধা-ধরা আলোচনার চেয়ে অনেক স্বাদু, সজীব, সতেজ ও হৃদ্য। এখানেই রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা।

তবে তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের "জুবেয়ার" প্রবন্ধটির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রের ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। এটি ফরাসী ভাবুক জুবেয়ার সম্পর্কে লেখা হ'লেও জুবেয়ার স্টাইল সম্পর্কে যে সকল কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যে সকল মূল্যবান মতামতকেই এ রচনায় মূলতঃ তুলে ধরেছেন। কাজেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণতঃ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মতামত-প্রকাশক নয়। তা সত্বেও স্টাইল সম্পর্কে এখানেই বোধ করি তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সর্বপ্রথম এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ জুবেয়ারের স্টাইল সংক্রান্ত মতামত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব মতামতও এখানে ব্যক্ত করেছেন। এজন্য রচনাটি মূল্যবান। উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হ'লেও এখানে তা তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনা।

"লেখার স্টাইল সম্বন্ধে জুবেয়ারের অনেকগুলি রচনা আছে। কিন্তু স্টাইলকে বাংলায় কী বলিব? চলিত শব্দ হইলেই ভালো হয়, আলংকারিক পরিভাষা সর্বদা ব্যবহারযোগ্য হয় না। বাংলা 'ছাঁদ' কথা স্টাইলের মোটামুটি প্রতিশব্দ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার দোষ এই যে শুধু ছাঁদ কথাটা ব্যবহার বাংলার রীতি নহে। বলিবার ছাঁদ, লিখিবার ছাঁদ ইত্যাদি না বলিলে কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। সংস্কৃত ভাষায় স্থল বিশেষে রীতি শব্দে স্টাইল বুঝায়। যথা মাগধী রীতি, বৈদর্ভী রীতি ইত্যাদি। মগধে যে বিশেষ স্টাইল প্রচলিত তাহাই মাগধী রীতি, বিদর্ভের প্রচলিত স্টাইল বৈদর্ভী রীতি। এইরূপ ব্যক্তি বিশেষের লেখায় তাহার একটি স্বকীয় রীতিও থাকিতে পারে, য়ুরোপীয় অলংকারে সেই স্টাইলের বহুল আলোচনা দেখা যায়।

তথাপি অনুবাদ করিতে বসিলেও দেখা যাইবে, রীতি অথবা ছাঁদকে স্টাইলের প্রতিশব্দ রূপে প্রয়োগ করিলে ভাষার প্রথা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ দিই: জুবেয়ার বলিয়াছেন, স্টাইলের চালাকিতে ভুলিয়োনা, beware of tricks of Style। এ স্থলে 'রীতি' অথবা 'ছাঁদ' ঠিক এভাবে চলেনা। কিন্তু একটু ঘুরাইয়া বলিলে কাজ চালানো যায়: লেখার ছাঁদের মধ্যে যদি চালাকি থাকে তাহা দেখিয়া ভুলিয়োনা। অথবা, লিখনরীতির চাতুরীতে ভুলিয়োনা। কিন্তু যেখানে স্টাইল কথাটা ব্যবহার করিলে সুবিধা পাওয়া যাইবে সেখানে আমরা প্রতিশব্দ বসাইবার চেষ্টা করিবনা।—"

'ডুসোল্ট্ বলেন, মনের অভ্যাস হইতে স্টাইলের উৎপত্তি। কিন্তু অন্তঃ প্রকৃতির অভ্যাস হইতে যাহাদের স্টাইল গঠিত তাহারাই ধন্য।'

'অনুবাদে আমরা সাহস করিয়া 'প্রকৃতি' শব্দটা ব্যবহার করিয়াছি। মূলে যে কথা তাহার ইংরাজি প্রতিশব্দ 'Soul'। এস্থলে 'আত্মা' কথা বলা যায় না, তাহার দার্শনিক অর্থ অন্যপ্রকার। এখানে 'সোল' শব্দের অর্থ এই যে, তাহা মনের ন্যায় আংশিক নহে। মন তাহার অধীন। মন, হৃদয় ও চরিত্র তাহার অঙ্গ—এই 'সোল' শব্দে মানসিক সমগ্রতা প্রকাশ হইতেছে। অন্তঃপ্রকৃতি শব্দ-দ্বারা যদি ঐ অখণ্ড মানসতন্ত্রের ঐক্যটি না বুঝায় তবে পাঠকেরা উপযুক্ত শব্দ ভাবিয়া লইবেন। জুবেয়ারের কথাটার তাৎপর্য এই যে, মন ত' চিন্তার যন্ত্র, তাহার চালনা-দ্বারা কৌশল শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ মানুষটির দ্বারা যে স্টাইল গঠিত হয় তাহাই স্টাইল বটে। সেই লিখন রীতির মধ্যে কেবল চিন্তার প্রভাব নহে, সমস্ত মানুষের একটি সম্পূর্ণ প্রভাব পাওয়া যায়।'

এরপর রবীন্দ্রনাথ জুবেয়ারের মত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, ভালো লেখক মাত্রেরই একটি স্বকীয় লিখনরীতি থাকে, কিন্তু বড়ো লেখকের সেই রীতিটি পরিষ্কার ধরা শক্ত। তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ অনির্দিষ্টতা থাকে।" এই স্বকীয় লিখন রীতিকেই Middleton Murry বলেছেন Personal idiosyncrasy। কিন্তু এখানেই স্টাইলের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেলনা। M. Murry তাই শ্রেষ্ঠ স্টাইলের সংজ্ঞা

দিতে গিয়ে Complete fusion of the Personal and the Universal'-এর কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা উদ্ধৃত অংশে সেই কথাটিই বলা হয়েছে।

জুবেয়ার স্টাইল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও বলেছেন, 'এক প্রকারের কেতাবি স্টাইল আছে যাহার মধ্যে কাগজেরই গন্ধ পাওয়া যায়। বিশ্ব সংসারের গন্ধ নাই ; পদার্থের তত্ত্ব যাহার মধ্যে দুর্লভ, আছে কেবল লেখকিয়ানা।'

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'বই জিনিসটা ভাব-প্রকাশ ও রক্ষার একটা আধার মাত্র। কিন্তু অনেক সময় সে'ই নিজে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র, এগুলো কেবল লেখা। ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি ; ভাব এবং তত্ত্বের সহিত মুখোমুখি পরিচয় হয়, মধ্যস্থ পদার্থটা চোখেই পড়ে না।"

আবার জুবেয়ার আর এক ধরনের স্টাইলের কথা বলেছেন। 'অনেক লেখক আপনার স্টাইলটাকে ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজাইতে থাকে, লোককে জানাইতে চায় তাহার কাছে সোনা আছে বটে।........দুর্লভ আশাতীত স্টাইল ভালো, যদি জোটে। কিন্তু আমি পছন্দ করি যে স্টাইলটিকে ঠিক প্রত্যাশা করা যায়।'

এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, '—এ কথাটির মধ্যে গভীরতা আছে। অভাবনীয় আশাতিরিক্ত সৌন্দর্যকে ভালো বলিতেই হইবে ; তথাপি তাহা মনের ভার স্বরূপ। তাহাতে শ্রান্তি আনে। কিন্তু যেখানে যেটি আশা করা যায়, ঠিক সেইটি পাইলেই মন শান্তি ও স্বাস্থ্য অনুভব করে।'

আলোচ্য রচনাটি অন্য লেখকের (জুবেয়ার) লেখা সম্পর্কে আলোচনা হ'লেও স্টাইল-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্যও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সেইটিই বড়ো কথা।

৭

রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধের (১৩০৮) পর স্টাইল-সম্পর্কিত যে আলোচনাটি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি সমালোচক প্রবর মোহিতলাল মজুমদারের 'সাহিত্য বিচার' গ্রন্থের 'সাহিত্যের স্টাইল' নামের প্রবন্ধ। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি Middleton Murry-র নামোল্লেখ না করেও মূলতঃ তাঁর 'The problem of style' গ্রন্থ অবলম্বনেই স্টাইলের সংজ্ঞা স্বরূপ ও সমস্যা সম্পর্কে বাঙলায় এক বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করেছেন। স্টাইলের মতো দুরূহ বিষয় নিয়ে বিস্তৃত অথচ সংহত আলোচনা বাঙলা ভাষায় এর পূর্বে আর কেউ লেখেননি। কাজেই এটি মূল্যবান রচনা সন্দেহ নেই। তবে স্টাইল সম্পর্কে এটি মৌলিক বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। কিন্তু বাঙলায় স্টাইল সম্পর্কে আলোচনার অপ্রতুলতা বিচার করে এটি অবশ্যই মূল্যবান রচনা।

এরপর ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন জনের রচনায় স্টাইল প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। কিন্তু বাঙলা

গদ্যের স্টাইল নিয়ে মূল্যবান রচনা হ'ল স্বর্গত প্রমথনাথ বিশীর 'বাঙলা গদ্যের পদাঙ্ক (১৩৬৭)' গ্রন্থের অসাধারণ ভূমিকাটি। এ'টি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এরপর বাঙলা গদ্যরীতি নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা নিবন্ধ অবশ্য লেখা হয়েছে। ডঃ নরেন্দ্র সেনের এবং ডঃঅরুণ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক। এছাড়া গদ্য লেখক সম্পর্কিত আলোচনা-গ্রন্থে প্রত্যেক লেখকই অল্প-বিস্তর স্টাইল ও স্টাইলিস্টিক্স নিয়ে কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ অপূর্বকুমার রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় Style সম্পর্কে যেমন অনেক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আছে তেমনটি বাঙলা ভাষায় নেই। প্রসঙ্গতঃ Sir Walter Raleigh-র style (1897) John Middleton Murry-র The Problem of Style (1922), Sir Herbert Read-এর English Prose Style (1928) F. L. Lucas-এর Style (1955) প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থের মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। আবার আধুনিক কালের নতুন দৃষ্টিতে Nils Erik Enkvist ও John Spencer (Linguistics & Style 1954) এবং Crystal and Davy (1929) প্রমুখ লেখক Style ও Slylistics সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তেমন আলোচনাও এদেশে বিশেষ চোখে পড়েনি। তবে কিছু কিছু চেষ্টা যে চলছে তা লক্ষ্য করা গেছে।

Style ও Stylistics হল সাহিত্য আলোচনার এক দুরূহ ও সূক্ষ্ম বিষয়। এই দুটি বিষয় সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। কারণ বাঙলা ভাষা, বিশেষতঃ গদ্য ভাষা গত পৌনে দু'শ/দু'শ বছরে অশেষ শক্তিশালী হয়েছে। সে ভাষার রূপরীতি বৈচিত্র্যের অজস্রতা ও অনন্যতাও কম নয়। বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। অথচ বাঙলায় স্টাইল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয়নি। হওয়া প্রয়োজন। একথা বলার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

গল্প ও উপন্যাস : কথা-র কথা

"প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু ক'রে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।"
(ফাঁকি/পলাতকা/রবীন্দ্রনাথ)

বাঙলা সাহিত্যে 'নবেল' বা 'নবল বা 'নভেল' কথাটা বেশি দিনের নয়। গত শতকেই এর আমদানী হয়েছে। 'নভেল' জিনিসটাই সাহিত্যে নতুন। ইংরেজী Novel কথাটার অর্থও নতুন। ইংরেজি শব্দ হ'লেও বাঙলায় 'নভেল' কথাটা এককালে খুব চ'লেছিল। এখনও মাঝে মাঝে বলা হয় — 'নাটক-নভেল'। নভেলের বদলে 'উপন্যাস' কথাটা আরও পরে এসেছে এবং বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ শব্দটিও গত শতক থেকে চ'লে আসছে। 'উপন্যাস' কথাটি সংস্কৃত শব্দ-সঞ্জাত হ'লেও আজকাল উপন্যাস বলতে যে বিশেষ ধরনের শিল্পকর্ম বোঝায়, সে-অর্থে এটি আগে আদৌ ব্যবহৃত হ'ত না। কারণ আধুনিক উপন্যাস বা নভেল বস্তুটিই তখন দেখা দেয়নি।

সংস্কৃত সাহিত্যে এককালে 'কথা' শাখাটি খুবই উন্নত ছিল। আর সে শাখায় অনেক শব্দাঢ্য, বর্ণাঢ্য পত্র-পুষ্পের সম্ভারও দেখা দিয়েছিল। যথা পঞ্চতন্ত্র, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বা বড্ঢ কহা অবলম্বনে সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর,' আর্যশূরের 'বৃহৎ কথা শ্লোকসংগ্রহ', ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ মঞ্জরী', বাণভট্টের 'কাদম্ববরী', দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত' ইত্যাদি। কিন্তু 'কথা'-শাখাভুক্ত হ'লেও এগুলি কোনক্রমেই আধুনিক অর্থে উপন্যাস নয়, বলাই বাহুল্য। অবশ্য নভেলের বাঙলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'উপন্যাস' কথাটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 'কথা সাহিত্য' বা 'কথা-শিল্প' কথা দুটোও উপন্যাস অর্থে আজকাল বাঙলায় চলছে। সম্ভবতঃ প্রাচীন 'কথা' শাখার সঙ্গে, চরিত্রগত না হোক, একটা ঐতিহ্যগত যোগসূত্র রক্ষা করার জন্যই।

'গল্প' কথাটিও বৈদিক বা সংস্কৃত নয়। ফার্সী 'গপ্' থেকে বাঙলা কথ্য ভাষায় এল 'গপ্প', বা 'গপ্পো'। উনিশ শতকে বাঙালী সাহিত্যিকদের হাতে সেটি হল 'গল্প'। এ কথাটি এখন শিষ্ট সাহিত্যে খুবই প্রচলিত। তার পূর্বে 'ছোট' শব্দটি বসিয়ে ছোটগল্প শব্দটি ইংরেজি Short story-র প্রতিশব্দ হিসাবে তৈরী করা হয়েছে এবং বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা হিসাবে ছোটগল্প খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছে।

অবশ্য ঋক্‌বেদে প্রায়-সমধ্বনিসূচক 'জল্পি' বা 'জল্প' শব্দটি পাওয়া যাবে যার অর্থ গল্পগুজব বা নিন্দা-পরিবাদ। বৈদিক ঋষি সোমদেবের কাছে প্রার্থনা করছেন যে তাঁর নামে যেন বাজে গল্পগুজব বা নিন্দাবাদ প্রচলিত না হয়। যথা 'মা নো নিদ্রা ঈশত মোতঃ জল্পিঃ।' বাঙলায় আমরা 'জল্পনা' শব্দ তৈরী ক'রে নিয়েছি

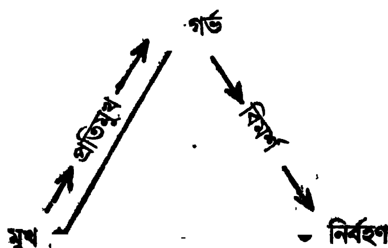
'কল্পনা' শব্দের সাদৃশ্যে। কিন্তু কল্পনা-র সঙ্গে ছোট গল্পের আকার-প্রকার-গত কোন যোগ নেই, বস্তুই তা নিয়ে কল্পনা করিনা কেন।

পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে 'গল্প' অর্থে 'কথানক', 'কথানিকা' শব্দ প্রচলিত হয়েছিল। অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে তা থেকে হিন্দীতে হয়েছে যথাক্রমে 'কহানা' ও 'কহানী'। আর সংস্কৃতের ছদ্মবেশ পরিয়ে তা থেকে আমরা বাঙলা করে নিয়েছি 'কাহিনী'। কাজেই 'কাহিনী' সংস্কৃত শব্দ নয়। অবশ্য গল্প অর্থে ফার্সী 'কিস্‌সা' হিন্দী-উর্দুর মাধ্যমে বাঙ্‌লায় হয়েছে 'কেচ্ছা' যার মূল অর্থও কাহিনী। কিন্তু উর্দু 'কিস্‌সা'-তে প্রায়ই অবৈধ প্রেমের অশ্লীল কাহিনী থাকতো ব'লে এর অর্থাবনতি ঘটল। তাই বর্তমানে বাঙ্‌লায় কিস্‌সা অর্থাৎ কেচ্ছা শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে কুরুচিকর নোংরা বা কলংকজনক কাহিনী যা ভদ্রসামাজে অপাংক্তেয়। ফলে এর পূর্বের অর্থগৌরব গেছে হারিয়ে, অন্ততঃ বাঙ্‌লা ভাষায়।

'উপন্যাস' কথাটার ব্যুৎপত্তি ও আভিধানিক অর্থ হ'ল উপ+নি+অস্ +ঘঞ্ অর্থাৎ উপ বা সমীপে ন্যস্ত। অর্থাৎ ভূমিকা বা প্রস্তাব বা মুখবন্ধ। আর এর আদিম প্রচলিত অর্থ ছিল অনেকটা বৈদিক 'জল্পি'র মতোই অথার্ৎ গালগল্প বা কল্পিত অভিযোগ বা অবাস্তব অলীক কাহিনী। এদিক থেকে অবশ্য ইংরেজি Fiction শব্দের সঙ্গে এর খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অবাস্তব, অলীক বা আজব কাহিনী অর্থে কালিদাসের শকুন্তলা-য় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বলেছিলেন, 'কিমিদমুপন্যস্তম্' অর্থাৎ 'এ কি অলীক কাহিনী'? কিন্তু আধুনিক উপন্যাস অলীক ও অবাস্তব কাহিনী তো নয়ই, বরংচ বেশী রকমই বাস্তব। কাজেই আধুনিক 'উপন্যাস' কথাটা মূল অর্থ থেকে অর্থ-পরিবর্তনের ফলে বহুদূরে সরে এসেছে। ভাষাতত্ত্বে শব্দার্থ পরিবর্তনের Semantics সূত্রে এটি হামেশাই ঘটে থাকে।

আবার নাট্যশাস্ত্রের আলোচনায় 'উপন্যাস' কথাটি ভিন্ন অর্থে পাচ্ছি। ধনঞ্জয়ের দশরূপকে পঞ্চসন্ধির * অন্যতম প্রতিমুখসন্ধির নানা অংশ বোঝাতে 'উপন্যাস' এই

* পঞ্চ সন্ধি



পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে 'উপন্যাস' কথাটির অর্থ হ'ল কোনও কার্যে অথবা প্রণয়ে সফলতার উপায়-নির্দেশ — নাটকান্তর্গত কোন ঘটনায় ও মন্তব্যে বা বাক্যে। ইংরেজিতে একে বলা চলে Intimation বা means।

সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্ন কোষেও 'উপন্যাস' শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে এর অর্থ হ'ল যুক্তিযুক্ত বিষয়ের উপস্থাপনা। যেমন শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকের রাজা একটি চিত্র দর্শনের মধ্যে দিয়ে সখী সুসঙ্গতার সুকৌশল সহায়তায় নায়িকা সাগরিকার সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছিলেন। সুমঙ্গলা এমনভাবে রাজার আঁকা ও সুসঙ্গতার আঁকা দুইটি ছবিকে উদ্যানে রেখে রাজার দৃষ্টি গোচরে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন যা নাট্যশাস্ত্র-মতে খুবই চাতুর্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত। কাজেই নাট্য-শাস্ত্রের পরিভাষায় এখানে 'উপন্যাস' সৃষ্টি হয়েছে।

সংস্কৃত 'কথা'-র কথায় আবার আসা যাক। 'কথা' ছাড়াও 'আখ্যান' বা আখ্যায়িকা' শব্দ প্রচলিত ছিল। একেই জে. নোবেল তাঁর Foundations of Indian Poetry গ্রন্থে নভেলের সমগোত্রীয় বা প্রতিশব্দ বলেছেন। (দ্রঃ পৃঃ ১৭৫)। সংস্কৃত আখ্যায়িকা বা গদ্য রোমান্স্ হ'ল আখ্যান-মালা বা গল্পের মালা। অফুরন্ত অবকাশ জুড়ে কথার পর কথার মালা গেঁথে যাওয়া। গল্প বর্ণনারও ক্লান্তি নেই, গল্পবলিয়েরও ক্লান্তি নেই। চরিত্রাবলীর রোমাঞ্চকর অভিযান-কাহিনীর বিরাম নেই। কিন্তু বেশির ভাগ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি, প্রকৃতি বর্ণনা ও নীতিমূলক তত্ত্বোপদেশের উপর। (দ্রঃ Literary Studies on the Sanskrit Novel / 1904 / Viena Oriental Journal/Vasavadatta/Tr. L. H. Gray/P. 37)।

বৌদ্ধ গল্প-কাহিনীর মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল 'মহাবস্তু' ও 'অবদান'-জাতীয় গ্রন্থগুলি। যথা: 'দিব্যাবদান', 'অবদান-শতক' ইত্যাদি। অবদান শব্দের মূল অর্থ বীরত্ব-মহত্ত্বব্যঞ্জক গল্প, ভুল অর্থ 'দান' বা Contribution. এই অর্থে আজকাল অবদান শব্দ খুব চলছে। যেমন, নিউ থিয়েটার্সের 'অমর অবদান'।

'কথা'-শাখার নানা বৈচিত্র্যের কথা আলংকারিক হেমচন্দ্র বলেছেন। যথা: আখ্যান, নিদর্শন, প্রবহ্লিকা, মতল্লিকা, মণিকুল্যা, পরিকথা, খণ্ডকথা, বৃহৎ-কথা, সকল কথা ও উপকথা। আনন্দবর্দ্ধন শেষ তিনটিকে স্বীকার করেছেন এবং অভিনব গুপ্ত তার ব্যাখ্যা করেছেন। অগ্নিপুরাণে অবশ্য 'কথানিকা'-র কথা বলা হয়েছে। (অগ্নিপুরাণ/৩৩৭/২০)

'কথা' শাখার বিখ্যাত নিদর্শন কাদম্বরী (৭ম শতক)-তে বর্ণনা অংশ কম হয়ে চরিত্র বিশ্লেষণ বেশী হ'লে ভারতীয় প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পেত। কারণ ঔপন্যাসিক বাস্তববোধ, কল্পনাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি বাণভট্টে প্রচুর পরিমাণে ছিল। মারাঠী ও কন্নড় ভাষায় উপন্যাস বলতে 'কাদম্বরী' শব্দের ব্যবহার থাকলেও কাদম্বরী থেকে ভারতের আধুনিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়নি। হয়েছে ইংরেজী নভেল ও রোমান্স সমূহের প্রভাবে। উপন্যাস তাই আধুনিক কালের সামগ্রী। আমাদের স্বরা-তাড়িত

জীবনে যুক্তি-বুদ্ধি-শাণিত মনের কাছেই তার আবেদন। উপন্যাস তাই সংস্কৃত 'কথা'-সাহিত্যের চেয়ে অনেক শাণিত, সংক্ষিপ্ত ও সংহত। এখানে অবান্তর, অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ নেই। এর কাহিনী তাই Plot নামে চিহ্নিত। Plot হ'ল কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত সুশৃঙ্খল, [illegible] কাহিনী। প্লটের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে কাহিনী, উপাখ্যান, বৃত্ত বা ইতিবৃত্ত যা-ই ব্যবহার করি না কেন, এর ঠিক প্রতিশব্দ হয় না। তাই Plot-এর বাঙ্‌লা 'প্লট' লেখাই বাঞ্ছনীয়।

'কথা' কথাটি খুব প্রাচীন হলেও এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল 'কেমন ক'রে'। এর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের ঠিক অর্থ না থাকলেও তাৎপর্যটুকু লক্ষ্য করবার। E. M. Forster-কথিত 'And then and then' প্রশ্ন গল্প পাঠক বা শ্রোতার মনে থাকবেই। কারণ আধুনিক উপন্যাসের পাঠক এর কাহিনী পড়তে পড়তে বারংবার, প্রতিপদেই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং "কেমন ক'রে"—এ প্রশ্নের যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য সদুত্তর পেলে অর্থাৎ তাঁর যুক্তিবোধ পীড়িত না হলেই অপ্রতিহত মনে পড়ে যান। কাজেই, অন্ততঃ এই অর্থে গ্রহণ করেও উপন্যাসের নাম 'কথাসাহিত্য' দেওয়া চলে। এবং এ নাম দেওয়াও হয়েছে।

আধুনিক অর্থে বাঙ্‌লা উপন্যাস, বলাই বাহুল্য, সংস্কৃতের বংশধর নয়। ইংরেজী সাহিত্যের ঔরসে মাতৃভাষার জঠরে এর জন্ম। তাই প্রাথমিক পর্বে এর চেহারা ও চরিত্র অনেকটা ছিল ইঙ্গ-ভারতীয়। তাই, বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বের রচনাসমূহে একাধারে অবাস্তব ও অলীক কাহিনী যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি বাস্তব জীবনের কাহিনীও রচিত হয়েছিল। তবে তুলনায় পরী-হুরী-দৈত্য-দানো-দেব-দেবী-অপ্সরা-গন্ধর্বের কাহিনীই "উপন্যাস" নামে চলেছিল বেশি। কারণ আধুনিক উপন্যাস বা নভেল সম্পর্কে ধারণা তখনও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই ১৮৫১ খ্রীঃ প্রকাশিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র একটি সংখ্যায় জনৈক ব্যক্তি ও গন্ধর্বের কাহিনীকে বলা হয়েছে 'সরলের উপন্যাস' (দ্রঃ শক ১৭৭৩, ফাল্গুন)। অপর একটি সংখ্যায় (শক ১৭৭৫, কার্তিক) জনৈক গণৎকার ও পাদুকাকারের গল্পকে বলা হয়েছে "পাদুকাকার গণকের উপন্যাস।"

অথচ আধুনিক উপন্যাস আদৌ উপকথা, রূপকথা বা অবাস্তব অলৌকিক গল্প নয়। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে আধুনিক নাগরিক সমাজ, মুদ্রাযন্ত্র, গদ্যভাষা ও একটি লেখাপড়া জানা সম্প্রদায় বা reading Public তখন গড়ে উঠেছে, আধুনিক মননও দেখা দিতে শুরু করেছে ; জীবন সম্পর্কে নব নব কৌতূহলও জাগ্রত হয়েছে, নূতন ও পুরাতন আদর্শের দ্বন্দ্বসংঘাতও শুরু হয়েছে। অর্থাৎ উপন্যাস জন্মের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে। কিন্তু জীবনে উপন্যাস সৃষ্টির উপকরণ ও সাহিত্যে তার সার্থক স্রষ্টা তখনও দেখা যায়নি। তাই উপন্যাসের নামে পূর্বতন অবাস্তব অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনই প্রাধান্য লাভ করেছে 'উপন্যাস' জন্মের প্রারম্ভ-পর্বে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতা ও সাহিত্যের অভিঘাতে বাঙালী মানস সমাজ-সচেতন এবং তার ফলে

উপন্যাস-সচেতন হয়েছে আর বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বিশেষতঃ নানা সমাজ-আন্দোলন, ধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের দ্বন্দ্বজটিল আবর্তে বাঙালী জীবন যতই তরঙ্গিত হয়েছে ততই সে বাস্তবমুখী হয়েছে এবং তার ফলে কালক্রমে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহ করতে শিখেছে। তার পূর্ব পর্যন্ত উপন্যাস-শিল্প সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্দিষ্ট ভাবে যে গড়ে উঠতে পারেনি সে কথা আগেই বলেছি। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যে নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং সেইসঙ্গে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠল তারই পৃষ্ঠপোষকতায় উপন্যাস সাহিত্যের উদ্ভব হল। কিন্তু বাঙলা দেশে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের বিকাশ অত্যন্ত শ্লথগতি ও বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় ঘটেছিল। তাই বাঙলা উপন্যাসের উদ্ভব স্তরে এর বিকাশও খুব অবাধ, স্বাভাবিক হয়নি। তাই একটি দ্বিধা ছিলই। অর্থাৎ কখনও পশ্চাদপদতা বা মধ্যযুগীয় বিশ্বাস সংস্কারের প্রতি পিছুটান, কখনও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রভাবে অগ্রবর্তিতা—দুই-ই দেখা গেছে সে যুগের সাহিত্যে বিশেষতঃ উপন্যাস সমূহে। প্রথম যুগের উপন্যাসসমূহের নামকরণেও এই দ্বিধা ধরা পড়েছে। ফলে, কখনও কথা, কখনও কাহিনী, কখনও উপন্যাস কখনও উপাখ্যান বা আখ্যান, কখনও বিবরণ, কখনও চরিত, কখনও বা ইতিহাস—ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ-যোগে তৎকালীন গদ্যে-পদ্যে লেখা উপন্যাস-প্রচেষ্টাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। যথা ঃ গুরুদাস হাজরার রোমিও ও জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান (১৮৪৮), রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তের পতিব্রতোপাখ্যান (মাঘ ১২৫৯), রঙ্গলালের কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৪), হরিমোহন গুপ্তের সন্ন্যাসীর উপাখ্যান (১৮৫৮) কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বসুপালিতোপাখ্যান (১২৬২) [বোকাচ্চিওর ডেকামেরনের একটি গল্পের অনুসরণে লেখা] হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের জয়াবতীর উপাখ্যান (১২৭০) ও গ্রাম্য উপাখ্যান (১৮৮৩) ইত্যাদি। এছাড়া কোমার জিলম্যানের মনোহর উপাখ্যান (১২৬২) এমনকি তুলসীদাসী রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে উমাচরণ দে'র রামোপাখ্যানও উপাখ্যান-নামাঙ্কিত। আবার ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত Edward Roer-কৃত "মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত নাটকের মর্মানুবাদ কতিপয় আখ্যায়িকা" (১৮৫৩)-ও আখ্যায়িকা নামাঙ্কিত। এছাড়া পাওয়া যাচ্ছে রোমীয় সপ্তাশ্চর্য উপাখ্যান (১৮৫৪), নলোপাখ্যান, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের "সুশীলার উপাখ্যান" (১।২।৩ খণ্ড) [১৭৫৯-৬০] ও মথুরানাথ তর্করত্নের 'বিচিত্র উপাখ্যান' (১৮৫৯) প্রভৃতি। আবার হরিনাথ শর্মার 'মুদ্রারাক্ষস' ও রামগতি ন্যায়রত্নের রামাবতার (১৮৬৩) কে বলা হয়েছে 'আখ্যায়িকা।' পদ্যে রচিত উমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'সৌদামিনী উপাখ্যান' বহু পরবর্তীকালে ১৮৮২ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান" (১৮৫৯) [দ্রঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৬৮] এবং তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকার (১৮৫৫) প্রকাশিত 'চরিত্রবর্ণীর কথিত উপাখ্যান'-ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আবার সেই সময়ে উপন্যাস আখ্যাত বহু রচনাও পাওয়া যাচ্ছে। যথা ঃ রামকালী বা রামসদয় ভট্টাচার্যের 'অদ্ভুত উপন্যাস' (১৮৬১)। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ভাণ্ডার (১২ খণ্ড) এবং যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস লহরী (১২৯৭ সাল)। আবার শশিচন্দ্র দত্তের The times of Yore (1865) বইটির অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'উপন্যাস মালা' (১৮৭৭)। এছাড়া যোগেশ চন্দ্র দে ও নিত্যদাস রায় রচিত 'নগনন্দিনী' (১৮০০)-কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ব'লে দাবী করা হয়েছে। হরিমোহন মখোপাধ্যায়ের 'যোগিনী (১৮৭৯)-কে বলা হয়েছে 'বিয়োগান্ত উপন্যাস'। শ্রীপথিক চন্দ্র কবিরত্ন (ওরফে) বিষ্ণু শর্মা জুনিয়র প্রণীত 'ভজহরি' (১২৯০)-কে বলা হয়েছে 'সমাজ-চিত্র-উপন্যাস'। রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্নের 'সত্যচন্দ্রোদয়' নামক 'মনোরঞ্জন নীতিগর্ভ' উপন্যাস' সুচারুযন্ত্রে ১৮৫৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিজ্ঞাপন' অংশে গ্রন্থকার লিখেছেন, "যে সমুদায় ঘটনা এই উপন্যাসের অন্তর্গত, বর্দ্ধমান নগরকেই তত্তাবতের স্থল বলিয়া কল্পনা করা গিয়াছে।" এখানেও 'উপন্যাস' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য।"

'কাহিনী' ও 'গল্প'-নামাঙ্কিত কিছু রচনাও পাওয়া যাচ্ছে। যথা ঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুলীন কাহিনী' (১২৯২), 'দারোগার দপ্তর'-খ্যাত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ঠগীকাহিনী' (১৩০৪) এবং অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'গোয়েন্দার গল্প' (১৬১৫)। তারাশংকর তর্করত্ন তাঁর 'কাদম্বরী' (১৯৫৪)-র ভূমিকায় এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষাল তাঁর 'মালতী মাধব'-এর ভূমিকায় 'আখ্যায়িকা' অর্থে 'গল্প' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

আবার 'চরিত' শব্দ যোগেও তৎকালীন গল্প-উপন্যাসকে বোঝাবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যথা ঃ কেদার নাথ দত্তের 'বাঁকা চরিত', যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর 'চিনিবাস-চরিতামৃত' (১৮৯০). বাঙালী চরিত (১।২।৩ খণ্ড) [১২৯২-৯৩] রমানাথ চট্টোপাধ্যায়ে 'বঞ্চক চরিত' (১৯১৮ সং বং) ত্রৈলোক্যনাথ মখোপাধ্যায়ের 'ডমরু চরিত' (১৩৩০), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'স্ত্রীচরিত্র' (১২৯৭) প্রভৃতি।

'কথা' শব্দের যোগেও গল্প-উপন্যাসের নামকরণ করা হ'ত। যথা ঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মহীরাবণের আত্মকথা' (১২৯৫), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আমার গুপ্তকথা' (১৮৭০-৭৩), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'কুন্দলতার মনের কথা' ইত্যাদি।

'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কালীপ্রসন্ন সিংহের নামে প্রচলিত হ'লেও এর লেখক সম্ভবতঃ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এ নিয়ে কিছুকাল ধরে পত্র-পত্রিকায় আলোচনা চলছে। বহু প্রসবিনী লেখনীর অধিকারী ভুবনচন্দ্র শোভাবাজারের ভূপেন্দ্র দেব বাহাদুরের বেতনভুক্ লেখক হিসাবে রেনল্ডসের অনুসরণে উপেন্দ্রকৃষ্ণের হয়ে ৯০০ পৃষ্ঠার এক সুবিশাল উপন্যাস (!) লেখেন। তার নাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' (১৯০৪)। গ্রন্থশেষে লেখক একে 'রহোন্যাস' বলেছেন। অর্থাৎ রহঃ+উপন্যাস=

রহোন্যাস অর্থাৎ গুপ্তকথা। আজকাল যাকে আমরা 'রহস্য-উপন্যাস' বা রহস্যোপন্যাস বলে থাকি। 'রহোন্যাস' কথাটি অবশ্য বাঙলায় চলেনি।

ফরাসী লেখক ইউজিন স্যু-লিখিত 'The Wandering Jew-এর ভুবনচন্দ্রকৃত অনুবাদের নাম অভিশপ্ত য়িহুদী. [১।২।৩।৪ খণ্ডে (১৯০০)]। কিন্তু তাঁর মৌলিক ও অনুবাদমূলক বহু রচনার নামকরণে তিনি উপন্যাস, নবোন্যাস 'রহোন্যাস' গুপ্তকথা, কথা, রহস্য—ইত্যাদি বহু শব্দই ব্যবহার করেছেন। যথা ঃ তুমি কি আমার ? (১৮৭৩-৭৯)—নবোন্যাস, রহস্যমুকুর ঃ আশ্চর্য গুপ্তকথা ১।২ খণ্ড, ১৮৭৭ (উপন্যাস) বঙ্গোপন্যাস ঃ চারুশীলা (১৮৮১) হীরাপ্রভা (১৮৮১) —উপন্যাস, আশা চপলা ১।২ খণ্ড, ১৮৮৪, ১৮৮৫ (নবোন্যাস), ছোটবউ (উপন্যাস), বিলাতী গুপ্ত কথা (১৮৮৭), ভারতীয় রহস্য (১৮৮৭), কুঞ্জবালা কাশ্মীর কুসুম, ১৮৯০ (উপন্যাস), বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা (১৮৯০) কমলকুমারী ও রাজা সন্ন্যাসী ১৮৯৩ শক (উপন্যাস), পারুল বা সেই কি তুমি ? ১৮৯৩ (উপন্যাস), অগ্নিকুমারী, ১৮৯৪ (উপন্যাস), আনন্দলহরী, ১৮৯৪ (উপন্যাস), আমিনা বাই ১৯০০ (উপন্যাস) ইত্যাদি।

ভুবনচন্দ্রের বৃহত্তম রচনা 'ঠাকুর বাড়ীর দপ্তর' ১।২।৩।৪ খণ্ডে ১৮৯৫ খ্রীঃ (১৩০৩-০৭) প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকা-য় তিনি একে 'রহোন্যাস' বলেছেন। এ ছাড়া, ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় 'উপন্যাস' ও 'নবল' কথা দুটোর ব্যবহারও পাওয়া যাচ্ছে।

'ইতিহাস'-শব্দযোগেও আখ্যায়িকার নামকরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যথা ঃ চণ্ডীচরণ মুনশীর তোতা ইতিহাস (১৮০৫), কেরীর 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) গত শতকের গোড়াতেই ছিল। পরবর্তীকালে পাওয়া গেল নীতিবোধক ইতিহাস (১৫৪৯), সুললিত ইতিহাস (১৮৬৩) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৫৭)। হরিনাথ মজুমদার তাঁর 'বিজয়বসন্ত' (১৮৫৯) গ্রন্থে 'নভেল' অর্থে বুঝিয়েছেন রূপক ইতিহাস বা allegorical tale.

বঙ্কিমযুগের লেখক হয়েও বঙ্কিমপ্রভাব এড়াবার চেষ্টা করেছেন এমন একজন হলেন ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। তাঁর প্রথম উপন্যাস চন্দ্রনাথ (১৮৭৩, ২য় সং ১৮৮৩) দ্বিতীয় উপন্যাস মুরলা (১৮৮০)। এটির অর্থাৎ দ্বিতীয়টির আখ্যান-কল্পনা পুরোনো ধাঁচের হলেও ভূমিকায় লেখক একে "উপন্যাস" বলেছেন, "এ উপন্যাসের প্রথম চারি পরিচ্ছেদ পূর্বে "বঙ্গ মহিলা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।……একটি চিত্তহারী উপন্যাস রচনা করা অতিশয় দুরূহ জানিয়া অনেকেই একমাত্র সাময়িক রুচির অনুরোধে ইউরোপীয় প্রথাসকল দেশীয় ঘটনায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন……।"

লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে উপন্যাস বলতে বুঝিয়েছেন "নাটকাত্মক আখ্যায়িকা"। কথাটি বেশ ভালো। তিনি উপন্যাসের রহস্য খানিকটা

বেন ধরতে পেরেছেন। সত্যই তো উপন্যাস অনেকখানি নাট্যাত্মক। বিশেষতঃ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহ সাত্যই ত' নাট্যাত্মক।

গোপীমোহন ঘোষ তাঁর 'বিজয়বল্লভ' (১৮৬৩) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে ইংরেজী সাহিত্যে যাকে 'নবল' বলা হয়, তিনি তার আদর্শেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজনারায়ণ বসু ত' গোপীমোহনকে প্রথম বাঙ্‌লা ঔপন্যাসিক বা নভেল-লেখক বলতে চান। (দ্রঃ বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব / পৃঃ ৫২)

কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে মিসেস্ ম্যলেন্স্ রচিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) কেই প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিতে হয়। এতকাল অবশ্য আলালের ঘরের দুলালকেই (১৮৫৯) প্রথম উপন্যাস বলা হত। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সহঃ গ্রন্থাগারিক শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "ফুলমণি" আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এটিই প্রথম বাঙ্‌লা উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে।

লঙ্ সাহেবের Descriptive Catalogue-এ "Ethics and Moral Tales" পর্যায়ে 72 নম্বর পুস্তিকাটি হ'ল ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)। লঙ্ সাহেব বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন "In the guise of fiction, written for Native Christian women to show the practical effects of Christianity..." ইত্যাদি।

অবশ্য প্যারীচাঁদ স্বয়ং তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকায় আলালকেই বাঙ্‌লার "প্রথম মৌলিক উপন্যাস" বলে দাবী করেছেন।—"The above original novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence."—এখানে উদ্ধৃত অংশে 'Original Novel' কথাটুকু লক্ষণীয়। কপালকুণ্ডলা-র ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় H. A. D. Phillips প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল"-কে বলেছেন, "a truly indigenous novel."

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৮) গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র একে উপন্যাস-ই বলতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন—

"এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলের একই ধারা ; 'এক রাজা ছিলেন, তাহার সো দো দুই রাণী' এইরূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে ; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে এবং গল্পটিও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।" (দ্রঃ বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ/আষাঢ়/১৩৮০ শক)

আসলে 'Novel' বা 'উপন্যাস' কথা দুটো তখন খুব শিথিল ভাবে যে-কোন কথাত্মক গদ্যরচনাকেই বলা হ'ত। নভেল সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট ধারণা তখনও এদেশে গড়ে ওঠেনি। তাই কখনও 'নভেল', কখনও 'নবল', কখনও 'উপন্যাস', কখনও 'রহোন্যাস' কথার সাহায্যে যে কোন আখ্যায়িকা ব্যাপক ভাবে এবং শিথিল ভাবে নামাঙ্কিত হতে লাগল। আবার নভেলের 'নব'-স্ব ও উপন্যাসের 'ন্যাস'-স্ব নিয়ে তৈরী হল অভিনব শব্দের 'বকচ্ছপ'-মূর্তি—'নবন্যাস' বা 'নবোন্যাস'। 'নবন্যাস'

সামান্য কিছুদিন চলেছিল। অবশ্য 'উপন্যাস' কথাটাই বেশি করে চলে আসছিল বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। গল্প-আখ্যানের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-পত্রে 'উপন্যাস' কথাটির ব্যবহারই বারংবার দেখা গেছে।

(দ্রঃ ১৮৫৮/ভাগ ৫১/পৃঃ ৭২)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' অংশে জানিয়েছেন, "ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'নবেল' নামে প্রসিদ্ধ উপন্যাস গ্রন্থসকল যে প্রণালীতে সংকলিত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।"

এখানে 'নবেল' এবং 'উপন্যাস'—দুটো কথাই ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুটো কথাই বাঙালীর বাক্-ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ বঙ্কিমের কাল থেকে।

কালক্রমে উপরি-কথিত শব্দাবলী থেকে 'উপন্যাস' ও 'নভেল'—দুটো কথাই বাঙলায় দাঁড়িয়ে গেল। এ দু'টো কথা বাঙলায় আজও চলছে। আর সেই সঙ্গে 'গল্প' ও 'ছোট গল্প' কথা দুটোও স্বক্ষেত্রে অপ্রতিহত প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

সাহিত্যে অ্যাবসার্ড নাটক

আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যে কিছুকাল ধরে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে। তার নাম 'অ্যাবসার্ড' নাটক। এর দেখাদেখি বাঙলা সাহিত্যেও অ্যাবসার্ড নাটক লেখার একটা হুজুগ কিছুদিন আগে দু একজনের রচনায় দেখা দিয়েছিল। সম্প্রতি সে হুজুগ তেমন দেখা যাচ্ছে না।

বর্তমান নিবন্ধে 'অ্যাবসার্ড' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা করব।

অ্যাবসার্ড কথাটার ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। আজব বা অদ্ভুত বা উদ্ভট বা কিম্ভুত বা বিদ্ঘুটে—ইত্যাদি যে কোনো একটি নামে হয়ত বা কাজ-চালানো-গোছের-মতো করে একে চিহ্নিত কবা যায়। কিন্তু তাতে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা থাকতে পারে ভেবে আলোচ্য রচনার শিরোনামে 'অ্যাবসার্ড' কথাটাই বাঙলায় ব্যবহাব করেছি।

এই ধাবার নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন আয়োনেস্কো, আর্থার আদামভ্, জাঁ জেনে ও হ্যারোল্ড পিন্টারের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' (Waiting for Godot) এই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব মূলক নাটক। এ নাটকের অভিনয় দিয়েই, বলা চলে, এ নাট্যরীতির সূচনা ও প্রসার। ১৯৫৭ সনের ১৯শে নভেম্বর সানফ্রানসিস্কোতে এ নাটকের এক অভিনয় রজনীতে পরিচালক মিঃ হারবার্ট ব্লাউ তাঁর ভাষণে অ্যাবসার্ড নাটককে জাজ (jazz)-সঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাজ্ সঙ্গীতকে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁদের নিজেদের ইচ্ছা মতো যা কিছু ভেবে নিতে পারেন। এ নাটকও তা-ই। যার যেমন খুশি মানে করে নিতে পারেন। কোনো আপত্তি নেই। তবে অনেক সময় এর অর্থ বা বক্তব্য না বুঝেও বোঝবার ভান করবার 'স্নবারিও' দেখা দেবে অনেকের মধ্যে। এবং এই সুযোগে অনেক দুর্বল শিল্পমূল্যহীন রচনাও অনায়াসে পাসমার্কা পেয়ে যাবে। সমালোচকদের বিচারও অভ্রান্ত এবং সর্বসম্মত হবে না।

এ এক আজব নাটক। প্রচলিত অর্থে নাটক নয়—বলাই বাহুল্য। এতে প্লট নেই, নাটকীয় গতি ও বিকাশ নেই, চরিত্র নেই, ঘটনা নেই, নাটকীয় উৎকণ্ঠা নেই এমনকি অনেক সময় দেখা যাবে যে সাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধিরও বালাই নেই।

তাহলে এ আবার কেমন নাটক? পাগলের প্রলাপোক্তি? খানিকটা তা-ই বটে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই প্রচলিত নাট্য প্রথা থেকে মুক্তির ও নব্যরীতির নামে এতে অবাধ কল্পনার স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তবুও স্যামুয়েল বেকেট, আয়োনেস্কো, আদামভ্, পিন্টার ইত্যাদির নাটককে আপাত বিচারে

অর্থহীন প্রলাপ মনে হলেও, এদের মধ্যে এমন কিছু বক্তব্য আছে যা চেষ্টা করলে এবং অভ্যাস ও অনুশীলনের ফলে হয়ত বোঝা যাবে। এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কোন্ পরিবেশে কেনই বা এ ধরনের নাটক লেখা হচ্ছে তা-ও বুঝতে অসুবিধা হবেনা।

দর্শক, পাঠক ও সমালোচক মহলে এ নাট্যরীতি ঠিক বিস্ময় নয়, বিমূঢ়তার সৃষ্টি করেছে। কারণ মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে এটি অভিনব এবং পরীক্ষামূলক এক অর্বাচীন রীতি। এ রীতি এখনও বিকাশশীল এবং একে এখনও লোকে ভালো করে বুঝতেই পারেনি। কারণ এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এখনও সুনির্দিষ্ট হয়নি। প্রচলিত নাট্যরীতির আদর্শে বিচার করতে গেলে এ নাট্যধারাকে বেয়াদপি ও বাড়াবাড়ি রকমের অভব্য ও অশোভন বলেও মনে হতে পারে। এতে কাহিনীর ছায়া আছে, প্লটের কায়া নেই। পাত্রপাত্রী আছে, চরিত্র নেই। পাত্রপাত্রী যারাও বা আছে তাদের যান্ত্রিক পুতুল বলে মনে হবে। এ নাটকের সূচনা নেই, সমাপ্তিও নেই। 'মুখ' ও নেই, 'নির্বহণ'ও নেই। অন্য নাটকে যেখানে যুগ-মানস ও যুগ-মানুষের চিত্র, এ নাটকে তার বদলে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের দৌরাত্ম্য। অন্য নাটকে যেখানে স্বাভাবিক সংলাপ, এ নাটকে সেখানে যুক্তি পারম্পর্যহীন অসংবন্ধ, অর্ধমত্ত প্রলাপ। এ নাটকের শিল্প-বিচার পদ্ধতি, তাই, নতুন কোন রীতি অনুযায়ী হতে হবে—যে রীতি এখনও ঠিক গড়ে ওঠেনি।

যে নাট্যকারদের নাম একটু আগেই উল্লেখ করেছি তাঁরা যে একটি দলের বা মতের বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তা নয়। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং কামু-র The Outsider উপন্যাসের নায়কের মতো নিঃসঙ্গ একাকী; বৃহত্তর বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন; এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত। রচনার বিষয়বস্তু ও রূপকর্মের দিক থেকেও প্রায় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। এঁদের মধ্যে যদি কোন সাধারণ ধর্ম বা মিল থেকে থাকে তবে তার কারণ সমকালীন পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বিশেষতঃ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় এঁদের প্রত্যেকেরই আবেগ-উদ্বেগ, চিন্তা-চেতনা, ভয়-বিশ্বাস ও জীবন-প্রশ্ন অনেকটা এক জাতের বলে।

বর্তমানকাল যুগসন্ধি ও যুগ-সংকটের কাল। ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে এ সংকট সুতীব্র হয়ে উঠেছে। যুগসন্ধির জটিলতা এবং বহু বিচিত্র সমস্যা আমাদের অনেককেই নানা বিমূঢ় প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। বিচিত্র এই যুগ। মধ্যযুগীয় ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এসে মিশেছে উনিশ শতকীয় মার্ক্সবাদ, কখনও বা প্রাগৈতিহাসিক আদিম চেতনার সঙ্গে বিশশতকীয় অতি উৎকট আধুনিকতা। 'অ্যাবসার্ড' নাটক বর্তমানের এক জটপাকানো, সমস্যাঘন ও দুর্বোধ্য যুগেরই বাণীবহ হবার দাবী জানায়।

অকল্পনীয় আইনস্টাইনীয় মহাবিশ্ব, মহাকাল ও মানব জীবন। এ হেন জীবনের মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকবার অর্থ নেই, সার্থকতা নেই, সামঞ্জস্য নেই, অতএব মানুষ

কেন আত্মহত্যা করবে না—ইত্যাকার প্রশ্ন [illegible] আলোচনায় কাম্যু ১৯৪২ সনে।

মনে রাখতে হবে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। সর্বধ্বংসী মহাযুদ্ধে মানুষের মূল্যবোধের দ্রুত অবলুপ্তি ঘটেছে। জীবন সম্পর্কে হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ ও একটা দার্শনিক আতঙ্ক-প্রতীতি (anguish) লেখক-বুদ্ধিজীবীদের জীবন, মন ও মননে গভীর কালো ছায়া বিস্তার করেছে। মানব জীবনের বিধ্বস্ত ধারণার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কাম্যু তাঁর বিখ্যাত The Myth of Sisyphus গ্রন্থে বলেছেন, "A world that can be explained by reasoning, however faulty, is a familiar world. But in a uuiverse that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger. He is an irremediable exile, because he is deprived of memories of a lost homeland as much as he lacks the home of a promised land to come. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of Absurdity." Absurd কথাটার আভিধানিক অর্থ হ'ল—out of harmony, out of harmony with reason or propriety, incongruous, unreasonable, illogical ও সাধারণ অর্থে ridiculous. কিন্তু উল্লিখিত অর্থে কাম্যু শব্দটি ব্যবহার করেননি। Kafka সম্পর্কে কোন এক আলোচনা প্রসঙ্গে আয়োনেস্কো Absurdity বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। "Absurd is that which is devoid of purpose·········cut from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost ; all his actions become senseless, absurd, useless."

মানবজগৎ ও মানবজীবন সম্পর্কে এই অকিঞ্চিৎকরত্ব বোধই Absurdity, তা-ই বেকেট, আয়োনেস্কো, আদামভ, জেনেত্ ও এই জাতীয় অন্যান্য লেখকের মূল অবলম্বন।

মানবজীবনের অর্থহীনতার অর্থসন্ধান, জীবনাদর্শের হীন-মূল্যায়ন, ন্যায়-নীতি-পবিত্রতা প্রভৃতির স্থায়ী মূল্যচ্যুতি অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই Sartre, Camus, Giraudoux, Anouilh, Sylacrou প্রভৃতি অস্তিত্ববাদী লেখকদের রচনার মূল উপজীব্য। এই দৃষ্টিভঙ্গিই অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকারদের রচনারও মূলধন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাবসার্ড নাটকের দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে অস্তিত্ববাদ বা Existentialism. কিন্তু অ্যাবসার্ডবাদীদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য এই যে উদ্ধৃত লেখকরা মানবজীবনের নিরর্থকতা বা যুক্তিহীনতাকে অপূর্ব যুক্তি শৃঙ্খলাজালে বেঁধে প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। অ্যাবসার্ডবাদীদের রচনায় সেটি অনুপস্থিত।

বর্তমান যুগজীবনের জটিলতা ও নানা স্ববিরোধিতা—নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব

বিচিত্র চিন্তাচেতনা ও আদর্শ-সংঘাত, পারস্পরিক বিপরীত ভাবাদর্শের সংঘাতপূর্ণ সহাবস্থান মানবজীবনকে ভিতরে ভিতরে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত করে তুলেছে। অ্যাবসার্ড-বাদীরা এই সমস্যারই নাট্যশিল্পরূপ দিতে চান।

কাব্যনাটকে আভাঁ-গার্দে (avant-garde)-রীতির সঙ্গেও অ্যাবসার্ডবাদীদের সাদৃশ্য রয়েছে। আভাঁ-গার্দে-রীতিও স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন ও উদ্ভটকল্পনা-নির্ভর। এখানেও প্লট এবং চরিত্রসৃষ্টির বালাই নেই। কিন্তু পার্থক্য এই যে, এ রীতি মূলতঃ 'লিরিক্যাল' বা গীতিকাব্যিক। অ্যাবসার্ডবাদীদের রচনার মতো কিম্ভূত, বিদ্ঘুটে এবং সাংঘাতিক নয়। 'আভাঁ-গার্দে-রীতির ভাষা, বাণীবয়ন ও বাক্প্রতিমাও (image) লিরিক্যাল। অপরপক্ষে অ্যাবসার্ডবাদীরা ভাষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন প্রয়াসী বা বিশৃঙ্খলা-কামী। এঁদের রচনায় ভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে। কিন্তু স্ববিরোধিতা ও বহু অর্থ-মুখীনতাতেই এর সার্থকতা (!)। আয়োনেস্কোর বিখ্যাত The Chairs নাটকের সংলাপের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, সেই যেখানে শূন্য চেয়ারগুলোর উদ্দেশে উদ্ভট অথচ কবিত্ব-ঘন বাক্য উচ্ছ্রিত হয়েছে। এর মধ্যে চমক থাকলেও চমৎকারিত্ব নেই।

অ্যাবসার্ড নাট্যরীতি বর্তমানের এমন একটি আন্দোলন যার নাম দেওয়া যায়—সাহিত্য-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলন কিংবা জীবন-বিরোধী জীবন-বাদ। প্যারী শহর এর কেন্দ্র। এই নাট্যরীতির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবসার্ড চিত্ররীতি ও উপন্যাসরীতিও ফরাসী দেশে গড়ে উঠেছে। ফরাসী দেশ এর কেন্দ্রভূমি হ'লেও শুধু সে দেশেই এ রীতি সীমাবদ্ধ নয়। ব্রিটেন, স্পেন, ইতালী, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড ও আমেরিকার অনেক লেখকই এই রীতি বরণ করে নিয়েছেন। এঁদের অনেকে আবার প্যারীতেও বসবাস করেন। প্যারী শুধু ফ্রান্সের নয়, সারা পশ্চিমী দুনিয়ার তথা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংস্কৃতি-কেন্দ্র। চুম্বকের মতো নানা দিক-দেশের কবি সাহিত্যিকদের নিজের কেন্দ্রে টেনে এনেছে প্যারী। এছাড়াও, যাঁরা শিল্পীর 'স্বাধীনতা' চান, শিল্পের মধ্যে যাঁরা মানুষের মুক্তির সন্ধানী, তাঁরাও প্যারীতে ছুটে এসেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বাদীদের রাজধানী এই প্যারী। আইরিশ স্যামুয়েল বেকেট, রুমানীয় ইউজিন আয়োনেস্কো, আর্মেনীয়-রুশ আর্থার আদামভ্ প্যারীতে এসেই তাঁদের মনোমত স্বাধীনতা ও শিল্প সৃষ্টির স্বাদ পেলেন।

অ্যাবসার্ড নাট্যরীতির অন্যতম পুরোধা স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকটি সম্পর্কে এখানে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে এ নাট্যরীতির খানিকটা পরিচয় নেওয়া যাক।'

'Waiting For Godot' নাটকে কোন কাহিনী নেই, গতি নেই, সিচুয়েশন স্থির। "Nothing happens, nobody comes, nobody goes, its awful" (The Waiting For Godot, P.41) গ্রামের পথ। গাছতলা। দুই গৃহহারা ভবঘুরে ভ্লাদিমির ও এস্ট্রাগণ। প্রতীক্ষা করছে।—প্রথম অঙ্কের সূচনা এইভাবে।

প্রথম অঙ্কের শেষে ওরা একটি ছেলের মুখে জানতে পারল যাঁর সঙ্গে দেখা হবে ব'লে ওদের এতক্ষণ ধারণা বা বিশ্বাস ছিল সেই মিঃ গোডো আসতে পারবেন না। আগামীকাল তিনি অবশ্যই আসবেন।

দ্বিতীয় অঙ্কও একই ধাঁচের। একই পুনরাবৃত্তি। কেবল এর কথা ওর মুখে বসানো হয়েছে। এবারও ছেলেটি এসে একই ভাবে একই খবর দিল।

ভ্লাদিমির ও এস্ট্রাগণ পরিপূরক চরিত্র কিংবা একই চরিত্রের পরিপূরক ব্যক্তিত্ব। ভ্লাদিমির বাস্তববাদী। এস্ট্রাগণ কবি। গাজর খেতে গিয়ে এস্ট্রাগণ দেখল যতই খাচ্ছে, ততই খারাপ লাগছে। ভ্লাদিমির ঠিক উল্টো। সে যত খাচ্ছে তত ভালো লাগছে। এস্ট্রাগণ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। ভ্লাদিমির স্বপ্নের নামগন্ধ শুনতে পারে না। কিন্তু ভ্লাদিমিরই আশা ক'রে বসে আছে এক সময় মিঃ গোডো আসবেন, তাদের সব প্রতীক্ষার অবসান হবে এবং বর্তমান অবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্তনে মানুষের নিজের কোন ভূমিকা নেই, সে নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। এস্ট্রাগণ খানিকটা সন্দেহবাদী, সে এসব বিশ্বাস করে না। এমন কি 'গোডোর' নামটা পর্যন্ত ভুলে যায়। তবু সেও প্রতীক্ষারত।

আরও দুটো চরিত্র আছে। পোৎসো ও লাকি। তারাও পরিপূরক চরিত্র। একজন অত্যাচারী স্যাডিস্ট্ প্রভু, অন্যজন অত্যাচারিত দাস। এই দুজন যেন যথাক্রমে দেহ ও মন। কিংবা বাস্তব সত্তা ও অধ্যাত্ম-সত্তার প্রতীক। দেহের ক্ষুধার কাছে আত্মা বশ্যতা স্বীকার করছে—এরা তারই প্রতীক। এমনি নানাভাবে একে ব্যাখ্যা করা যায়।

গোডো (Godot)-শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ? এটি God-শব্দেরই অপভ্রংশ বা বিকৃত রূপ। যেমন পিয়ের থেকে পিয়েরট্, চার্ল্স্ থেকে শার্লট। এও তেমনি।

এই নাটকের বিষয় 'গোডো' নয়, বরং 'ওয়েটিং' বা প্রতীক্ষমাণতা। এই প্রতীক্ষমাণতাই এঁদের মতে, মানবজীবনের বা তার অস্তিত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অ্যাবসার্ডবাদীরা বলতে চান যে সারা জীবন ধরেই আমরা প্রতীক্ষা করি আর Godot হ'ল তারই প্রতীক যাকে বা যা' আমরা চাই, অথচ পাই না। তাকে কোন অ-লৌকিক অভূতপূর্ব ঘটনা, অপূর্ব বস্তু, অনায়ত্ত ঈশ্বর বা অবধারিত মৃত্যু—ইত্যাদি যে কোন নামেই চিহ্নিত করা যায়। আমরা যার জন্য প্রতীক্ষারত তিনি কে বা কি জানিনা। তবু তাকেই আমরা চাই।

অন্তহীন এ প্রতীক্ষা। এই প্রতীক্ষমাণতার মধ্যেই আমরা অন্তহীন কালপ্রবাহের বিশুদ্ধ রূপ উপলব্ধি করতে পারি। যখন আমরা ক্রিয়াশীল বা কর্মরত তখন আমরা সময়ের প্রবাহ বুঝতে পারি না। কিন্তু যখন আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতীক্ষারত, তখনই সময়ের গতি, শক্তি ও ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধি করি। এই অন্তহীন সময়-প্রবাহ উদ্দেশ্যহীন, আত্মঘাতী, মহাশূন্য, অর্থহীন, অ্যাবসার্ড। অ্যাবসার্ডবাদীরা এই অর্থহীন জীবন-জিজ্ঞাসারই রূপকার।

আজ শুধু ইউরোপে ও আমেরিকায় নয়, এই নবনাট্যরীতি পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের মঞ্চে ছড়িয়ে পড়ছে—ফিনল্যান্ড থেকে আর্জেন্টিনা, নরওয়ে থেকে জাপান, এমনকি ভারতবর্ষের পশ্চিম বাঙলায়ও।

এখন, এই নবনাট্যরীতি সাহিত্য হিসাবে, মঞ্চশিল্প হিসাবে এবং বর্তমান যুগের চিন্তা-চেতনার প্রকাশক হিসাবে কতখানি অর্থবহ সে বিচারের ভার সমালোচক ও দর্শক পাঠকদের ওপর।

হাল আমলে বাঙলা ভাষায় দুয়েকজন নাট্যকার ও দু'একটি নাট্যগোষ্ঠী এই রীতির নাটক নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

লক্ষ্য করবার বিষয় কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে, চীনে বা রাশিয়ায় অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম হয়নি। ধনবাদী দেশেই এ নাটকের জন্ম, বিকাশ ও পুষ্টি। ধনবাদী সমাজের অবক্ষয়ের যুগে অর্থাৎ ধনতন্ত্র যখন সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পেঁাছেছে, তখন তার দেবার কিছুই থাকে না। সাধারণ মানুষের ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া।

ধনতন্ত্রের তীব্র সংকটের যুগে মানুষের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ, কোথাও কোন আশার আলো নেই, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরাপত্তার অভাববোধ যখন সুতীব্র, তখনই অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম হতে পারে। হয়েছেও তা-ই। যদিও এর মধ্যে কৌলীন্য আনবার জন্য এর ভিত্তি একটা দার্শনিক প্রত্যয়ের ওপর প্রস্থাপিত হয়েছে, তবুও সেই দার্শনিক প্রত্যয়ও যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা-জাত সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই। এই দার্শনিক মতানুসারে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন আশাহীন, আলোহীন, লক্ষ্যহীন এক অনন্ত অন্ধকার। শুধু অস্তিত্বই সার। সে অস্তিত্বের কোন ইতি-নেতি নেই। অর্থাৎ, এক কথায়—অর্থহীন।

ধনবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যেকার দানবীয় শক্তির (titanic wealth) কাছে ব্যক্তিমানুষ (individual) নিতান্তই অসহায় ও অকিঞ্চিৎকর। এই অসহায়ত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব থেকেই একটা চূড়ান্ত নেতিমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। এই নেতিমূলক মনোভাবই অ্যাবসার্ড সাহিত্যের জনক। ধনবাদী দেশের কালচারের আমদানী এদেশে যাঁরা করেছেন তাঁরাই এই নাটকের প্রবক্তা। এর প্রভাবে অনেক সৎ লেখকও বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। যেমন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এককালে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রমুখ কয়েকটি অ্যাবসার্ড নাটক লিখলেও এখন অবশ্য তিনি এই ধরনের নাট্যরীতির গাড্ডায়-পড়া গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়েছেন। এটি খুবই আনন্দের কথা। আর একজন শক্তিমান নাট্যকার বাদল সরকার। তাঁর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক এককালে মঞ্চে ও বেতার-শ্রুতি-নাটকে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক বক্তব্য বেশিদিন মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না। তাঁর পরবর্তী নাটকগুলো তাই তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি মানুষ গ্রহণ করতে চায়না।

বাদল সরকার সম্প্রতি 'থার্ড থিয়েটার' নামে নবতর নাট্যনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত। কিন্তু এ ধরনের নাটকেও ভঙ্গিপ্রাধান্য ও শারীরিক কসরৎ-এর দিকটা বড় হয়ে বক্তব্যের দিকটা গৌণ হয়ে পড়েছে।

শক্তিমান মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও খ্যাতিমান বাদল সরকার ছাড়াও আরও দুয়েকজন 'মন্দ কবি যশঃপ্রার্থী' লেখক অ্যাবসার্ড নাট্যরচনার নামে আগাছার চাষে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে বার্ণিক রায়ের 'সময়ের ভিড়' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকের বক্তব্যহীন বক্তব্য, জীবন সম্পর্কে অর্থহীন শূন্যতাবোধ ও মর্বিডিটি আমাদের মনে হতাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, তিক্ততা, বিরক্তি ও ব্যর্থতাবোধের সৃষ্টি ক'রে এক অসুস্থ চিত্তবৃত্তির জন্ম দিয়ে থাকে। এবং নাট্যকার দুর্বল হ'লে নাটকটি মাতালের প্রলাপ বা পাগলের উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়। এজন্য বর্তমান ধনবাদী শোষণ-তান্ত্রিক সভ্যতা যে দায়ী সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিবিবেচনা বিসর্জন দিয়ে সেই ধনবাদী কালচারের সেবকই বা হবেন কেন এবং নতুন রীতি-পদ্ধতির মোহে বিভ্রান্তই বা হবেন কেন?

যদি বর্তমান যুগজীবনের সংশয়ময়তা ও অনিশ্চয়তা-বোধ কেটে যায়, মানবজীবনের পূর্ণ মূল্যবোধ ও জীবনের সার্থকতা দেখা দেয়, তখনও কি এই ধরনের নাটক লেখা হবে?—না। একদিন এই সুদৃশ্য, শোভন অথচ চমকপ্রদ আগাছার চাষ অবশ্যই নির্মূল হবে এবং সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্র ইতিবাচক জীবনের ফুলে ও ফসলে ভরে উঠবে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধু এ আশা মনে মনে পোষণ করলেই কি দায়িত্ব শেষ? বর্তমান কবি সাহিত্যিকদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই? সেই সুমহান দায়িত্ববোধ থেকেই তাঁরা সুস্থ জীবনবাদী, মানবতাবাদী বাস্তব সাহিত্যের চাষ ক'রে মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ধারায় নিজেদের যথাযোগ্য স্থান করে নেবেন। জীবনবাদী সাহিত্য-আন্দোলনের প্রবল জোয়ারে আর যা কিছু আবর্জনা খড়-কুটোর মতো ভেসে যাবে।

পরিশিষ্ট

অ্যাবসার্ডবাদী নাট্যকারদের কয়েকজন এবং তাঁদের নাট্যগ্রন্থ :

Samuel Becket : Waiting For Godot, End Game, All That Fall, Krapp's Last Tape, Embers, Act Without Words I, Act Without Words-II, Happy Days

Eugene Ionesco : The Bald Prima Donna, The Lesson, The Chairs, The Motor Show, The Future in its Eggs, Victims of Duty. How to Get Rid of It. The killer, Rhinoceros.

Harold Pinter : The Room, The Dumb Waiter, The Birthday Party, Caretaker, A Slight Ache, A Right Club, The Dwarfs.

Arthur Adamov : La Parodie, L' Invasion, Le Professeur, Taranne, The Pingpong.

Jean Jenet : The Deathwatch, The Maids, The Balcony, The Blacks, A Clown Show.

ঋণ স্বীকার : এই নিবন্ধ রচনা করতে গিয়ে Martin Esslin রচিত 'The Theatre of the Absurd' বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

কবিতায় বাক্-প্রতিমা : রবীন্দ্রানুসারী কবিগণ

"...It is better to present one image in a life than to produce voluminous works"—Ezra pound (Vide Meaning and Style—Stephen Ullman / 1973)

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব আস্বাদনের ক্ষেত্রে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদিকে অন্যতম প্রধান অবলম্বন মনে করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে কবিতার রূপনির্মিতি ও কবিকল্পনার রূপান্তরীকরণের রহস্য-সন্ধানে 'ইমেজ' একটি অপরিহার্য শব্দ। The Poetic Image গ্রন্থের রচয়িতা Cecil Day Lewis বলেছেন যে ছন্দ বা বিষয়বস্তু আধুনিক কালের কাব্য-রস-পিপাসু পাঠকদের কাছে মূল কথা নয়, ইমেজ-ই হলো কবিতার প্রাণ, কবিকে জানবার একমাত্র অপরিহার্য শক্তি।[1] কারণ, ইমেজের মধ্যেই কবিহৃদয়ের বা আত্মভাবনার উদ্ভাসন ঘটে থাকে। কবির জীবন বোধ, সমাজ বোধ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা সমস্তই কবিতার ইমেজে ধরা পড়ে।

Image কথাটির বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ হিসাবে রূপকল্প, চিত্রকল্প, বাঙ্-নির্মিতি, রূপনির্মিতি, বাক্-প্রতিমা ইত্যাদি বহু শব্দই প্রচলিত। 'বাক্-প্রতিমা' কথাটি ব্যবহার করেছেন ডঃ অমলেন্দু বসু[1]। কথাটি ইমেজের প্রতিশব্দ হিসাবে সুপ্রযুক্ত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং আমরা এই আলোচনায় Image অর্থে বাক্‌প্রতিমা শব্দটিই প্রয়োগ করব। কারণ চিত্রকল্প বললে দৃশ্য-অনুভূতির কথাটা যেন বেশি গুরুত্ব পায়। রূপকল্প বললে যেন গঠন-শিল্পের নির্মিতি বা Structure বা form বা ছাঁদ বা pattern-এর দিকটাই বড় করে দেখা দেয়। কিন্তু Image সৃষ্টির মধ্যে কবির সামগ্রিক সত্তা, চেতনা, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, অনুভূতি, সমাজচেতনা, শব্দচেতনা, চিত্রকল্প, রূপকল্প—সমস্তই যেন এক সঙ্গে ধরা পড়ে, এবং তা ধরা পড়ে শব্দ বা বাক্-এর মাধ্যমেই। তাই Image-এর বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ হিসাবে "বাক্-প্রতিমা" শব্দটিই যেন যথাযোগ্য বলে মনে হয়।

সংস্কৃত আলংকারিকেরা উপমা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, এত ধী-শক্তি ও মনস্বিতার পরিচয় দিয়েছেন যে ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ ইমেজ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামাননি। যুগে যুগে কবিগণ কত ইমেজ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ইমেজ কথাটির প্রয়োগ ও ব্যবহার নিতান্তই হাল আমলের। তাই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে কালিদাসের নিরুপমা উপমা, ভবভূতি-বাণভট্টের বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা উপমা-সৃষ্টি নিয়ে অলংকার-শাস্ত্রে কতনা উদাহরণ সমাহৃত হয়েছে, কিন্তু ইমেজ-সৃষ্টির রহস্য তাঁরা ধরতে পারেননি।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারকে কত ভাগেই না ভাগ করেছেন, সাদৃশ্যমূল, শৃঙ্খলামূল, ন্যায়মূল, গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূল, বিরোধমূল ইত্যাদি। তাঁরা উপমা নিয়ে এত চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করলেন অথচ 'ইমেজ' ব্যাপারটির তাঁরা কোন খোঁজই রাখেননি।

তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বস্তু সাদৃশ্যে কাব্য রচনার যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাতে আত্মভাবনার উদ্ভাসন অনুপস্থিত বা অলক্ষিত।

চেষ্টালব্ধ বক্রকৃততায় হয়ত কবিতায় দর্শনতত্ত্ব উপস্থাপিত করা যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিসর্গ বর্ণনার কবিতাও সম্ভব। কিন্তু 'ইমেজ' একান্তভাবে কবির নিজস্ব অনুভবশক্তির সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে যুক্ত। কবির কাব্যভাষা সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত-সংহত আকারে অনেকখানি ভাব-প্রকাশক্ষম। শব্দপ্রয়োগও ইঙ্গিতব্যঞ্জনাধর্মী। এ থেকেই নানাবিধ সাম্যমূলক অর্থালঙ্কারের সৃষ্টি। তাই উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির সাহায্যে বাক্-প্রতিমাও সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু সাদৃশ্য-মূলকতা বা সাম্যমূলকতাই বাক্-প্রতিমার ক্ষেত্রে প্রধান কথা নয়। কবি অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুত-পূর্ব সাদৃশ্যই আবিষ্কার করে থাকেন। যেমন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি সন্ধ্যার বর্ণনা ঃ

"দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে
ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যু শয়ন রক্ত-বমন করে
ওঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান ;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
সেই রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু উষার শিশিরমালা।

(কবির কাব্য/অনুপূর্বা/পৃঃ ৭৯)

অথবা, বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা— „ ৩
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা! (দুখবাদী)

এখানে হয়ত সাদৃশ্যমূলক সমাসোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেটিই বড় কথা নয়। এর মধ্যে একটি অদৃষ্টপূর্ব ও অভাবিতপূর্ব, চমকপ্রদ অথচ গভীর জীবন-বোধ ও জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বাক্-প্রতিমা আশ্চর্য সংকেত, ব্যঞ্জনা ও চিত্র ধর্মিতায় এবং প্রথাসিদ্ধ উপমা ইত্যাদির ব্যতিক্রমধর্মিতায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই এটি সার্থক ইমেজের উদাহরণ।

কিংবা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সন্ধ্যার বর্ণনা উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। যথা ঃ—

১. দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে / জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে / বাপের ঘরে চায়। (দিদি /খেয়া)

২. বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে। (কৃতজ্ঞ / পূরবী)

৩. আঁধার রজনী আসিবে এখনি / মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ-আলোক / পড়িবে ঢাকা। (নিরুদ্দেশ যাত্রা/ সোনার-তরী)

৪. নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা। (অশেষ / কল্পনা)

৫. ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা। (নিরুদ্দেশ যাত্রা/সোনার তরী)
অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে,

৬. বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া আছে চাহি
দিগন্তের পানে। (সন্ধ্যা / চিত্রা)

৭. "আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মত একত্র আসিয়া মিলিত হইল।" (মণিহারা / গল্পগুচ্ছ)

ইত্যাদি উদ্ভূতাংশের সন্ধ্যাবর্ণনায় চিত্রকল্পের বা বাক্-প্রতিমার যে নবীনত্ব ধরা পড়েছে, বলাবাহুল্য তা প্রথাসিদ্ধ বা প্রথাস্মৃত উপমা নয়। কবির একান্ত স্বকীয় অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত বাক্-প্রতিমা।৫

উপরিলিখিত 'প্রথাসিদ্ধ' ও 'প্রথাস্মৃত' কথাদুটি পেয়েছি ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ীর 'বাঙলা কাব্যে উপমালোক' গ্রন্থে। তিন ধরনের ইমেজের (তাঁর ভাষায় উপমা-র) কথা তিনি বলেছেন। প্রথাসিদ্ধ, প্রথাস্মৃত ও প্রথামুক্ত।

"প্রথাসিদ্ধ উপমার গোটা ক্ষেত্রটাই সংস্কৃত রাজত্বের করদরাজ্য। কবি কালিদাস সে রাজত্বের নগাধিরাজ। বাঙালী কবিচিত্তের অপ্রস্তুত কল্পনা-ভূমিতে কালিদাসীয় উপমার লীলা প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার কারণ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার নিদারুণ অসহযোগ। "কমল-বদনী রাধা, হরিণ-নয়নী "প্রথার ভান্ডার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মুদ্রার মুদ্রণ-মূল্য অচল হয়েছে, ধাতু-মূল্যটুকুই বা অবশিষ্ট। অন্ধ অনুকরণের মোহে বাঙালী কবির উপমা-প্রয়োগ কেবলমাত্র বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুল্যযোগ দেখিয়েই শেষ।" ৪

"প্রথাস্মৃত উপমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ ফল আরও একটু স্বচ্ছ। এখানে সংস্কৃত উপমার রূপ-শোভার একটা মডেল সামনে রেখে বাঙালী কবি স্বীয় জীবনভূমির অভিজ্ঞতাকে রূপমণ্ডিত করেছেন। একটা উদাহরণ দিই। নারীর দেহশোভা বর্ণনা করে বাঙালী কবি বললেন, "ডমরু সদৃশ মধ্য।" কালিদাস পার্বতীর দেহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "মধ্যেন সা বেদি বিলগ্নমধ্যা।" তপোবন-আদর্শের কবি কালিদাস

নারীর কটি দেশের উপমা চয়ন করেছিলেন তাঁর [illegible] অভিজ্ঞতা থেকে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের গ্রাম্য কবি বজ্রবেদি দেখেননি, দেখেছেন গাঁয়ের বাজনদারের হাতের ডুগডুগি। কিন্তু প্রথার স্মৃতি তাঁর এই নতুন প্রয়োগ-ভূমির মধ্যেই আভাষ দিল।...[৫]

এই প্রথাবন্ধ বা প্রথাস্মৃত উপমা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী (বীরবলের)-র একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যায়।

> "যে কথা হাজারবার শুনিয়াছি তাহা আর কার শুনিতে ভাল লাগে। আমার তো পদ্মের মত মুখ ইত্যাদি কথা শুনিলেই মনটা একটু অন্যমনস্ক হয় এবং ঐরূপ উপমা বেশিক্ষণ পড়িতে হইলেই হাই উঠিতে আরম্ভ হয়, কারণ ওসব পুরানো কথায় মনে কোন নির্দিষ্ট ভাব বা চিত্র আসেনা। শুনিবামাত্রই মনে হয় ওসব তো অনেকদিনই শুনিয়াছি, আবার অনর্থক ও কথা কেন? ভরসা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ বিষয়ে একমত।...[৬]

তবে একথা ঠিক যে সার্থক কাব্যসৃষ্টির পক্ষে উপমাদির উপযোগিতা অপরিহার্য। এ বিষয়েও প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) উক্ত প্রবন্ধেই বলেছেন :

> "উপমাদির দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয় : ১. ইহার দ্বারা একটি অস্পষ্ট ভাবকে স্পষ্ট করা যায়, ২. ইহার দ্বারা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ব্যতীত কোন দুইটি ভাব বা পদার্থের ভিতর আমার অলক্ষিত কোনরূপ মিল কেহ দেখাইয়া দিলে মনে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়।·[৭]

এখানেই নতুন উপমা বা প্রথামুক্ত উপমার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তা থেকে আসে ইমেজ বা বাক্-প্রতিমার প্রসঙ্গ।

"প্রথামুক্ত বা নতুন উপমা লোক-কাব্য-গুলির ক্ষেত্রেই বেশি। এ স্থানে কবি উচ্চ আদর্শলোক থেকে উপমান চয়ন করেননি। কামনান্তর সমোচ্চ হওয়ার ফলে উপমেয়-উপমানের রাজযোটক মিল দেখা দিয়েছে।·[৩] অর্থাৎ লোককবি কোন ক্লাসিক কাব্যজগৎ থেকে এ উপমা আহরণ করেননি। তাঁদের স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির জগৎ থেকেই আহরণ করেছেন। যথা :

> "বেলাইনে বেলাইয়া তুলছে দু'টি বাহুলতা
> কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কুকিলে কয় কথা।" (কমলা / ময়মনসিংহ গীতিকা)

এখানে কমলার সুগোল সুডোল বাহুর তথা দেহসৌষ্ঠবের বর্ণনা এবং কণ্ঠস্বরের মাধুর্য বর্ণনা করা হয়েছে সম্পূর্ণ প্রথামুক্ত উপমা-র সাহায্যে। অথচ কত সহজ, সরল, স্বতঃস্ফূর্ত ও অভাবিত-পূর্ব।

"Good images are as a rule unpremeditated and enjoyed as instantaneously as a good jest."[৯]

শব্দ ঃ

শব্দ বা ভাষাকে বাদ দিয়ে বাক্-প্রতিমা হতে পারেনা। শব্দের আশ্রয় নিতে হবেই। "শব্দেরা মৃত—কবিই তাকে উজ্জীবিত করেন, তখন সেই জীবন্ত শব্দেরা হয় মাল্টিক। কবি শব্দকে খুঁজতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে, স্মৃতিকে, অস্তিত্বের স্তর-গুলিকেই খোঁজেন। তাই এক-একটি শব্দের ভিতরে কবির সমগ্র সত্তার আলোড়নকে, সংক্ষোভ এবং শান্তিকে সংহত করে তোলাই কবির লক্ষ্য।"[১০]

এই কথাটাই কবি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতায় চমৎকার ধরা পড়েছে।—

"মানুষের ভাষা তবু অনুভূতি দেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কংকাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।"[১১]

ফুলের মধ্যে ফলের সম্ভাবনার মতোই ভাষার মধ্যেই কবিতার সম্ভাবনা নিহিত থাকে। "Poetry is thus embedded in language itself as the fruit is in the flower"[১২]

Ogden এবং Richards-এর কথা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত লেখক (V.K. Gokak) আরও বলেছেন, "Words evoke attitudes by their qualities, by the immediate emotional accompaniments due to past experience of them in their typical connexions and by the emotions which "arise through the recall of whole situation." A scientific or symbolic statement can hardly have any emotional effect."[১৩]

Vosslar-এর কথা উদ্ধৃত করে Gokak আরও বলেছেন,

"........language is the actress of the spirit, without whose voice poetry, and with it all human emotions, thought, desire and knowledge that strive to express themselves, would have to remain dumb."[১৪]

৬

কাজেই শব্দকে বাদ দিয়ে 'ইমেজ' হতে পারেনা। শব্দের শক্তি অপরিসীম। কিন্তু আলংকারিকগণ-কথিত শব্দের অভিধা-শক্তি বা অর্থশক্তিই সবটুকু নয়। শব্দপ্রয়োগের সার্থকতা তখনই, যখন তা' অনুভূতির প্রকাশক এবং কবির সামগ্রিক সত্তা থেকে উৎসারিত।

"We must not ask what it means, but what it feels like when we hear it. It is a fusion of imagination, speculation, learning and masterly verse techniques into one whole which is a work of art,"

...you ca nnot take an egg out of a cake that has been baked.'[১৫]

এই 'ইমেজ' সৃষ্টির মূলে কবি-চিত্তের কোন সচেতন প্রয়াস থাকেনা। কবির মগ্ন-

চৈতন্যান্তর বা অচৈতন্যান্তর থেকে এ উৎসারিত হয়। কারও মতে দৈবী-প্রেরণাই এই কাব্যসৃষ্টির মূলে। "The poet does not always consciously choose his image ; the image may choose him. The Psychologist will say that an image that insists on being used has sprung from the unconscious mind ; the romantic idealist will say that poet is divinely inspired."[১৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ'গ্রন্থের একস্থলে চিত্র-সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যা' বলেছেন তা' কবিতার ইমেজ-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।—"তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবন্ধ সাজাইবাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করে নেওয়া,—এই তো স্বয়ং দেখলুম।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতাংশের মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ইমেজ সম্পর্কে যা বলেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য :

> "কবিতার চিত্রকল্প হলো কবির চৈতন্যের এইরকম কবুলতির সংকেত—তাঁর চেতনার স্বাক্ষর, তাঁর প্রেরণার সৃষ্টি। কবি তাঁর ইন্দ্রিয় চেতনার মধ্যে যে বিশ্বকে গ্রহণ ও ধারণ করেন, সেই বস্তু-বিশ্বের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণের নানা উপকরণ থেকে তাঁর বিশেষ মর্জির প্রয়োজন অনুসারে এক-একরকম সাজাই বাছাই ঘটে থাকে। শব্দ ও ছন্দের ফ্রেমে এইরকম এক একটি ছবি এসে ধরা দেয়। সেই ছবির মাধ্যমে বহির্জগতের সংকেত পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে শুধু বহির্জগতের প্রতিরূপ মাত্র নয়, সে হলো কবিচৈতন্যের বিশেষ লগ্নের অভিব্যক্তি।"[১৮]

আর, পাঠকের কাব্যরসানুভূতির ক্ষেত্রে তার সত্তার অ-চৈতন্য এবং চৈতন্যের স্তরে যুগপৎ আনন্দ সংবিৎ জাগিয়ে তোলাও ইমেজের কাজ। "For the greatest poetic excitement, we need imagery that shall strike directly at the unconscious mind and also be worth analysis by the conscious reasoning mind." * * "The images affect us long before we have grasped the intellectual meaning."[১৯]

"চিত্রকল্পের সার্থক বিন্যাসের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে কবির ব্যক্তিত্ব,—তাঁর রূপানুভূতির বৈশিষ্ট্য,—তাঁর আবেগের প্রকৃতি, মননের ধারা, দূর্নিরীক্ষ্য অন্তরাত্মার অভিজ্ঞতা :"[২০]

C. Day Lewis বলেছেন,

> "Poetic image is a more or less sensuous picture in words, to some degree metaphorical, with an undernote of some human emotion in its context, but also charged with and

releasing into the reader a special poetic emotion or passion."[২১]

কিন্তু 'Special poetic emotion' হলেই শুধু হবেনা। কবির সেই emotion-এর যথার্থতা প্রমাণিত হতে হবে। নইলে বাক্-প্রতিমার যথার্থতাও স্বীকৃত হবেনা পাঠকচিত্তের রসানুভূতিতে।

৭

কবিস্বভাব অনুযায়ী বাক্-প্রতিমারও হেরফের ঘটে। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণ প্রভৃতি নানা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে নানা বাক্-প্রতিমার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতায় বাক্‌প্রতিমার সূচনামাত্র, তার পরিণতি আবেগঘনতায়। সে রহস্য যে কি তা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। কবির 'অপূর্ব' বস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' বা প্রতিভাই তজ্জন্য দায়ী। কবি ও কবিতার যথার্থ পরীক্ষা সেখানেই—অর্থাৎ প্রতিভার অকৃত্রিমতায়।

৮

চিত্রধর্মিতায় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় চিত্রকল্প বা বাক্-প্রতিমার আরম্ভ হলেও শেষ পর্যন্ত কবিতা আর চিত্র থাকেনা, তার সঙ্গে 'কল্প' বা কল্পনা যুক্ত হয়ে যায়—Image পরিণতি লাভ করে Imagination-এ। এখানে প্রধানতঃ fancy-র কথা এসে পড়ে। fancy কে আমরা বলতে পারি কল্পলীলা বা কল্পবিলাস বা কল্পনার বক্রপীড়া বা আ-কল্পনা। ইংরেজী সাহিত্যে Swinburne এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত fancy-র কবি। শব্দ ও ছন্দের দিকে বেশি আগ্রহের ফলে এ ব্যাপারটি ঘটে থাকে। "কোন একটি হৃদয়াবেগ (impulse) যথোচিত তীব্র না হওয়া অবধি কবির পক্ষে প্রতীক্ষা দরকার। তার অন্যথা হলে শব্দাধিকারবান কবি তাঁর সহজপটুত্বের গুণে শব্দের পর শব্দ বসিয়ে ছন্দ মিলিয়ে, শ্রুতিগ্রাহ্য পদ্য রচনা করতে পারেন, কিন্তু ভাব-ব্যঞ্জনাময় কবিতার সম্ভাবনা দূরে থেকে যায়। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় এরকম অঘটন অনেকবার ঘটেছে। এ দিক দিয়ে Swinburne-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। Swinburne-এর মতো তিনিও কেবলমাত্র শব্দের প্রসাদে মাঝে মাঝে চমৎকার কুহক সৃষ্টি করেছেন।"[২২]

Swinburne-এর এ ধরণের অজস্র কবিতা থেকে এমন দুয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(a) Sweet life, if life were stronger
Earth clear of gears that wrong her,
Then two things might live longer,
Two sweeter things than they;
Delight, the rootless flower,
And love, the bloomless bower;

Delight that lives an hour,
And love that lives a day.* *
* * Ah, one thing worth beginning,
One thread in life worth spinning,
Ah sweet, one sin worth sinning
With all the whole soul's will :
To lull you till one stilled you,
To kiss you till one killed you
To feed you till one filled you,
Sweet lips, if love could fill ;[২৩]

(b) We are in Live's land today :
Where shall we go ?
Love, shall we start or stay
Or sail or row ? * *
* * Our seamen are fledged Loves,
Our masts are bills of loves,
Our decks fine gold ;
Our ropes are dead maids' hair,
Our stores are love-shafts fair
And manifold."[২৪]

উদ্ধৃত কবিতাংশ-দুটিতে শব্দমোহ ও ছন্দসচেতনতা কবির মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে কবিতার ব্যঞ্জনার দিকটি গৌণ হয়ে কবিতায় কবির লঘু কল্পলীলাবিলাসই মুখ্য হয়ে উঠেছে। উদ্ধৃত কবিতা ছাড়াও Swinburne-এর A Ballad of life, A Match, In a Garden, A Swimmer's Dream, The Garden of Proserpine, A Ballad of Bath, Blessed Among Women, Dolores, A Child's Laughter প্রভৃতি কবিতার[২৫] নামোল্লেখ করা যায়, যে কবিতাগুলিতে সুইনবার্নের কবিস্বভাবের দোষগুণ-বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয়ে আছে।

৯

সত্যেন্দ্রনাথের ঝর্ণা, পাল্কীর গান, দূরের পাল্লা, সবুজপরী, ইলশেগুঁড়ি সিন্ধুতাণ্ডব, জর্দাপরী, ছন্দ-হিল্লোল বর্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভৃতি কবিতা এই fancy-র উদাহরণ।

এদের মধ্যে কল্পনার একটা লঘুচপললীলা বা ভাবসমুদ্রের উপরিভাগের তরঙ্গলীলাই মুখ্য। কিন্তু সত্যকার কবি-কল্পনা বা imagination-এর সঙ্গে জড়িত-মিশ্রিত থাকে কবির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা—দৃশ্য, স্পর্শ, শব্দ, ধ্বনি, স্বাদ, গন্ধ, স্মৃতি,

বেদনা, অভিজ্ঞতা, এবং সর্বোপরি ভূয়োদর্শন,—অর্থাৎ কবির সুগভীর জীবন-প্রত্যয়, এককথায় তাঁর সামগ্রিক সত্তা। কবির সুগভীর জীবনপ্রত্যয় থেকেই এই Image বা imagination এর জন্ম। যে-কবির জীবনপ্রত্যয় যত সুগভীর ও স্বতন্ত্র বা স্বকীয়, সে কবির image-ও তত সার্থক ও স্বকীয় এবং অভিনবও বটে। এই রকম সার্থক 'ইমেজ' বা প্রথামুক্ত নতুন উপমা যেখানেই কোন কবি সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সেখানেই কবি-প্রতিভার স্বকীয়তা ধরা পড়েছে। এমন 'ইমেজ' সৃষ্টি করতে পেরেছেন মধুসূদন, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (তাঁর "হের দেখ জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার "দ্রঃ)[২৬] রবীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র রায়, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিরা।

১০

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রমণীমোহন ঘোষ, সুখরঞ্জন রায় প্রমুখ রবীন্দ্রযুগের কবিদের কাব্যসৃষ্টির পরিমাণ বিপুল হলেও সার্থক ইমেজ তাঁরা খুব কমই সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এঁদের কাব্যসৃষ্টির অজস্রতা থাকলেও অনন্যতা ছিল না। এঁদের কবিতা মূলতঃ বক্তব্য-প্রধান বা didactic, রচনা ভাষা-বাহুল্য-দোষে দুষ্ট, ছন্দ ত্রুটি-বহুল। আন্তরিক ও সৎ আবেগ থাকলেও তা সংহত রূপ পেয়েছে খুব কমই। কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জগতে, কবির স্মৃতিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের বহুশ্রুত কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ এবং বিশেষ সুর ও ভঙ্গি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই এই তিন কবির নানা কবিতার প্রতিধ্বনি এঁদের কাব্যে শ্রুতিগোচর হয়। এঁদের সম্মিলিত প্রভাবে, তাঁদের, বিশেষ করে, প্রমথনাথের প্রতিভা ক্লিষ্ট হয়েছে। তিনি তাঁর স্মৃতি, অভিজ্ঞতা কাব্যরস-সংস্কার, স্বকীয় অনুভূতির জগৎ অনুসন্ধান করে যে ইমেজ সৃষ্টি করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ বা প্রথাস্মৃত। বলাবাহুল্য এ প্রথা সংস্কৃত-কাব্য-প্রথা নয়, "রবীন্দ্র" বা "দ্বিজেন্দ্র-প্রথা"। সেই কাব্যপ্রথা বা কাব্যপন্থাই তৎকালে প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই কোন ইমেজ সৃষ্টি করতে গেলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাঁরা রবীন্দ্র-কাব্য বা ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। ফলে বহু কবিতাই ব্যঞ্জনাহীন ফিকে হয়ে পড়েছে—লবণহীন ব্যঞ্জনের মত বিস্বাদ। তবু, বিপুল রচনা-সম্ভারের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁরা দু'একটি চমকপ্রদ চিত্রকল্প বা বাক্-প্রতিমা রচনা করতে পেরেছেন। কিন্তু তা' বড়ই স্বল্প। প্রমথনাথের কাব্য থেকে ইতস্ততঃ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

প্রভাতবন্দনা :

"ওই যে ধরা ফুটল হয়ে ফুল।
কিরণ অলি ঝাঁকে ঝাঁকে বসল লাগি পাথে পাথে
যেন মাতাল লাখে লাখে করছে হুলুস্থুল।"[২৭] (পাথার/৬৪ সংখ্যক কবিতা)

এখানে পৃথিবীকে ফুলের সঙ্গে এবং সূর্যের কিরণকে ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পৃথিবীকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করাতে চিত্রকল্পের বা বাক্-প্রতিমার নবীনত্ব ধরা পড়েছে। এছাড়া, এর মধ্যে কবির সৌন্দর্যমুগ্ধতা ও মত্ত ভ্রমত ও প্রকাশ

পেয়েছে—সত্যকার আবেগোচ্ছ্বসিত ভাষায়। ধরণী-পুষ্পের মধুরস পান করবার জন্য সূর্য-কিরণ-সমূহ যেন মাতালের মত হুলহুল লাগিয়ে দিয়েছে। এ কথার মধ্যে জীবনরসপিপাসু, মর্ত্যপ্রেমিক কবি-চিত্তেরই আন্তরিক আবেগ ধরা পড়েছে। চিত্রকল্প বা বাক্-প্রতিমার নবীনত্বই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

এই ধরনের একটি বাক্-প্রতিমার উদাহরণ মেলে কবি সতীশচন্দ্র (১৮৮২—১৯০৪)-রায়-এর একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতায়—

"কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল।
সেই আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর,
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা, গভীর অন্তর
বিদারি', অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান,
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান ;"[২৮]

অন্ধকারের এমন সুন্দর ও অভিনব বাক্‌প্রতিমা হতে পারে তা' আগে জানা ছিল না। 'ভ্রমর' কথাটির মধ্যে অন্ধকারের কৃষ্ণতা, 'বিপুল' কথাটির মধ্যে তার ব্যাপকতা বা বিস্তার, এবং "ধরণীর মধুময় ফুল" কথাগুলির মধ্যে কবির ধরণীর প্রতি ভালোবাসাই মূর্ত হয়েছে।—সে ধরণী আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুমের মতো সুন্দরই শুধু নয়, মধুময়ও বটে। ধরণী তাই কবির কাছে জড়পৃথিবী মাত্র নয়, এ ধরণী ফুলের মতোই সতেজ, সুন্দর 'কোমল ও মধু'ময়।

এককথায় কবিহৃদয়ের অপরিসীম মর্ত্যপ্রীতির সঙ্গে অনন্যদুর্লভ সৌন্দর্য-প্রিয়তাই প্রাধান্য পেয়েছে। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক বাক্-প্রতিমার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বাঙ্‌নির্মিতি ও রচনারীতিতে সংহতি, সংযম ও ক্লাসিক গাম্ভীর্য থাকাতে কবির রোমাণ্টিক-সৌন্দর্য মুগ্ধতা তথাকথিত কল্পলীলাবিলাসে বা fancy-তে পরিণত হয়নি। সত্যকার imagination-এর প্রকাশক হয়ে উঠেছে এবং তার ফলেই সার্থক বাক্‌প্রতিমা হয়ে উঠতে পেরেছে।

১১

প্রসঙ্গতঃ [illegible]ন্দ্রলালের একটি সূর্যাস্ত বা সন্ধ্যাবর্ণনার কবিতায়ও বাক্-প্রতিমা-সৃষ্টির নবীনত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবির স্বভাবসুলভ অনতিললিত অমসৃণ গদ্যান্বিত ভঙ্গিতে সূর্যাস্তের যে চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে তা প্রথাসিদ্ধ বা প্রথাস্মৃত উপমা (image) নয়। যথা ঃ

"সূর্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক অন্ধকারে লেগে ভেঙে গেছে/
চূর্ণ হয়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা ঝড়ে/শুয়ে আছে বর্ণগুলি চারিধারে
আকাশে ও মেঘে/ – যেন একটা বর্ণ-সৈন্য মরে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে।"[২৯]

প্রমথনাথের আর একটি কবিতায় পৃথিবীকে ময়ূরীরূপে বর্ণনা করায় বাক-প্রতিমায় নবীনত্ব দেখা দিয়েছে। যথা ঃ

"নেচে তুড়ি দেয়, নাচে ধরণী-ময়ূরী।"[৩০]

ময়ূরের বর্হের বিস্তার, বিচিত্র সৌন্দর্য বা সৌন্দর্যের বিচিত্র ও বহুবর্ণ বিস্তার, ময়ূরীর উল্লসিত নৃত্যপরতা ইত্যাদি আরোপ করা হয়েছে বহুবর্ণময়ী বিচিত্রসুন্দর এবং আনন্দোচ্ছলা (নৃত্যপরা) ধরণীর প্রতি। এখানেও কবির সৌন্দর্যমুগ্ধতা এবং পৃথিবীর প্রতি অকৃত্রিম-ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'তুড়ি দেয়' কথাটুকুর মধ্যে লঘু চটুলতা এসে কবিতার গাম্ভীর্য নষ্ট করে দিয়েছে। অথবা চন্দ্রোদয়ের বর্ণনা :

"ঈথর-পুরীর ফটিক হ্রদ ফুটায় শশি-কোকনদ।"[৩১]

—এই অংশে বিজ্ঞানচেতনা বা বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যমুগ্ধতা— একটি চমৎকার fancy-র সৃষ্টি করেছে। তার বেশি কিছু নয়।

আবার চাঁদের বর্ণনায় দেখি,—"আসে চাঁদ অমরার রজতের থালি
অন্ন দাও! অন্ন দাও! কাঁদে যেন খালি।"[৩২]

চাঁদকে ভিক্ষার থালি হিসাবে দেখার মধ্যে একটু চমকপ্রদ অভিনবত্ব আছে ঠিকই। কিন্তু রজতের থালিতে কোন ভিক্ষুক ভিক্ষা করেনা। ফলে একটু অসঙ্গতিদোষ ঘটেছে। আসলে সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি একটু সমস্যায় পড়েছেন। পূর্ণিমার চাঁদকে সত্যই তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ দৃষ্টিতে রুপোর থালার মতো মনে হয়েছে ;—এ অনুভূতির মধ্যে কোন খাদ নেই। আবার দেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, অন্নাভাব দেখে তাঁর সংবেদনশীল কবি-হৃদয়ে অন্নপ্রার্থী ভিক্ষুকের কথাও মনে হয়েছে। কিন্তু জমিদার প্রমথনাথের সে সুগভীর জীবনবোধ নেই। তাই সামগ্রিক কবি-সত্তা থেকে উৎসারিত নয় বলে এই অংশ শ্রেষ্ঠ imagination-এর উদাহরণ না হয়ে একটি fancy-র নিদর্শনমাত্র হয়ে রইল। পক্ষান্তরে প্রমথনাথের বহু পরবর্তীকালের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতার বহুল-পরিচিত পংক্তির—

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো-রুটি।[৩৩]

—এ অংশ পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩) ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের কবির সুগভীর জীবনপ্রত্যয় থেকে সমুদ্ভূত। যে কবি লেখেন,

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়।[৩৪]

জনজীবনের সঙ্গে যাঁর সুনিবিড় আত্মীয়তা, জনগণের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস রেখেই যিনি অকালে দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব—"পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো-রুটি।" কবি সুকান্তর সুগভীর জীবনবোধ ও সামগ্রিক সত্তা মন্থন করেই এ কবিতার জন্ম—তাই এটি সত্যিকার সার্থক বাক্-প্রতিমার উদাহরণ।

১২

এবার প্রমথনাথের কয়েকটি সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যাবর্ণনার উল্লেখ করা যাক ঃ

১. কিরণ-যন্ত্রে তার খসিয়ে যন্ত্রী গেছেন ভেগে,
পাখীর বাসা গুটায় যেমন বাদল গন্ধ লেগে।[৩৫]

২. মেঘের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে রবি নামছে ছুটে,
তারার সাঁকো বেয়ে বেয়ে চাঁদটি আসছে উঠে।[৩৬]

৩. আলোর সারেঙ্-তারে সন্ধ্যা চালায় আঁধার-ছড়ি।[৩৭]

৪. বেলার বাহু-ডোরটি খুলে কিরণ চোর ওই ভাগে,
নীরদ বঁধু হিমানীর ঠাঁই হঠাৎ বিদায় মাগে।[৩৮]

৫. খানায় পড়িছে ওই দেখ রবি/বেলা হয়ে যায় তল।[৩৯]

ইত্যাদি অংশের সঙ্গে পূর্বোধৃত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সন্ধ্যাবর্ণনা ও রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাবর্ণনার অংশগুলি মিলিয়ে পড়লেই সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। এখানে সূর্যাস্ত বা সন্ধ্যার রূপ সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির চিত্তে কল্পলীলা বা fancy-রই জন্ম দিয়েছে। কোন সুগভীর জীবনপ্রত্যয় বা কবির সামগ্রিক সত্তার উদ্ভাসন এদের মাধ্যমে ঘটেনি। জীবন ও প্রকৃতির উপরিভাগের কল্পলীলা-সৌন্দর্যরসেই কবি মানস চারণা করেছেন। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে fancy-র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেযুগের সমকালীন অনেক কবির মত প্রমথনাথও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন। "সত্যেন্দ্র-নাথের রচনায় ছন্দোবৈচিত্র্য প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ-নিষ্ঠ কবিযশঃপ্রার্থীরা নতুন আদর্শ দেখতে পেলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা এবং অন্যতর ভাবগ্রামের চর্বিত চর্বণের প্রয়াস পরিত্যাগ করে তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের পদ্ধতি অনুকরণে অভিনিবিষ্ট হলেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ তৎকালীন বর্ষীয়ান্ কবিরাও সত্যেন্দ্রনাথের কলা-কৌশলের সংক্রমণ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারেননি। মোহিতলাল-নজরুল ইসলামের রচনাবলীতেও সত্যেন্দ্র প্রভাবের স্বাক্ষর বিদ্যমান। কিরণধন চট্টোপাধ্যায় দাম্পত্য প্রীতি-মাধুর্যের কবিতাগুলি লেখার সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ বিস্মৃত হননি। হেমেন্দ্রকুমার রায় সত্যেন্দ্র প্রভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান এইসব কবি ছাড়া অন্যান্য অনেক নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।"[৪০]

"অন্যান্য অনেক নাম"-এর মধ্যে প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর নামও অবশ্যই করা যায়। সত্যেন্দ্র-প্রতিভার fancy-র দিকটি দ্বারা তিনিও প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্রমথনাথের জ্যোৎস্নারাতের আরেকটি বর্ণনা ঃ

"নয়ন মুদিলে দেহে লক্ষ আঁখি ফোটে শ্রবণ ঢাকিলে প্রাণ গান হয়ে ওঠে।"[৪১]

এ অংশে অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও সৌন্দর্যমুগ্ধতায় কবি সার্থক কবিতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

আবার ভোরের সমুদ্র বর্ণনা :

"কিরণ-বালকগুলি করতালি দিয়া, তরঙ্গ-দুলালগণে তোলে জাগাইয়া।[৪২]

কিংবা শশী-তারাখচিত নিদ্রিত নিশীথ-রাত্রির বর্ণনা :

"হের, নিশি দ্বিপ্রহরা ঘুমায়ে পড়েছে ধরা
নিদ্রা নাই নয়নে আমার,
তারা-বালিকারা ব্যোমে দোলাইছে শিশু-সোমে
টানি রশি কিরণ-দোলার।"[৪৩]

জ্যোৎস্না রাত্রির বর্ণনা : বাতাসে আজ সানাই বাজে/মেঘে মেঘে জ্বালায় "দিয়া"
রূপের আকাশ পড়ছে গলে/গড়া চাঁদের অশ্রু দিয়া।[৪৪]

ঝর্ণার জলধারার বর্ণনা : ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরণা ঝরে/শিলার বুকে মায়ের স্তন,
দিনের আলো ঘুমিয়ে পড়ে/শুনতে শুনতে
কলস্বন।[৪৫]

সূর্যালোকিত দীঘির বর্ণনা : ঘাসের ফ্রেমে আঁকা একটি চৌকো জলের ছবি,
আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাসছে সেথা রবি।"[৪৬]

নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ বর্ণনা : নিশীথের নভস্তলে শত শত মণি-জ্বলে
নক্ষত্রের বুক্তরাজ্য মহিমা ছড়ায়।[৪৭]

—ইত্যাদি উদ্ধৃতাংশে প্রমথনাথের কবিকল্পনায় fancy-র দিকটিই বড় হয়ে উঠেছে। আবার কোন কোন কবিতায় যেখানে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবিত সেখানে fancy-র দিকটি গৌণ হয়েছে, কবির লঘু কল্পলীলাবিভ্রম দূরীভূত হয়েছে, অপেক্ষাকৃত গভীর অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে। যথা :

১ তলহারা সাগরের মত/তাহার হৃদয়'
অসহ্য আলোক-ভরা আকাশের মত/তাহার প্রণয়।[৪৮]

২. দুটি ফুল্ল ফুলের মতো/ভাইবোন দুটি খেলা করে,
পাখী ডাকছে গাছে গাছে/ফুলের গন্ধে আকুল বন
মনটা তবু থেকে থেকেই/একটি দিকেই দেয় যে মন।[৪৯]

৩. তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধা সুধা ছন্দোবন্ধে সাধা
মনে হয় সদ্য সিন্ধু হতে
একটি অমর শ্লোক বিকীরিয়া দিব্যালোক
লক্ষ্মীসম উঠিবে জগতে।**
লতাকুঞ্জ পদতলে নির্ঝরিণী বহি চলে
অজগর নাগিনীর মত।**
বিচরে নিঃশব্দ মনে অরণ্য শ্বাপদ গণে
স্বভাবের ললিত দুলাল।**

বিচিত্র বসনে সাজি বধূসম তরুরাজি
করিতেছে মৃদু আলাপন।"৫০

ইত্যাদি অংশে সু-উচ্চ ও সুমহৎ কবিকল্পনার পরিচয় না থাকলেও অন্ততঃ এটুকু বলা চলে যে, এদের মধ্যে সত্যেন্দ্রীয় লঘুচপল কল্পক্রীড়ার প্রয়াস নেই। তাই মোটামুটি সুখপাঠ্য, সুখশ্রাব্য ও সুসহনীয়।

১৩

এছাড়া রবীন্দ্রানুসারী অন্যান্য কবিদের মধ্যে রমণীমোহন ঘোষ (১৮৭৪—১৯২৭) যেহেতু সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবিত, সেহেতু তাঁর রচনায় বাক্-প্রতিমা সৃষ্টির নবীনত্ব নেই। রবীন্দ্র-প্রতিভা তাঁকে সম্পূর্ণ রূপেই গ্রাস করেছিল। তাই তাঁর রচনায় রবীন্দ্রকাব্যের ভাব, ভঙ্গি ও সুরেরই অনুরণন শুনতে পাই।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও এবং ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভ করেও একমাত্র সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯০৪) তাঁর রচনায় কয়েকটি সত্যকার সুন্দর বাক্প্রতিমা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩—১৯২৭)-ও তাঁর স্বল্পপরিমাণ কাব্য রচনার মধ্যেও দু'একটি সার্থক ইমেজ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তবে তা' নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়। সুখরঞ্জন রায় (১৮৮৯—১৯৬৪), সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯২৯) ও মৃণালিনী সেন (১৮৭৯—১৯৩২) সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়।

কবির যে জীবনোপলব্ধির গভীরতা ও সামগ্রিক সত্তার আলোড়ন, সংক্ষোভ ও শান্তি-সংহতি থেকে সার্থক ইমেজের জন্ম, সেই স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি এইসব কবিদের ছিল না, বলাই বাহুল্য।

৬. জয়দেব / প্রবন্ধ সংগ্রহ / ১ম খণ্ড (১৯৫২) / প্রমথ চৌধুরী / পৃঃ ১২
৭. ঐ / ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৯
৮. বাঙ্লাকাব্যে উপমালোক (১ম খণ্ড) / ১৯৫৫ / ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী / পৃঃ ২
৯. Poetic Imagery/Henry W. Wells, Ph. D./Columbia University Press/1924/P.1
১০ কবিতা কল্পনা লতা / সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় / এসেম প[illegible] / ১৩৭৯ / পৃঃ ১২
১১. ১৯৪৬-৪৭ (কবিতার নাম) / শ্রেষ্ঠ কবিতা / নাভানা ১৯৬০ / জীবনানন্দ দাশ / পৃঃ ১৩৯—১৪০)
১২ The Poetic Approach to Language/ V.K. Gokak/Oxford University Press/ 1952 Edn./P.8
১৩. ঐ ঐ ঐ ঐ P.10
১৪. ঐ ঐ ঐ ঐ P.8
১৫. The Anatomy of Poetry/Marjorie Boulton/Routledge and Kegan Paul Ltd. London, 2nd Edn. 1955, / Page.10
১৬. ঐ ঐ ঐ /P 133
১৭. গদ্যছন্দ / ছন্দ / রবীন্দ্রনাথ / রঃ রচনাবলী / ১৪ খণ্ড / পঃবঃসরকার / পৃঃ ২৭০—২৭১
১৮. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ / ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র । ১৩৬১ সং / পৃঃ ২৮১
১৯. The Anatomy of Poetry/Marjorie Boulton/1955 Edn./ P. 134
২০ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র-এর পূর্বোক্ত বই / পৃঃ ২৮৩
২১ The Poetic Image/C. Day Lewis/1948 Edn./P. 22
২২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ / হরপ্রসাদ মিত্র / ১৩৬১ / পৃ ২৫০
২৩ BEFORE DAWN/SELECTIONS FROM A.C. SWINBURNE / 1920/P.77
২৪ LOVE AT SEA / -do- / -do-/P. 103
২৫ উক্ত গ্রন্থের 21,34,64,68,80,109,111,126 এবং 219 পৃঃ দ্রঃ
২৬ আধুনিক বাঙ্লা সাহিত্য / মোহিতলাল মজুমদার / ১৩৫৩ সং / পৃঃ ৭১—৭৬
২৭ প্রমথকাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ৩২১
২৮. নিশীথিনী / সতীশচন্দ্র রচনাবলী / ১৩১৯ / পৃঃ ৪১

২৯. সুবাস্ত / [illegible] রায় / প্রবাসী / ১৩১৫ / বৈশাখ / ৮ম ভাগ / ১ম সংখ্যা / পৃ ৩৪
('ত্রিবেণী' কাব্যে 'গোধূলী' নামে প্রকাশিত (প্রঃ দ্বিঃ রচনাবলী / ২য় খণ্ড / পৃঃ ৩৩৯)

৩০ পাথার / ৫ম সংখ্যক কবিতা / প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ২৩৮

৩১. পাথার / ২৭ সংখ্যক কবিতা / প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ২৬৮

৩২. পাথার / ১৪ সংখ্যক কবিতা / প্রমথনাথ রায়চৌধুরী কাব্য গ্রন্থাবলী / পৃঃ ২৪৯

৩৩ হে মহাজীবন / ছাড়পত্র / সুকান্ত ভট্টাচার্য / ফাল্গুন ১৩৭৮ সং / পৃঃ ৮৭

৩৪. রবীন্দ্রনাথের প্রতি / ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৮

৩৫. পাথার / ৮০ সংখ্যক কবিতা / প্রমথ কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ৩৪৭

৩৬. ঐ ৭১ ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৩১

৩৭. ঐ ৭১ ঐ / ঐ / ঐ / পৃঃ ৩৩১

৩৮ আমার টুনটুনি পাখী / পাষাণ / প্রমথ কাব্যগ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ১৭৬

৩৯. ফসলের গান / / / ১ম খণ্ড / পৃঃ ৫৮

৪০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ / হরপ্রসাদ মিত্র / ১৩৬১ / পৃঃ ২৩

৪১ পাথার / ২০ সংখ্যক কবিতা / প্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ২৫৮

৪২. পাথার / ১৪ সংখ্যক কবিতা / প্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ২৪৯

৪৩. পাথার / সংখ্যক কবিতা / প্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ২৩৩

৪৪. আদত বাহাদুর / পাথোর / প্রমথনাথ কাব্য গ্রন্থাবলী / ৩য় খণ্ড / পৃঃ ১৩০

৪৫ যাদুর পাষাণ / পাষাণ ঐ ঐ / ঐ / পৃঃ ১৫০

৪৬. পাড়াগাঁয়ে / ঐ ঐ / ১ম খণ্ড / পৃঃ ২৩—২৫

৪৭ ছোটোখাটো কথা / গীতিকা / ঐ ঐ / ১ম খণ্ড / পৃঃ ২৭১

৪৮. সে কি আমরাই / যমুনা / ঐ ঐ / ঐ / পৃঃ ৯৮

৪৯. যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় / প্রমথ কাব্যগ্রন্থাবলী / ১ম খণ্ড / পৃঃ ৪০

৫০. আদর্শ / প্রমথ কাব্য গ্রন্থাবলী / ১ম খণ্ড / পৃঃ ২৭৪

শারদীয় চতুষ্কোণ / ১৩৬৪

সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক : রবীন্দ্রোত্তর বাঙ্‌লা কবিতা

যে কোন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই আমরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দুটো ব্যাপারে মনোনিবেশ করি। তা হ'ল : বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় content ও form। প্রাথমিক দৃষ্টিতে আমরা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি না। কিন্তু একটু গভীরভাবে অনুধ্যান করলেই আমরা আঙ্গিক থেকে বিষয়বস্তুতে এবং বিষয়বস্তু থেকে আঙ্গিকে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারি।

১

স্থূল দৃষ্টিতে আমরা বিষয়বস্তুকে রচনার অন্তর্গত সারবস্তু এবং আঙ্গিককে তার বহিরাবরণ মনে করে থাকি। ফলের যেমন শাঁস ও খোসা। একটি ভেতরের ; আর একটি বাইরের। অর্থাৎ আমরা সাধারণত পৃথক্‌ভাবেই দেখি : সাহিত্য কি বলে এবং কেমন করে বলে। তার মানে, প্রচলিত শিল্পদৃষ্টিতে কোনও শিল্পকর্মের মধ্যে লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা, বাস্তববোধ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ধর্ম (বিশেষতঃ গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে) এবং জীবনদর্শন কতখানি সঞ্চারিত হয়েছে তা যেমন বিচার করি, তেমনি সে শিল্পকর্মের বহিরাবরণে কবির অনুসৃত বিভিন্ন প্রকরণগত কলাকৌশল বা রূপকর্ম, এক কথায় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণে ধরা পড়েছে তারও বিচার করে থাকি।

বিষয় ও আঙ্গিককে কখনও একীভূত করে কখনও বা সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা হয়। পৃথক ক'রে দেখার মধ্যে একটা বড়ো ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে। বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টিতে শিল্পবিচারের বড়ো কথা হচ্ছে, শিল্প হ'ল বস্তুজগতেরই ছন্দময় প্রতিফলন যা শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সামগ্রিকভাবে ঘটে থাকে, যার মধ্যে বিষয় ও আঙ্গিক একযোগে ধরা পড়ে।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে বিষয়বস্তুর কথাই ধরা যাক। বিষয়বস্তু কোথা থেকে আসে ? তাতে কি কি বিষয়ই বা ধরা পড়ে ? এর উত্তরে বলা যায় যে সাহিত্যে বাস্তব জীবনই ধরা পড়ে। কিন্তু শিল্পকলা বা সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ শিল্প-সাহিত্য বাস্তবজীবনের প্রতিফলন হলেও সেই বাস্তব জীবনের মধ্যে শুধু লেখকের সমকালই নয়, ঐতিহ্যও অনুস্যূত হ'য়ে থাকে। কিন্তু ভাববাদীদের কাছে ঐতিহ্য ব্যাখ্যার স্বরূপ ভিন্নতর। তাঁরা বস্তুজগতের পূর্বেই স্থান দিতে চান ভাব বা idea-কে। তাঁদের মতে idea>বস্তু>রূপ। অর্থাৎ ভাবই বস্তু গড়ে তোলে এবং বস্তু থেকেই রূপের উদ্ভব। এই ধারণা প্লেটো থেকে হেগেল পর্যন্ত বহু দার্শনিকের লেখায় নানা ভাবে নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

এই মতবাদ প্রধানতঃ দর্শনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুর্দমূল হয়েছে। কারণ সাহিত্য ও শিল্পে ভাব (idea) বা মানস ব্যাপার একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। এই ভাব বা মানস ব্যাপারেরও প্রকাশ ঘটে শিল্পের বহিরাঙ্গিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপায়ণে। ভাববাদীদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হেগেল আর্টের মানসগত (ভাবগত) ও বস্তুগত দ্বন্দ্বসম্পর্ক ও সেইসঙ্গে বিষয় (content) ও আঙ্গিকের (form) দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে ভাববাদী দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন।

কিন্তু মার্ক্সীয় সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ্‌গণ content ও form-এর দ্বন্দ্ব সম্পর্কে পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এই পার্থক্য ধরা পড়বে শিল্পের বিষয়বস্তুর উৎস ও চরিত্র-পার্থক্যের মধ্যে। মার্ক্সীয় মতে এই বিষয়বস্তু কোন দৈবপ্রেরিত ব্যাপার যেমন নয়, তেমনি বস্তু-নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালখুশির একান্ত মনোগত মনন ও অনুভূতি মাত্রও নয়। বিষয়বস্তু হল সামগ্রিক জীবনেরই প্রতিফলন। অর্থাৎ কোন শিল্পবস্তু বা রচনাকর্মের সঙ্গে লেখকের মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ কিভাবে ও কতখানি সম্পৃক্ত হয়ে আছে অর্থাৎ বস্তুজগতের অপরিহার্য দিকগুলি—তার সামাজিক সম্পর্কগুলি এবং ঐতিহাসিক গতিপ্রবাহ কিভাবে কতখানি দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে লেখকের রচনায় বা শিল্পকর্মে বিধৃত হয়েছে তার বিচার। শিল্পের বিষয়বস্তু এইভাবেই শিল্পকর্মের মধ্যেই ধরা পড়ে।

সাহিত্য বাস্তব জীবনেরই দ্বন্দ্বজটিল প্রতিফলন—এই বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক শিল্প-ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ লেনিনের টলস্টয়-সম্পর্কিত আলোচনাটি। টলস্টয়ের নীতিবাদী ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লেনিন তাঁর "ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্" গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে ন্যূন করে দেখেননি। কারণ সমকালীন জীবন বিশ্বস্ত বাস্তবতা নিয়ে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। লেনিনের মতে টলস্টয় "acted as the spokesman of the ideas and sentiments that emerged among the millions of Russian Peasants at the time the Bourgiois revolution was approaching Russia."

টলস্টয়ের রচনার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধ তা তাঁর ব্যক্তিগত স্ববিরোধ নয়, বরং তৎকালীন সংস্কার-(রিফর্ম)-পরবর্তী কিন্তু বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়ারই অত্যন্ত জটিল সামাজিক অবস্থার নানা টানাপোড়েন বা ঘাতপ্রতিঘাতেরই প্রতিফলন। কাজেই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হল দ্বন্দ্বজটিল জীবনেরই শিল্পরূপায়িত সারসত্য (essence)।

২

কিন্তু বস্তুবাদী শিল্পদর্শন শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, আঙ্গিকের মধ্যেও লেখকের সমকালীন বাস্তবজীবনের প্রতিফলন দেখে থাকে। আঙ্গিক ত' শুধু বিষয়বস্তুক ধরে রাখার পৃথক কোন আধার মাত্র নয়, যদিও প্রকরণগত বিশেষ শিল্পকৌশলে ও শব্দের সাহায্যেই এর অবয়ব গড়ে ওঠে। কিন্তু এই অবয়ব গড়ে ওঠে বিষয়বস্তু অনুসারেই। কাজেই এ শুধু আঙ্গিকের গঠনধর্ম নয়, বিষয়বস্তুরও গঠনধর্ম। তবে

দেশকালের কাছে লেখক শুধু বিষয়[illegible] জন্য ঋণী, আর আঙ্গিক তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি, এই ধরনের বিভাজনটাও ঠিক নয়, বড় বেশি সরল ও যান্ত্রিক।

বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর কোন পৃথক মূল্যায়ন করা সত্যই কি সম্ভব? না, কোন সমালোচক তা' করে থাকেন? সাহিত্যে আমরা যা চাই, যা পাই, তা তো শুধু বিষয়বস্তু নয়, তা লেখকের অভিজ্ঞতা ও জীবন-সমূখ সাহিত্যের উপাদান। অর্থাৎ তার মধ্যে লেখকের সমাজচেতনা, বাস্তব জীবনবোধ বা জীবনদর্শন যেমন পাই, তেমনি তার অবলম্বিত ভাষা, অনুসৃত কাব্যরীতি—ছন্দ, অলংকার ইত্যাদিকেও পাই। সবই সেই এক উপাদানেরই অঙ্গীভূত। শিল্পকর্মের অবয়বের অন্তর্গত সেই উপাদানকেই আমরা অবয়বের ভেতর থেকেই বিশ্লেষণ করে থাকি।

মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা ধরা যাক। মোহিতলাল বলেছেন, এই কাব্যের আঙ্গিক ইউরোপীয় ক্লাসিক্যাল কাব্যের অনুসারী, আর বিষয়বস্তু ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতির। কিন্তু এই জাতীয় বিভাজন নিতান্তই যান্ত্রিক ও সরলীকরণ দোষে দুষ্ট। অথচ মোহিতলালই বলেছেন যে মেঘনাদ বধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভিত্তি হল বাঙলা পয়ার ছন্দের কাঠামো। তাই যদি হয় তবে মেঘনাদ বধ কাব্যের আঙ্গিকও সেই কাব্যের উপাদানের মতোই দেশি, বিদেশী নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে আধুনিকতা, বৈপ্লবিকতা বা যুগচ্ছন্দ আবিষ্কারের চেষ্টা থাকতে পারে, তাই বলে সেটি বিদেশী নয়। মিল্টনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবও থাকতে পারে, থাকাটাই স্বাভাবিক, তাই বলে মধুসূদন যা সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর দেশকালকে আত্মস্থ করেই সৃষ্টি করেছেন। দেশকালের সম্মতি ছিল বলেই সেটি সার্থক কাব্য এবং মধুসূদন যুগন্ধর কবি।

শিল্পকর্মের সামগ্রিক অবয়বের মধ্যে বাইরে থেকে যে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পড়ে, তাকে রূপান্তরিত করেই সাহিত্য আমাদের সামনে হাজির করে। শিল্পকর্মের ভিতরে ও বাইরের সমস্ত উপাদানগুলিতেই তার চিহ্ন থাকে। অর্থাৎ শিল্পকর্মের একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। কিন্তু একে লেখক পেলেন কোথা থেকে? অবশ্যই সমাজ জীবন থেকে। অর্থাৎ লেখকের সমাজবোধ বা সমাজ চেতনার চাপে আঙ্গিকও বদলে যায়। অর্থাৎ সমাজ > সমাজ চেতনা > পরিবর্তন (লেখকের সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার মিশ্রণে) > সাহিত্যের বিষয় > আঙ্গিক।

মেঘনাদ বধ কাব্যের সমগ্র কাব্যদেহই এই পরিবর্তিত রূপের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এর পেছনে রয়েছে উনিশ শতকীয় বাঙলা দেশ—যেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে প্রচুর অর্থ সম্পত্তি লাভের সুযোগ থাকলেও বিনিয়োগের সুযোগ সীমাবদ্ধ, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট জমিদার, বণিক, মুৎসুদ্দি, ইংরেজি শিক্ষিত কেরানী, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য নানা সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হচ্ছে অথচ গণ-আন্দোলনের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। অর্থাৎ একদিকে বণিকী পুঁজি ও সদ্য উদীয়মান আত্ম[illegible] জাতীয় পুঁজির দ্বন্দ্ব সবে শুরু হয়েছে। কিন্তু

সাম্রাজ্যবাদের ছত্রছায়ায় সামন্ততন্ত্র তখনও বিরাজ করছে বলে জাতীয় পুঁজির বিকাশ রয়ে গেছে খণ্ডিত ও পঙ্গু। এই অবস্থায় ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার আত্মপ্রকাশের ব্যর্থতা ও অসন্তোষ নিয়ে জনজীবন থেকে বিযুক্ত (alienated)। রাবণ চরিত্রে এই ট্র্যাজিক বিযুক্ততার মধ্যে তৎকালীন বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনেরই বিযুক্ততাবোধ প্রতিফলিত। তাই, সমকালীন জীবনের সবটুকু দ্বন্দ্ব-সংঘাত আত্মস্থ করেই মধুসূদনের কাব্যের আঙ্গিক গড়ে উঠেছে।

আঙ্গিকের সঙ্গে লেখকের মানস-চেতনা-সঞ্জাত বিষয়বস্তুর যেমন একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, আবার তেমনি দুয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বা বিরোধও আছে। আঙ্গিক পরিবর্তিত হয় আবার সে পরিবর্তনকে ঠেকিয়েও রাখতে চায়। এ যেন অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে বলা যায়—

> ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
> গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
> সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে
> ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

(উৎসর্গ | ১৭ সংখ্যক কবিতা)

তাই, বিষয়বস্তুর বদল ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই আঙ্গিকের বদল ঘটে না। এই পরিবর্তন অনেক সময় ধরে জটিল ও মন্থরগতিতে ঘটে। লেখকের সমকালীন জীবন, দেশ-বিদেশের ঐতিহ্য আত্তীকরণ শক্তি ও তার সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জন্ম ও পরিবারগত জীন্ (Gene)—সব কিছুর ঘাত-প্রতিঘাতেই লেখকের সমাজচেতনা তথা জীবন-চেতনা কিভাবে কতখানি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠবে তার ওপরেই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিশেষত্ব নির্ভর করে।

অর্থাৎ সমকালীন যুগ+শিল্পগত ঐতিহ্য+কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা কবির জন্ম ও পরিবারগত Gene=কবির সমাজচেতনা। এই সমাজচেতনা থেকেই শিল্পের উদ্ভব। চেতনার বিবর্তন থেকে আঙ্গিকেরও বিবর্তন ঘটে। এটি সরাসরি বা তাৎক্ষণিক ভাবে না ঘটলেও লেখকের চিত্তক্ষেত্রে এক জটিল মানস-রাসায়নিক (Psycho-chemical) প্রক্রিয়া বা মানস-জগতের দ্বান্দ্বিক নিয়মের অনিবার্য ফলেই ঘটে থাকে।

তাই আঙ্গিকের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা, অর্থাৎ আঙ্গিকের দুর্বলতা মানে লেখকের সমাজচেতনারই দুর্বলতা।

তিন

পূর্বকথিত লেনিনের বিশ্লেষণ থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বস্তুজগৎ থেকে গৃহীত উপাদান লেখকের বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে আত্মীকরণ করেই সত্যকার সাহিত্যের বিষয় ও রূপবন্ধ গড়ে ওঠে। শিল্পগত বিষয়ে ও রূপবন্ধে এইভাবে তাদের মধ্যকার থীম (theme) এবং থীম থেকে উদ্ভূত মননগত নানা সমস্যাবলী (ideological problems) এবং আবেগ-অনুভূতিগত সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসা এক অখণ্ড ঐকসূত্রে বিধৃত হয় থাকে। শুধু তা-ই নয়, এক বিশেষ সামাজিক লক্ষ্য ও অভীপ্সার দিকেও তা অঙ্গুলি সংকেত করে। গর্ভস্থ ভ্রূণের জীন্ (Gene) এবং আকৃতি অনুসারে যেমন এক এক রকমের সজীব আকৃতিবিশিষ্ট জীবদেহ গড়ে ওঠে, তেমনি বিশেষ শিল্পের মূল প্রজাতি বা জাতি-প্রকৃতি (Genre) ও রূপাকৃতি অনুসারেই content ও form একযোগে গড়ে ওঠে। এই content ও form জীবনের বাস্তব উপাদানের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। কিন্তু সব সময় মনে হয় যে content ও form যেন জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে আছে, অথচ তা অখণ্ড জীবনেরই প্রতিফলন। এইজন্য content ও form এক ও অবিভাজ্য হওয়া সত্ত্বেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচার করবার প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে।

এই প্রতিফলন কেবলমাত্র জীবনের প্রতিফলন নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। শুধু থীম্ বা প্লট বললেই তাকে বোঝানো যাবে না। বরং থীম বা প্লটের মধ্য দিয়েই জীবনের এক বৃহত্তর তাৎপর্য এতে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই মহৎ শিল্প মাত্রেরই একটা আদর্শগত মাত্রা ও গুরুত্ব থাকে। দর্শন শাস্ত্রের মতো সাহিত্য-শিল্প যদিচ সমস্ত জগৎ ও জীবনকে এক অখণ্ড ঐক দৃষ্টিতে দেখতে চায়, তবু এদের মধ্যে পার্থক্যও আছে। দর্শন জগৎ ও জীবনকে কতকগুলি সাধারণ প্রত্যয় বা concepts-এর মধ্যে আনতে চায়, কিন্তু আর্ট তাকে দেখতে চায় নানা রূপের মধ্যে—যেমন করে সূর্যের আলো ধরা পড়ে এক ফোঁটা জলের ওপর, ধানের শিষের শিশির বিন্দুর ওপর, অথবা জীবনের আলো-অন্ধকার যেমন করে ধরা পড়ে মানুষের চোখের মুখের হাসিকান্নার আলোছায়ায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শিল্প শুধু এ সমস্তের বর্ণনামাত্র দেয় না, তা জীবনের সারসত্য (essence)-কেই তুলে ধরে। প্লেটো-অ্যারিস্টটল কথিত অনুকরণবাদের সঙ্গে আর্টের সম্পর্কের সুপ্রাচীন উক্তি মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এ তো শুধু জীবনের উপরিভাগের প্রতিফলন নয়, আয়না বা ফটোগ্রাফিও নয়, এ হল জীবনের গভীর মর্মমূলে অনুপ্রবেশেরই শিল্পগত ধারণার ফল।

'ফর্ম্' যেহেতু বাস্তব জীবনেরই সমতুল্য সেহেতু অতি প্রাচীন অথবা উৎকট রকমের উদ্ভট নূতন ফর্ম রচনার মধ্যে জোর জবরদস্তি করে যেমন আমদানী করা যায় না, তেমনি জীবন-সম্পৃক্ত স্বাভাবিক, বাস্তবানুগ-ফর্ম বা রূপকর্মের সঙ্গে অবাস্তব, অবিশ্বাস্য, পশ্চাদপদ বা কৃত্রিম বিষয়েরও সঙ্গতি হয় না। পচাগলা মৃতদেহে যেমন অলংকার পরিয়ে লাভ নেই।

চার

আজকাল কবিতাবিচারে বা কবিতার রসাস্বাদনে 'ইমেজ' একটি অপরিহার্য শব্দ। কিন্তু এই ইমেজ বাইরে থেকে কবিতার গায়ে জুড়ে দেওয়া যায় না। তা কবিতার সমস্ত অস্তিত্বের সঙ্গে, তথা কবির সামগ্রিক অস্তিত্ব, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার—এক কথায় কবির সমগ্র সত্তার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। গোলাপ গাছে তার অস্তিত্বের মর্মমূল থেকে প্রাণরস শোষণ করে গোলাপই ফুটবে, পদ্মফুল বা ঘেঁটুফুল নয়। কিংবা বাইরে থেকে অন্য কোন ফুল এনে গোলাপের ডালে লটকে দিলেও গোলাপ ফুল ফুটবেনা। ফুল ও ফলের রং ও গন্ধ তার ভিতরের গঠন-প্রক্রিয়ার বিশিষ্টতা থেকেই আসে। বাইরে থেকে রং ও গন্ধ জুড়ে দেওয়া যায় না। অন্তর-বাইরের টানাপোড়েনেই ফুল ও ফলের ভিতর-বাহির দুইই গড়ে ওঠে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে।

কবিতার সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একথা বলা চলে। কবিপ্রতিভার অন্তর্নিহিত জটিল মানস-প্রক্রিয়ার নানা টানাপোড়েনেই কবিতার ভিতর-বাহির একই অপৃথগ্-প্রযত্নে গড়ে ওঠে।

এখানেই-সাহিত্যের 'প্রকাশ' কথ্যটা আসে। এর ইংরেজী হল "Expression". কথাটা এসেছে লাতিন "Expresso" শব্দ থেকে, যার অর্থ হল—"to press out". কিন্তু বাঙলা 'প্রকাশ' কথাটার মধ্যে রয়েছে 'প্র—কাশ' অর্থাৎ যা প্রকৃষ্ট রূপে 'কাশ' অর্থাৎ দীপ্তি পায়। কথাটি তাই সুন্দর। কিন্তু 'Expression'-শব্দের মধ্যে খানিকটা যেন যান্ত্রিকতা বা বলপ্রয়োগের ইঙ্গিত আছে। প্রকাশ শব্দের ক্ষেত্রেও হয়ত আছে। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ ভেতরের ব্যাপার। প্রকৃষ্ট রূপে যা শোভমান তা-ই প্রকাশ। কিন্তু কোন্ গুণে? কোন্ শক্তিতে? উত্তর হল ভিতরের গুণেই, ভিতরের শক্তিতেই। কবিচিত্তের অন্তঃপুরে নানা অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জটিল ও বিমিশ্র মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনেই তার জন্ম। যেমন 'আকাশ'। সূর্যের ভিতরকার প্রচণ্ড জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের অকল্পনীয় উত্তাপ ও উত্তপ্ত বস্তুপুঞ্জের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেই দীপ্ত হয়ে ওঠে আকাশ। আকাশ শব্দের অর্থ "আ"-অর্থাৎ আ-বিশ্বজগৎ ব্যাপ্ত করে যা "কাশ্" বা দীপ্তি পাচ্ছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি Content ও form-এর দ্বন্দ্ব ভিতর-বাইরের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে ও টানাপোড়েনে শেষ পর্যন্ত এক সার্থক ও সম্পূর্ণ রচনার মধ্যে নিষ্পত্তি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে প্রকৃষ্ট রূপে দীপ্তি পেতে থাকে অর্থাৎ সার্থক 'প্রকাশ'-লাভ করে। সূর্যের ভিতরকার প্রজ্বলন্ত বস্তুপিণ্ড ও সূর্যের দীপ্তি যেমন পৃথক্ হয়েও পৃথক্ নয়, তেমনি সাহিত্যের ভাববস্তু ও প্রকাশ পৃথক্ হয়েও একই যোগে একই দেহে বিধৃত। এখানেই content ও form-এর মূল তত্ত্ব নিহিত।

পাঁচ

আধুনিক কবিতার নান্দীপাঠ শোনা গেল রবীন্দ্রযুগেই, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইস্‌লামের লেখায় ১৯২২-২৩ সনে। ১৯২৩-এ প্রকাশিত 'কল্লোলে' তার প্রস্তাবনা এবং তিরিশের দশকে তার যাত্রারম্ভ। রবীন্দ্রনাথকে প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্ন করেই তার শুভযাত্রা। 'রবীন্দ্র-বৃত্ত থেকে বের হবার প্রাণপণ চেষ্টা। আবার-রবীন্দ্র-বৃত্তেই ফিরে আসা। রবীন্দ্র কাব্যের সোনার খাঁচায় সোনার শেকলে বাঁধা পাখীর মতোই তাঁদের অবস্থা। শেকল ছেঁড়ার ইচ্ছা, উড়বার বাসনা, আবার খাঁচাতেই আত্মসমর্পণ। যেখানে তাঁরা রবীন্দ্র-বিরোধী বলে নিজেদের উচ্চকণ্ঠে জাহির করেছেন সেখানে তাঁরা অনেকাংশেই রবীন্দ্র-গোত্রীয়। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের কবিতা—

'আমি তো ছিলাম ঘুমে
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কি উদাত্ত মোহমন্ত্র
মোর কানে কানে।'

এবং 'সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর / আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো/যুগসূর্য ম্লান তার কাছে।'

অথবা বিষ্ণু দে'র 'সে কথা তো জানি
তোমাতে আমার মুক্তি নেই
তবু বারে বারে তোমারি উঠানে
যাওয়া আসা।'

কিংবা অরুণ মিত্রের 'ভোঁতা হয়ে গেছে পুরাণো কথার ধার / যুগান্ত উৎকর্ণঃ
এখনি পড়ো নতুন ইস্তাহার।'

এইভাবে প্রতিক্রিয়া ও আত্মসমর্পণ, বিদ্রোহ ও ভক্তির দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দিয়েই এঁরা অগ্রসর হয়েছেন।

দুঃখ মিথ্যা, জীবন অমেয়, শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক, দুঃখ দৈন্য ঘেরা অশ্লীল দিনরাতের শেষেও আছে 'চিরদিবসের শান্ত শিবের বাণী', 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে / তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে' —ইত্যাদি কথা রবীন্দ্রনাথ এতবার এত সুন্দর করে বলেছেন তাঁর অজস্র গানে ও কবিতায় যে রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকমাত্রই তা' জানেন। সেই রবীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে এড়াতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু যখন লেখেন,

'তবু জীবনের বিজয়ী মাধুরী
কমবে না এক তিলও।'

অথবা যখন লেখেন, 'আহা সুন্দর এ পৃথিবী এ জীবন
বিনা মূল্যেই অমূল্যতম দান'—

—তখন সন্দেহ থাকেনা যে রবীন্দ্র কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিককে এড়াতে চেয়েও রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে তাঁরা আত্মসাৎ করেছেন বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই। কিংবা অমিয় চক্রবর্তী যখন লেখেন, "ঘাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে" ; অথবা জীবনানন্দ যখন লেখেন, "শুনেছি কিন্নর কণ্ঠ দেবদারু গাছে, / দেখেছি অমৃত সূর্য আছে।" / অথবা "'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে / চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষন্ন হৃদয় ; / জয়, অস্ত সূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়"— তখন সন্দেহ থাকে না যে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এঁরা রবীন্দ্র প্রভাবকেই আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। রবীন্দ্র কাব্যাঙ্গিককেও সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি।

এছাড়া তিরিশের দ্বিতীয়ার্ধ ও চল্লিশের দশক থেকে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনা, বিশেষ করে বামপন্থী চিন্তাচেতনা দেখা দিল তার অব্যবহিত প্রেরণা অবশ্যই তৎকালীন ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের ক্রমপ্রসার ও মার্ক্সীয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব-জাত। সেই সঙ্গে গোর্কী, মায়াকভ্স্কি, নেরুদা, পল এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রমুখের রচনার সঙ্গেও ঘটল বাঙালী লেখকদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-ব্রাত্যজনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে গভীর মমত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও উদার মানবিকতাবোধ ছিল, তার প্রভাবও কি আধুনিক বাঙালী কবিদের ওপর একেবারে নেই? অর্থাৎ এযুগের কবিদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা তথা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের ওপরেও রবীন্দ্রনাথ তখনও অনেকখানি আধিপত্য করেই চলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০-এ রাশিয়ায় যান, রাশিয়ার চিঠি ১৯৩১-এ বেরোয়। ১৯৩৬-এ প্রগতি লেখক সংঘে যোগ দেন। ১৯৪১-এ লেখেন 'ঐকতান' (জন্মদিনে) 'ওরা কাজ করে' (আরোগ্য) ও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ।

আধুনিক কবিরা যখন শ্রমিক কৃষকের কথা লেখেন তখন যেন রবীন্দ্রনাথের ভাবভাষাই অল্পবিস্তর আত্মসাৎ করে নেন। এমনকি 'আমি কবি যত কামারের' এবং 'আমি কবি যত কর্মের আর ঘর্মের' বলে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র যতই উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা করুন না কেন, এর মধ্যে কবির রবীন্দ্রীয় রোমান্টিক অভীপ্সা এবং সেইসঙ্গে হুইট্‌ম্যানীয় ভাষণ ধর্মিতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বাস্তব জীবনের কর্ম ও জীবন-ধর্মের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ, কোথায় যেন প্রাণের অভাব। আবার যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে প্রাণপণে এড়াতে চাইলেন তাঁরাই অগত্যা হাত বাড়ালেন ইউরোপীয় কাব্যপ্রকরণের দিকে। অর্থাৎ আঙ্গিকের দিকে।

কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন ১৯৪০ সনে 'পদাতিক' ও অতঃপর 'চিরকুট' কাব্য নিয়ে বাঙলা কাব্যের অঙ্গনে এলেন তখন বাঙলা কাব্যভাষার নতুন ভঙ্গি ও নতুন স্বরায়ন (intonation) শোনা গেল। এরজন্য তাঁকে তিরিশের কবিদের মতো ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি। রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে গিয়েই

তিরিশের কবিরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সুররিয়ালিজম্, কিউবিজম্, ফবিজম্, ডাডাইজম্ ইত্যাদি নতুন কাব্যরীতির অনুবর্তন ক'রে অল্পবিস্তর সফলও হয়েছিলেন নতুনত্বের চমক সৃষ্টি করে। কিন্তু বিদেশী সাহিত্য তাঁরা যে পরিমাণে উদরস্থ করেছেন, সে-পরিমাণে আত্মস্থ করতে পারেননি। এখানেই সমস্যা। তিরিশের কবিদের পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য, মনীষা ও প্রৌঢ় পক্কতা তথা মনস্বিতা অসাধারণ, কিন্তু দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয় বলেই জনগণমানসে তা তেমন ভাবে গৃহীত হয়নি বা সাগ্রহ সমাদর লাভ করেনি। তার কারণ আঙ্গিক এসেছে বাইরে থেকে অথচ বিষয়বস্তু দেশের ভেতরকার। কিন্তু দুয়ের মধ্যে সাযুজ্য ও সারূপ্য ঘটেনি। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলা ও প্রকরণের দিকেই কবিদের পশ্চিমমুখী মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে দেশীয় বিষয়বস্তু ও দেশীয় ঐতিহ্য হয়েছে উপেক্ষিত। ফলে সাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র বা 'কমিউনিকেশান' গড়ে উঠতে পারেনি।

চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যেও এই ঐতিহ্য-বিযুক্ততা ছিল, এমনকি বামপন্থী কবিদের মধ্যেও ছিল। এবং ছিল ব'লেই একমাত্র সুকান্ত ছাড়া অন্য কারও কবিতা জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি।

১৯৫৩ সনে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশের পর কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'স্বরাম্বিতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটিকে আধুনিক কবির আত্মসমীক্ষা বলা চলে ঃ —"সে পাকা হাতের ফল প্রাকৃতজনের আস্বাদনের বস্তু হ'ল না। বিশেষ ক'রে আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের নাগালের বাইরে সৌখীন বাবুদের কাব্যকাননের মাকাল ফলের মতোই তা' ঝুলে রইল। এই ভাবসমাধি অবশ্য কিছু পরিমাণে ঘা খেলো গত দশ বারো বছরে প্রগতি আন্দোলনের ঢক্কানিনাদে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদী ও মার্ক্সমন্য ভাবধারার চাপেও এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল না। মূল সমস্যা সমস্যাই থেকে গেল।" 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আর একবার এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—সাহিত্যের কাজ বা কবিতার ভাষা কঠিন হওয়া বা সহজ হওয়া নয়, কম্যুনিকেশনের সমস্যাই আসল সমস্যা। এই কম্যুনিকেশনের সঙ্গে আঙ্গিকের প্রশ্নটাও জড়িত।

"কৃত্তিবাস" পত্রের সম্পাদক কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথ থেকে যে আধুনিক বাংলা কবিতার সৃষ্টি তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিতর্ক-বিচার, এবং গতিপথের মূল্য নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও প্রথম দিককার কবিতায়, কিছুটা অসংস্কৃত হ'লেও, আত্মপ্রত্যয়ের সুর ছিল। এখনকার কবিতা যেন বেশীমাত্রায় ভঙ্গীপ্রধান এবং বক্তব্যে অনিশ্চয়তার সমস্যা।" আসলে দেশকাল ও ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে যদি কাব্যদেহ গড়ে না ওঠে, যদি 'জীবনে জীবন যোগ করা না হয়', তবে 'কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা' এবং তখনই আসে ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা।

অথচ কবিতার আঙ্গিক কালের নিয়মে পালটাবেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ঐ শালগাছ পঞ্চাশ বছর আগে যে অম্লান ফুল ফুটিয়েছিল আজও ঠিক সেই ফুলই

ফোটাচ্ছে, কিন্তু কণিকায় আমি ত্রিশ বছর বয়সে যে কবিতা লিখেছি, আজ আমি সে কবিতা লিখিনে।" (দ্রঃ চিঠিপত্র/১১শ খণ্ড)

অর্থাৎ বদলে যায় কবিতার ভাষা, বদলে যায় বলবার ভঙ্গি, পালটে যায় কবিতার আঙ্গিক। কারণ সময় দ্রুত পরিবর্তমান, জীবন পরিবর্তনশীল। তাই আঙ্গিকের যে ইতিহাস তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা মানব-জীবনের পরিবর্তমান অগ্রগতিরই ইতিহাস।

ছয়

রবীন্দ্রকাব্যে বাঙালী মধ্যবিত্ত কাব্যপাঠক যে কল্পিত স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখেছিল, আমরা জানি, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিঘাতে সে স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেল। যতীন্দ্রনাথের তির্যক ব্যঙ্গদিগ্ধ কাব্য-ভাষায় যুগের যাবতীয় অসঙ্গতি ও অশান্তি, দুঃখ-দারিদ্র্য শোষণ-বঞ্চনাক্লিষ্ট জীবনের রূঢ় বাস্তবতা সবটুকু কাব্যিক যাথাযথ্য (Poetic exactness) ও যথাযথ বাক্‌প্রতিমা (image) নিয়ে অনিবার্য অমোঘ বাণীরূপ লাভ করল। সন্ধ্যার দুটি বর্ণনায় কবি যে ইমেজ আনলেন তা যেমন বাস্তব, তেমনি প্রগাঢ় জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনচেতনাসমুখ অভিনব বাক্‌-প্রতিমা। যথা ঃ ১. "দিনান্তে যবে ব্যর্থ যে রবি অস্ত শিখর 'পরে / ছেঁড়া মেঘে পাতি মৃত্যু শয়ন রক্তবমন করে।" ২. "বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা / রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙীন বারাঙ্গনা।" পাল্‌টে গেল রবীন্দ্রযুগের Poetic diction ও Poetic language বা ভাষার কাব্যিকতা। কারণ জীবন পাল্‌টেছে, জীবনবোধ পাল্‌টেছে, তাই আঙ্গিকও পাল্‌টে গেল। এরপর এলেন নজরুল ঋজু, বলিষ্ঠ ভাষার নির্ঘোষ নিয়ে—১. 'বল বীর, বল চির উন্নত মম শির' ; ২. কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফ্যাল্‌ কররে লোপাট।' এলেন মোহিতলাল শরীরী প্রেমের সুস্পষ্ট ঘোষণা নিয়ে —"আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের দেহলী পরে।" ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্রীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন থাকলেও ভাষা ও ভঙ্গির অনেক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করা গেল। কারণ বিষয়বস্তু ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটেছে।

কিন্তু তিরিশের 'আধুনিক' কবিরা দেশের মাটি ছেড়ে পাড়ি দিলেন বিদেশের জমিতে। ইংরেজী সাহিত্যের কাব্যমুক্তির আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ড ছিলেন তার পুরোধা পথিকৃৎ। এঁদের মধ্যে এলিয়টের কাছে 'আধুনিক' বাঙালী কবিরা সচেতন ভাবে যে দীক্ষা গ্রহণ করলেন তা'হ'ল আত্ম-সচেতনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও নেতিবাদের। এর পূর্বে বাঙলা কবিতার ঐতিহ্য ছিল রোমান্টিক। তার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল আত্মমগ্নতা, ব্যক্তিসচেতনতা ও ইতি-বাচকতা। এ যুগে কবিরা পশ্চিম থেকে গ্রহণ করলেন বিশেষ করে আত্মসচেতনতা। বিষ্ণু দে ত' স্পষ্টতই জানালেন—, "এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণ গ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। "(দ্রঃ ভূমিকা/এলিয়টের কবিতা) সুধীন্দ্রনাথও বললেন,

"কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে……বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।" বাঙলা কাব্যে সুধীন্দ্র-কথিত, 'কাব্যের কল্পতরু, জন্মাল বটে। কিন্তু বাঙালী পাঠকেরা তার কাছে ঈপ্সিত বা প্রার্থিত ফল পেলনা। কাজেই 'কল্পতরু' বলি কি ক'রে ?

এলিয়টের প্রভাবে আধুনিক বাঙলা কাব্যে যে পরিবর্তন এল তা মর্জি ও মেজাজের ক্ষেত্রে। ফলে পূর্বকথিত আত্মসচেতনতা. নৈর্ব্যক্তিতা, নেতিবাদ ও মনন-বৈচিত্র্যও এল। জগৎ, ঈশ্বর, প্রেম, মৃত্যু, জীবন সম্পর্কে যে নতুন ভাবনা এল তা' রোমাণ্টিকতা বিরোধী। নতুন ভাবনার উপযোগী নতুন আঙ্গিকও সেই সঙ্গে এল। শব্দ ব্যবহারে আধুনিক কবিরা বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা, বরং বলা চলে স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করলেন। চলতি বুলির পাশেই ইংরেজী শব্দ, তৎসম শব্দের সঙ্গে গ্রাম্য শব্দ, রবীন্দ্র-কাব্যাংশের সঙ্গে আটপৌরে শব্দ ইত্যাদি বসিয়ে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে একেই "ল্যাঙট পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতা" ব'লে মনে হয়েছিল' এবং তিনি সাময়িক ভাবে রুষ্ট ও ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই বিপর্যয়কে অগত্যা মেনেই নিয়েছিলেন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে—"কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল / আমার বাগানে ফোটে না সে।" (আগন্তুক/পরিশেষ)।

১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হ'ল। এর পরবর্তী বা স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দেশের অবস্থা হ'ল : তখন দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে, '৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির জনযুদ্ধের ডাক, ফ্যাসীবাদ-বিরোধী আন্দোলন, '৪৩-এ মন্বন্তর, গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছে ; গ্রামের মানুষ একটু খাবারের আশায় শহরে ছুটে এসেছে, জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি বামপন্থী শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা, '৪৬-এ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, নৌ-বিদ্রোহ।

তিরিশের কবিরাও এ সময় নিরাসক্ত ও নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন নি। বিষ্ণু দে ও সমর সেন ত' বটেই, জীবনানন্দ ও অমিয় চক্রবর্তীও সমকালীন ঘটনা-দুর্ঘটনায় অভিঘাতে বিচলিত হয়েছেন। জীবনানন্দের "১৯৪৬-৪৭" কবিতায় ত' দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বাঙলার ছবিই ধরা পড়েছে।

> "বাংলা লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
> সূর্য অস্ত চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
> খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে ?"

তখন থেকেই চল্লিশের কবিতাচর্চার দুটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ১. সমাজ সচেতন রাজনৈতিক কবিতার ধারা ; ২ এর প্রতিক্রিয়া-জনিত রোমাণ্টিক কবিতার ধারা।

রবীন্দ্রনাথকে প্রাণপণে উত্তীর্ণ হবার দায় থেকে এ'রা মুক্ত হলেন। সে কাজ পূর্ববর্তী অগ্রজেরাই করেছেন। তাই আধুনিকতার কোন অগ্নিপরীক্ষা এঁদের

দিতে হ'ল না ব'লে ততদিনে চল্লিশের কবিদের সামনে আধুনিক কবিতার একটা প্যাটার্ন বা আঙ্গিক জানা হয়ে গেছে। ফলে কবির সংখ্যা বাড়ল এবং সেই থেকে বাঙ্‌লা দেশে কবির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

এই দশকের উল্লেখযোগ্য কবিরা হ'লেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিরিশের দশকের কবিরা অবশ্য তখনও লিখে চলেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদ, গ্লানি ও বেদনা, ব্যথা ও ব্যর্থতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, পণ্যবাদী গণিকা সভ্যতার চোখ ধাঁধানো জৌলুশ ও অন্তঃসারশূন্যতা অথচ পণ্যবাদী সমাজের যা অবশ্যম্ভাবী অন্যতম ফল —ব্যক্তির বিযুক্ততা বা alienation সমর সেনের রচনায় এমন এক এ্যান্টি-রোমান্টিক নগ্ন সত্যরূপে ও সেই অনুযায়ী পদ্যের দোলাহীন নিরাভরণ ও নিরাবরণ গদ্যভঙ্গি গড়ে তুলেছে যা' বাঙ্‌লা কাব্যের আঙ্গিকে এক অভিনব সংযোজন। রবীন্দ্রীয় স্থিরস ও রোমান্টিক কাব্যভাষা ও কাব্যাঙ্গিককে ভেঙে ফেলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। যথা, "ম্লান হয়ে এল রুমালে ইভ্‌নিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ / হে শহর, হে ধূসর শহর / কালিঘাট ব্রীজের উপরে কখনও কি / শুনেতে পাও লম্পটের পদধ্বনি / কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও!"

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমাজসচেতন রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠক, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য. সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে যোগ অন্ততঃ পার্টিসূত্রে যেটুকু গড়ে ওঠা প্রয়োজন তা ছিল। তাই মুখের কথা বা চল্‌তি বুলিকে এত সহজে কবিতায় আনতে পারেন যে বাঙ্‌লা কাব্যের গঠনে, ভাষায় ও ছন্দে এক নতুন রীতির প্রবর্তন হল বলা চলে। 'নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী / ট্যাঁকে টুক্‌রো অর্ধদগ্ধ বিড়ী'। (নির্বাচনিক/পদাতিক) অথবা,

'একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য / আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ রাগে রী রী করে / সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে দুরন্ত ঝড়।" (একটি কবিতার জন্য)। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত তাই বলেছেন, "তাঁর কবিতার শব্দ ছিপ্‌ নৌকোর মতো কবিতাটিকে নিয়ে দৌড় দিতে পারে। কোথাও গুরুভার হয়ে পথ জুড়ে থাকে না।" আর "মুখের ছিপ্‌ছিপে, সরু কথাকে প্রায় বেতের মতো ব্যবহার করতে পারেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁর উজ্জ্বল, বর্ণিত শব্দের শাণিত ব্যবহার বাঙ্‌লা কবিতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে।" (আধুনিক কবিতার ইতিহাস / অলোক-রঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত / পৃ. ১২৬)

নীরেন্দ্রনাথ মূলতঃ রোমান্টিক কবি। কিন্তু তিনিই বোধ হয় একমাত্র কবি যাঁর কবিতা এক জায়গায় থেমে থাকেনি। রোমান্টিক হওয়া সত্ত্বেও কালপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন বাস্তব জীবনের বৃহত্তর অংশকেও তিনি অকপটিবক্তর স্পর্শ করতে পেরেছেন। যেমন ঃ

"আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।" (অমলকান্তি)

নীরেন্দ্রনাথ খুবই নিষ্ঠাবান কবি। শব্দের ব্যবহার খুবই পরিমিত, যা বলতে চান বেশ সহজ সরল করে এবং জড়তাহীন অব্যর্থভাবেই বলতে পারেন। তাঁর কবিতার আঙ্গিক একটুও দুর্বল বা শিথিল নয়। এর কারণ দেশ কালের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নীরেন্দ্রনাথের মধ্যেও এক ধরনের জীবন দার্শনিকতা গড়ে উঠেছে, যেখানে তিনি সৎ ও আন্তরিক। তাঁর 'আবহমান' কবিতাটি সেই জীবন দার্শনিকতার গভীরতাকে অনায়াসে স্পর্শ করতে পেরেছে।

"যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া
লাউ মাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল
সন্ধ্যার বাতাসে।
কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে
এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে।
ফুরয়না, তার কিছুই ফুরয়না,
নটে গাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।"

কিংবা "নক্ষত্রজয়ের জন্য" কবিতাটি উপযুক্ত শব্দসন্ধানী কবিচিত্তের আন্তরিক অস্থিরতায় স্পন্দিত। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে সে স্পন্দন চমৎকার ধরা পড়েছে।

"হুস্ করে নক্ষত্রলোকে উঠে যেতে চাই
কিন্তু তার জন্য, মহাশয়,
স্প্রিং-লাগানো দারুণ মজবুত একটা শব্দ চাই।"

কবিতার রূপকর্মের ক্ষেত্রে চল্লিশের দশকে সুকান্ত একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর কাব্যে কোন সচেতন কারুকর্ম নেই। অবশ্য এটিই তাঁর কবিতার রূপকর্ম, এমন সহজ প্রত্যক্ষ ভঙ্গি যার মধ্যে কোন সজ্ঞীকৃত সচেতন প্রয়াস নেই; এটিই সে যুগে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব অতি অল্প দিনেই যোগ্যতার সঙ্গে আত্মসাৎ করে এবং দ্রুততার সঙ্গে অতিক্রম করে সেই তরুণ বয়সেই সুকান্ত বাঙ্‌লা কবিতার যে অবয়ব নির্মাণ করলেন তাতে বাঙ্‌লা কবিতার নবজন্ম হল। অর্থাৎ রবীন্দ্র-ঐতিহ্যলালিত ও সুধীন্দ্র-সুভাষের কাব্যে দীক্ষিত সুকান্ত-চিত্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, [illegible]আক্রান্ত, ফ্যাসিবাদবিরোধী জনযুদ্ধের ডাক ও তৎসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে, তার ফলেই এক নিরাভরণ, ভাবধর্মী বা

বিবৃতিধর্মী কাব্যপংক্তির উদ্ভব হল যা অনায়াসেই জনসমাজের মর্ম স্পর্শ করতে পারে। শুধু স্পর্শই নয়, আলোড়িতও করে তোলে। তবু অনেকে সুকান্তর কবিতাকে কবিতাই বলতে চান না। বলেন সুকান্ত বড় বেশি শ্লোগানধর্মী। কিন্তু সুকান্ত যখন লেখেন

"রক্তে আনো লাল—
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো
ফুটন্ত সকাল।"

অথবা

'স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমাপাখী
মারণ মন্ত্র বলে শোন তা কি'—

ইত্যাদি অংশ কি ভাষণধর্মী হয়েও কাব্যধর্মী নয়? ব্যাঙ্গমাপাখীর বাক্-প্রতিমা কি লোকায়ত ঐতিহ্যের স্মারক নয়? অথচ এই রীতি অনুসরণ করে অনেকেই ত' কবিতা লিখতে গেছেন। কিন্তু অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ সমকালীন যুগ-জীবন ও সমাজ-পরিবেশকে আত্মসাৎ ক'রে যে জীবনসত্য সুকান্ত-চিত্তে দ্বান্দ্বিক নিয়মেই গড়ে উঠেছিল, সেই সমাজসত্য ও জীবনসত্য না থাকলে কোথা থেকে হবে এই ধরনের সৃষ্টি?

"আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।"

অথবা, "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।"

এইসব অংশকে দৃশ্যতঃ বা প্রচলিত দৃষ্টিতে উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলে অনেকের কাছে মনে নাও হ'তে পারে। কিন্তু তৎকালীন সমাজ-পরিস্থিতির দ্বান্দ্বিক সংঘাতে আলোড়িত ব্যথাহত কবির হৃদয়োৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত 'ভাষণ' বলেই এই উচ্চারণ সৎ ও আন্তরিক এবং সেই অনুযায়ী তার আঙ্গিকও হয়েছে সহজ সরল এবং স্বাভাবিক।

'অবশেষে, সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ
তারপর হ'বে ইতিহাস।' —এ অংশও নাকি বড় বেশী

স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। আভাষ-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনাধর্মিতা নাকি নেই। রবীন্দ্রনাথের—

"সংসার মাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর—
তারপরে ছুটি নিব।"

এইটি যদি কবিতাপদবাচ্য হয়, তবে পূর্বোদ্ধৃত সুকান্তর পংক্তিগুলি অবশ্যই কবিতা হয়ে উঠেছে।

চল্লিশের দশকের অন্যান্য কবিদের মধ্যে নাম করতে হয় 'মধুবংশীর গলি'-খ্যাত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, অরুণ সরকার, নরেশ গুহ, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, বাণী রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রমুখের। পরবর্তী দুই তিন দশক ধরেও এদের অনেকেই অবশ্য লেখা লেখি চালিয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে ৺জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, নরেশ গুহ ও বাণী রায় লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবে বাঙ্‌লা কাব্যের আঙ্গিক গঠনে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে কবিতার ভাষা ক্রমশ যে কাব্যিকতা ছেড়ে মুখের ভাষার কাছাকাছি এসেছে সে ব্যাপারে উল্লিখিত কবিদের কৃতিত্ব কম নয়। তবে এক্ষেত্রে পূর্বকথিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব যে সবচেয়ে বেশি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পঞ্চাশের দশকে একদিকে বামপন্থী আন্দোলনের ক্রমপ্রসার, তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপের কৃষক অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা ও বেদনা, অন্যদিকে নতুন ক'রে গণনাট্য আন্দোলনের তীব্রতা, গণনাট্য থেকে একদলের বেরিয়ে গিয়ে নবনাট্য রীতির প্রবর্তন, ১৯৫২ সনে প্রথম সংসদীয় নির্বাচন, ১৯৫৩ সনে এক পয়সা ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৫৬ সনে বঙ্গবিহার সংযুক্তিকরণ বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, চীন-ভারত মৈত্রী ইত্যাদি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার মধ্যে যেমন একদল সমাজ-সচেতন বামপন্থী কবি সমকালীন যুগের বাণীকে তুলে ধরেছেন, তেমনি আর এক দিকে একদল তরুণ কবি কেবল কবিতার জন্য কবিতা রচনার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠল। এঁরা বুদ্ধদেব বসুকে সামনে রেখে এক ধরনের "বিশুদ্ধ" কবিতা রচনায় ব্রতী হলেন। বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনমুখী সমাজ সচেতন বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নয়, এঁদের মতে "যে দুঃখের অনুভূতি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন, যা একলার, যা নির্জনের সেটাই অসামান্য। সেটা যত তুচ্ছ হোক, কিংবা কাল্পনিকই হোক, বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম হয় তা থেকেই।"

কিন্তু কবিতা যদি জীবন-সম্মুখ হয় তবে তা' কবিতা-ই, 'বিশুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ' কবিতা ব'লে কোনও বস্তু আছে কি? বিশুদ্ধ কবিতার দাবী যাঁরা তোলেন তাঁরা কবিতার পশ্চাতে যে বাস্তব-জীবন-উৎস রয়েছে তা'কেই অস্বীকার করেন। বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কবিচিত্তে যে জীবনসত্য গড়ে ওঠে, এঁরা সযত্নে তাকে এড়িয়ে যেতে চান এবং 'কবিতার জন্য কবিতা'—এই ধুয়ো তুলে ফাঁক ও ফাঁকিটা ধরতে দেননা এবং জীবন-বিবিক্ত কাব্য লিপিবিলাস করেই চলেন। কিন্তু কবিতা জীবন-বৃক্ষেরই ফুল, কাগজের ফুল বা আকাশ-কুসুম নয়। কাজেই 'বিশুদ্ধ-

বাদী' কবিদের কাব্যে যে কাব্য প্রকরণ থাকে তা' নেহাৎ-ই প্রকরণ, সোজা কথায় নিতান্তই নির্মাণ, সৃষ্টিকার্য নয়।

নরেন্দ্রনাথের 'নীলনির্জন'-এর নাম-সাধর্ম্যে পঞ্চাশের প্রথম কবি আলোক সরকার তাঁর প্রথম কাব্যের নাম দিলেন 'উতল নির্জন' (১৯৫০)। তার পর ১৯৫৩ সনে 'কৃত্তিবাস' পত্রকে কেন্দ্র করে একে একে বহু কবির আবির্ভাব হ'তে থাকল। একদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীলকুমার নন্দী, অরবিন্দ গুহ প্রমুখ কবিরা এলেন। এঁরা কাব্যের বিষয় ও প্রকরণে "বিশুদ্ধ" বাদী। অন্যদিকে পূর্ণেন্দু পত্রী, জগন্নাথ চক্রবর্তী, গোলাম কুদ্দুস, মণিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ অসংখ্য বামপন্থী কবি, যাঁরা ঠিক তথাকথিত বিশুদ্ধবাদী নন, বরংচ অনেকখানি সমকাল ও সমাজ-সচেতন কবি। তাই ব'লে পূর্বোক্ত কবি-দলের লেখায় সমকালের কথা নেই, তা নয়। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ভিন্নতর। তাঁদের উদ্দেশ্য তাদেরই ভাষায়, 'আসল কথা হ'ল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা।'

'এই দশকের কবিতার' ভূমিকায় শংকর চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টতঃই জানালেন, "এই তীব্র উদাসীন, উম্মত্ত, ধীমান্, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের সমারোহ আধুনিক কালের পৃথিবীর তাবৎ কাব্যাদর্শকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে কেবলমাত্র কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ও সকল সময় কবিতার মধ্যে অবস্থানের সঙ্কল্প বুঝিবা নূতন।" সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই কথাটাই কবিতা করে বললেন,

> "শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
> জন্য কিছু খেলা, শুধু······
> কবিতার জন্য এত রক্তপাত······।"

এই ধরনের 'কবিতার জন্য বেঁচে থাকা', অথবা কবিতা সিংহের "প্রতিদিন কবিতার যৌবন যাচাই/প্রতিদিন শব্দের কষ্টিতে ধ্বনি ঘষা/প্রতিদিন দগ্‌দগে সোনার ছুড় ফুটে ওঠা চাই/প্রতিদিন কবিতা কবিতা ক'রে ওষ্ঠাগত প্রাণ।" —সে কিরকম কবিতা? এর মূল সন্ধান করতে হবে হাংরি জেনারেশনের ম্যানিফেস্টোতে। ১৪ দফা ঘোষণার মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠেছে অহং-মুখ্য আমিত্বের দাম্ভিকতা। সমাজ থেকে নিজেকে বিবিক্ত করে কেবল মাত্র ব্যক্তির উচ্চণ্ড উদ্দামতা, নগদ প্রাপ্তির আশায় বড় বেশী ভোগমুখ্য উৎকেন্দ্রিকতা। নইলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখতে পারতেন না—

> "কবিতা লিখেছি আমি, চাই স্কচ্
> সাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ক
> মুর্গির দু' ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়।

এঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই ভাঙ্‌তে লাগলেন পুরনো প্রথা, পুরনো সমাজ, পূর্বতন

শৃঙ্খল ও পুরাতন মূল্যবোধ—"ভাঙো চুরমার করো ওই তৃষ্ণাহীন / শব্দের পাহাড়।" কবিতা হ'ল তাঁদের কাছে "সিগারেট ধরাবার মতো সোজা কাজ" অথবা "কালির বমন" বা "কলমের নীল মূত্রপাত"। অর্থাৎ [illegible] সুপরিকল্পিত নৈরাজ্য এনে একটা হৈ চৈ লাগিয়ে দেওয়া। কবি যে সামাজিক জীব, সমাজের কাছে তার যে দায়বদ্ধতা থাকে, সমাজ-বোধ ও জীবন-বোধের প্রগাঢ়তা থেকেই যে কবিতার জন্ম, নৈরাজ্য বোধের নঞর্থকতা থেকে নয়, সেই ইতিবাচক ভূমিকা এ কবিরা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে নিতান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু 'আসেনা' বলেই এঁদের কবিতা অন্তঃসারশূন্য এবং সে শূন্যতা ঢাকবার উৎকট প্রয়াসেই এমন ঢাক ঢোল পিটিয়ে তাঁরা আঙ্গিক-সর্বস্বতার হাত-পা ছুঁড়ে যাচ্ছেন। এতে চমক থাকলেও চমৎকারিত্ব নেই, শব্দের অহেতু ব্যায়াম বা কসরৎ থাকলেও স্বাস্থ্যশ্রী নেই। অতএব এই ডামাডোলের বাজারে দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ এমনকি পঞ্চম শ্রেণীর কবিরাও কল্কে পেতে লাগলেন এবং কবির সংখ্যাও হু হু করে বাড়তে লাগল।

কিন্তু এঁদের মধ্যেও স্থিতধী ছিলেন তিরিশের ও চল্লিশের দশকের অগ্রজেরা ত' বটেই নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, রাম বসু এবং পঞ্চাশের দশকের শংখ ঘোষ, আলোক সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকেই, বিশেষ ক'রে বামপন্থী কমিটেড কবিরা। এঁরাই নৈরাজ্যের উৎকেন্দ্রিকতা থেকে বাঙ্‌লা কবিতার আঙ্গিককে কাব্যের main stream-এ রাখার তথা জনজীবন ও দেশকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগযুক্ত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তবে বামপন্থী কবিদের কবিতা যে সুকান্ত-কাব্যের মতো জনপ্রিয় হয়নি তার কারণ এঁদের কাব্যের প্রকরণের অতি প্রযত্ন ও দেশীয় ঐতিহ্যচ্যুত বিদেশী বিপ্লবী কাব্যের অতিচর্চা-জনিত বাগ্‌-বৈদগ্ধ্য অথবা ঠিক উল্টো, অর্থাৎ প্রকরণের অতি শৈথিল্য বা অতি দৌর্বল্য; সর্বোপরি দেশকালের বাণীকে যথোচিত ভাবে আত্মস্থ করার শক্তির অভাব। এছাড়া, 'কৃত্তিবাস'-গোষ্ঠীর ভাঙনধর্মী উৎকেন্দ্রিকতা ও চমক সৃষ্টির মোহও তাঁদের কয়েকজনকে অল্পবিস্তর সংক্রামিক করেছিল। তাই মুখে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দায়বদ্ধতা ঘোষণা করলেও তাঁদের কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই বাক্‌-সর্বস্ব বৈপ্লবিকতায় এবং গঠনধর্মে নীরক্ত শারীরিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ষাটের দশকের কবিদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। এঁরা অনেক পরিমাণে শান্ত, নিরীহ ও স্বস্থ। কারণ এঁদের পর্বতপ্রমাণ বাধাস্বরূপ সামনে রবীন্দ্রনাথ নেই, বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ারও নেই অথবা নেই কোন পঞ্চাশ দশকীয় উচ্চণ্ড অঙ্গীকার। ১৯৫৬ সনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ২০শ সম্মেলন ও স্তালিনের অব-মূল্যায়ন, ১৯৬২ সনে চীন-ভারত সংঘর্ষ, রুশ-চীন সম্পর্কের তিক্ততা ইত্যাদি ঘটনা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঁটার টান নিয়ে আসে। বাঙ্‌লা দেশে বামপন্থী আন্দোলনেও তখন চরম সংকট। ১৯৫৬-৫৭ সন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির

মধ্যে যে মতাদর্শগত সংকট ঘনীভূত হচ্ছিল তার ফলে ১৯৬৪ সনে পার্টি বিভাজন ও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের কংগ্রেসের গায়ে গা দেওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী বামপন্থী কবিদের উজ্জীবিত করতে ত' পারেইনি, উপরন্তু নতুন ক'রে মতাদর্শের লড়াই, রাজনৈতিক লড়াই, এবং তজ্জন্য পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি সংগঠন-কর্মের মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও কর্ম-প্রচেষ্টা অধিকতর নিবদ্ধ করতে হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বামপন্থার লাল রং ধুয়ে অনেক পরিমাণে ফিকে হয়ে গেলেন; সেই সঙ্গে তাঁর কবিতার রংও অনেক ফিকে বা নীরক্ত হয়ে এল, যদিও মুন্সিয়ানা বাড়ল। তাঁর কবিতা হয়ে উঠল মুখের ভাষার প্রতিবিম্ব, তবু জীবন-বোধের গভীরতা যেন গেল হারিয়ে।

পঞ্চাশের দশকের কবিদের মতো ষাটের দশকের কবিরা দল বাঁধতে পারেন নি। তাঁরা বিচ্ছিন্ন এককভাবে কাব্যচর্চা করে গেছেন। তার মধ্যে এক ধরনের বিবিক্ত দার্শনিকতা বা তাত্ত্বিকতা প্রধান হয়ে উঠেছে। রত্নেশ্বর হাজরা, রবীন সুর, শম্ভু রক্ষিত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, রাণা চট্টোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গুহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই দশকের কবিদের কাব্যে এক ধরনের দার্শনিক নৈরাশ্য ও অন্তর্মুখীনতা লক্ষ্য করা গেল। বিশেষতঃ রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায়। আসলে পারিপার্শ্বিক জগতে দেশ ও কালের ক্ষেত্রে যখন অনিশ্চয়তা, চারদিকে যখন আশাহীনতার কালো ছায়া, তখন হয়তো এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ দেখা দেয় এবং তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। এই ধরনের পরিস্থিতিতেই ধনবাদী ইউরোপ-আমেরিকায় অস্তিত্ববাদী (Existentialism দর্শন ও তার ফলশ্রুতিতে অ্যাবসার্ড সাহিত্যের বিশেষতঃ নাট্য সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। এই দশকের বাঙ্‌লা কবিতায় তথা বাঙ্‌লা নাটকেও অ্যাবসার্ডিজম্‌ দেখা গেল উল্লিখিত কবিদের অনেকের লেখাতেই এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও বাদল সরকারের নাটকে।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় যে সুর লক্ষ্য করা গেল সে তো অস্তিত্ববাদী দার্শনিক-তারই সুর, ভাষাও সেই অনুযায়ী নিস্পৃহ, কিছুটা নীরক্ত বা পাংশু। যেমন. "গভীর অর্থে কোনো কিছুই চিরায়ত নয় / না সত্যরা না মিথ্যারা— / ...গভীর অর্থে কোনো মানুষ / সুখেও নেই, দুঃখেও নেই... ।" অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য জীবন সম্পর্কে একটা আতঙ্কপ্রতীতি বা উদ্বেগ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় anguish. বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তা লক্ষ্য করা গেল—"আমরা যার সঙ্গে নিত্য বসবাস করি / তার নাম প্রেম নয়, উদ্বেগ।" ষাটের দশকের কবিরা তাই এক ধরনের উদ্বাস্তু। চল্লিশের ইতিবাচক বামপন্থী রাজনীতি নেই। পঞ্চাশের উচ্চণ্ডতা ও অহংমন্য আত্মম্ভরিতা অনুপস্থিত, বামপন্থী রাজনীতির দ্বিধা—ত্রিধা—বিভক্ততা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—সব মিলিয়ে এই দশকের কবিদের কাব্যে শুধু শূন্যতা

বোধ। ফলে কাব্যের সৃষ্টিতেও রক্তশূন্য নিষ্প্রাণ হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ এবং তজ্জাত একধরনের শুষ্ক দার্শনিকতা।

এর হাত থেকে এই দশকের কবিতাকে যাঁরা কথঞ্চিৎ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা হলেন চল্লিশের বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পঞ্চাশ যাটের কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ দাশগুপ্ত, ষাটের মণিভূষণ ভট্টাচার্য, দেবদাস আচার্য, রবীন সুর, শম্ভু রক্ষিত, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা।

মণিভূষণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কয়েকটি কণ্ঠস্বর" ১৯৬২ তে, প্রকাশিত হ'ল। রক্তহীন ফ্যাকাশে শব্দচর্চার জগৎ থেকে তিনি আমাদের নিয়ে এলেন কর্মমুখর জীবনের মাঝখানে। ষাটের অন্যান্য কবিদের থেকে এখানেই তিনি স্বতন্ত্র। কবিতায় বিদ্রোহ নেই, চমক নেই, শব্দক্রীড়া নেই, আছে আন্তরিক সহজ অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশ। কখনও তিনি মধ্যবিত্ত জীবনজিজ্ঞাসায় আত্মজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠেন "—প্রগল্ভ গ্রন্থের ভিড়ে জীবিকায় আত্মসমর্পণ / সময়ে রূপসী ভার্যা, সুসন্তান, নৈতিক উন্নতি ; সঙ্গত প্রতিষ্ঠা, যশ / আকাঙ্ক্ষার বিচূর্ণ দর্পণ / পরিতৃপ্ত কানে বাজে ক্লান্তিকর সামাজিক স্তুতি।"

উদ্ধৃত অংশে কিছুটা জীবনানন্দীয়, কিছুটা সুধীন্দ্র দত্তীয় অথবা কথঞ্চিৎ বিষ্ণু দের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও পঞ্চাশের উৎকেন্দ্রিকতা থেকে মণিভূষণ বাঙলা কবিতাকে যথাসাধ্য স্বাভাবিক মুখ্য প্রবাহে রাখতে চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী দশকে তাঁর কবিতায় উচ্চারণে ও প্রকরণে বৈপ্লবিক ঘোষণার স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা থাকলেও বারবার তিনি একই বৃত্তে ঘুরে ফিরে এসেছেন।

ষাটের দশকের কবিদের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁরা কবিতার আঙ্গিক নিয়ে কিছু ভাঙচুর করেছেন। বিশেষ করে পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল ও সজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা হরফের হেরফের বা পংক্তি বিন্যাসের নবত্ব ঘটিয়ে কবিতা-শরীরের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিতে চাইলেন। আমরা জানি কবিতা নিয়ে কবিরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কারণে ঃ

ক. বিশেষ বক্তব্যের বা জীবনবোধের প্রেরণায়,
খ. প্রথাবদ্ধতা থেকে মুক্তিলাভের তাড়নায়,
গ. নিজেকে পালটাবার তাগিদে,
ঘ. শুধুই চমকসৃষ্টির জন্য।

ষাটের কবি পুষ্কর দাশগুপ্ত এইরকম নতুন পংক্তি বিন্যাসে কবিতারচনার পরীক্ষা করেছেন ঃ যেমন

"ঘরে ঢুকল
টেবিলের পাশে দাঁড়াল
চেয়ারে বসল
উঠল

জানলা খুলে দিল
বসল
উঠল..... ইত্যাদি।”—এই ধরনের পংক্তি বিন্যাস ই. ই. কমিংস্-এর কবিতায় ইতোপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে অরুণকুমার সিকদারের একটি গ্রন্থে উপভোগ্য আলোচনা আছে। কাজেই বাগ্-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

ষাটের আরও কয়েকজন কবি কালের ক্লৈব্য মেনে নিয়েই আত্মগত অভিমন্যু-ব্যূহে আত্মসমর্পণ করলেন। এঁদের মধ্যে ভাস্কর চক্রবর্তী, তুষার রায়, বেলাল চৌধুরী, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, দেবারতি মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার প্রচলিত বাঙ্লা কবিতার সুস্থতার ধারাকেই মেনে নিয়েছেন বাসুদেব দেব, আশিস্ সান্যাল, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, বিনোদ বেরা ও কেতকী কুশারী ডাইসন। আরও অসংখ্য কবির নাম উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে বাদ দিতে হ'ল। এই অনুল্লেখ মার্জনীয়।

সাত

সত্তর দশকে এল ভয়াবহ দিন। নক্সালবাড়ীর কৃষক আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনে ভয়াবহ সংকট ও আগ্নেয় পরীক্ষা, শাসকশ্রেণীর সৃষ্ট ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি, সর্বব্যাপী সন্ত্রাস ও জীবনের চরম অবমূল্যায়ন। এরই মধ্যে এক শ্রেণীর কবি পূর্বতন পঞ্চাশ ষাটের কাব্যধারার ধুয়ো ধরেই বাজারী কাগজে একঘেয়ে লিপিবিলাস করে চলেছেন, আর তারই পাশাপাশি বাঙ্লা কবিতার ধারাকে আরেকদল কবি আনতে চাইলেন জীবনের সচল প্রবাহে। হত্যা রক্তপাত ও সন্ত্রাসের মধ্যেও প্রবীণ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রইলেন তাঁর জীবনাদর্শে অটুট, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু চোখ ফিরিয়ে রইলেন, “কান ফেরালেন কোকিলের দিকে”, আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্পষ্ট, বলিষ্ঠ জীবনবাদী কাব্যরীতির ধারায় অনেক কবি এলেন সাহসিকতার অঙ্গীকার নিয়ে। এঁদের মধ্যে দুর্গাদাস সরকার, শেখ আব্দুল জব্বার, সনাতন কবিয়াল, দীপংকর চক্রবর্তী, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কনক মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জিয়াদ আলি, অমল চক্রবর্তী, মধু গোস্বামী, রাণা বসু, রথীন্দ্র ভৌমিক, শতদ্রু চাকী, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, সাধন গুহ, অরিন্দম চট্টোপাধায়, অনির্বাণ দত্ত, ইরা সরকার, সব্যসাচী দেব, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, সাগর চক্রবর্তী, গোপীনাথ দে, রাসবিহারী দত্ত প্রভৃতি অনেকের নামই উল্লেখ করা যায়। অনেক নামই বাদ রইল, কারণ নামাবলী রচনা বা তালিকা প্রণয়ন এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

সত্তরের কবিরা আশির দশকেও (যাঁরা জীবিত আছেন) লিখে চলেছেন। এঁরা প্রধানতঃ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। এরই পাশাপাশি বৃহৎ পত্রিকা-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আরেকদল কবিও লিখে চলেছেন। কিন্তু প্রকরণগত যত পরীক্ষা-

নিরীক্ষাই হোক, যতই নিষ্প্রাণ নীরক্ত হোক বাঙলা কবিতার শরীর, তা' যে ক্রমশঃ মুখের ভাষার কাছাকাছি আসছে, এটাই সুলক্ষণ। কিন্তু দেশ, কাল ও সমাজ জীবনকে আত্মস্থ করে যে সুস্থতা ও জীবনবোধ কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক গড়ে তোলে, জীবনকে আত্মস্থ করবার সেই শক্তিই যে আজ অনেকের মধ্যে নেই।

কবিরা স্পষ্টতঃই আজ দুটো শিবিরে বিভক্ত। বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠীর কবিরা প্রকরণগত দিক থেকে যথেষ্ট যত্নবান এবং সুকৌশলী, কিন্তু সমাজসত্য আবিষ্কারে ও সমাজ পরিবর্তনের কালচেতনায় (অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারেই) অজ্ঞ। পক্ষান্তরে, বামপন্থী কবিরা অনেক বেশি দেশকাল সচেতন হওয়া সত্ত্বেও কলা-সচেতন নন। কবিতার কারুকর্মের দিকটা তাঁদের কাছে উপেক্ষিত। ফলে, বিষয়বস্তুর দুর্বল অক্ষম প্রকরণের দরুণ দুয়ে মিলে অর্থাৎ বিষয় ও আঙ্গিকের সাজুয্যে সার্থক কবিতা হয়ে উঠতে পারছে না। অথচ এঁদের মধ্যে মহৎ সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মোচনের প্রভূত প্রতিশ্রুতি বর্তমান। সোজা কথায়, যে বামপন্থী কবিদের উপর বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, তাঁদের অনেকেই কবিতায় বা শিল্প প্রকরণের ক্ষেত্রে যথোচিত পরিশ্রমী নন। তবু বাঙলা কবিতার ধারাকে জীবনের মুখ্য প্রবাহে রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমকালীন জীবনের নানা জটিল ও সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বসমস্যাগুলিকে যিনি বা যাঁরা আত্মস্থ ক'রে জীবনসত্য তুলে ধরতে পারবেন, তাঁর বা তাঁদের লেখাতেই বিষয় ও আঙ্গিকের যথার্থ হরগৌরী সম্মিলন ঘটবে। এই সমগ্রতার সাধনাই জীবননিষ্ঠ কবির অন্বিষ্ট হওয়া উচিত।

সৌন্দর্যবোধের ক্রমবিকাশ : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

সৌন্দর্যতত্ত্ব বা সৌন্দর্যবোধের মূলে রয়েছে 'সুন্দর' শব্দটি। কিন্তু 'সুন্দর' কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা যখন বলি সুন্দর সাজ, সুন্দর কাজ, সুন্দর ব্যবহার, সুন্দর গান, সুন্দর মন, সুন্দর লেখার হাত, সুন্দর হাতের লেখা—তখন সব ক'টি 'সুন্দর' এক অর্থ প্রকাশ করে না। এর মধ্যে কিছু সৌন্দর্য দৃষ্টিগ্রাহ্য, যেমন সুন্দর সাজ ; কিছু সৌন্দর্য শ্রুতিগ্রাহ্য, যেমন সুন্দর গান ; কিছু সৌন্দর্য বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহ্য, যেমন সুন্দর মন, সুন্দর ব্যবহার ইত্যাদি। আরও কতকগুলো গুণ থাকলে তাকেও আমরা সুন্দর বলি। যেমন সুরুচি, সংযম, সৌকুমার্য, শিষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা, উদারতা, ক্ষমা ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে সুন্দরের নান্দনিক তাৎপর্য গৌণ হয়ে নৈতিক তাৎপর্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

বিচিত্র অর্থে ও তাৎপর্যে ব্যবহৃত হ'লেও নন্দনতত্ত্বের দার্শনিক মূল প্রত্যয় (Category) হ'ল 'সুন্দর' শব্দটিই। কিন্তু সুন্দর বলতে অনেক সময় আমরা বস্তুর বহিঃসৌন্দর্যকেই বুঝিয়ে থাকি। তাই, সৌন্দর্য তত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, সারস্বততত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সৌন্দর্যবোধ" (দ্রঃ সৌন্দর্যবোধ / সাহিত্য) প্রভৃতি কথাগুলো সৃষ্টি করতে হয়েছে।

আসলে সুন্দর বলতে বোঝায় বস্তুজগৎ ও মানব প্রকৃতির সার সত্য (essence) আবিষ্কার ও তাদের মধ্যকার মৌল সম্পর্ক নির্ণয়। অর্থাৎ তাদের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ গঠন প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও বৈচিত্র্যসমূহের আবিষ্কার। ফলে সুন্দর'—এই মূল প্রত্যয় বলতে শুধু তার বস্তুগত (objective) গুণাবলীই নয়, সেইসঙ্গে তার আত্মগত (subjective) গুণাবলীও বোঝায়।

একে যদি 'মূল্য' বা value হিসাবে ধরি, তবে এ এক অস্ত্যর্থক (Positive) সত্তা যার মধ্যে মানবচিত্তের আবেগ-কল্পনাসমূহের ভাবঘন মূর্তিই ভাষা ও সাহিত্য শিল্পের মাধ্যমে এক আনন্দঘন-প্রকাশ মহিমা লাভ করে।

তাই মানবজীবনে ও নিসর্গ প্রকৃতিতে এবং মানুষের আচার-আচরণে 'সুন্দর' বলতে আমরা যা কিছু বুঝি তাকে নানা নামে, নানা অভিধায় প্রকাশ করতে চাই। যথা : অপূর্ব, অভূতপূর্ব, অসীম, অনন্ত, অক্ষয়, বিরাট, মহৎ, বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল, লাবণ্যপূর্ণ, সহজ, স্বচ্ছ, স্বাভাবিক। আর এর অভাব দেখলে প্রকাশ করে থাকি—লাবণ্যহীন, দীপ্তিহীন, অনুজ্জ্বল, অস্বাভাবিক, কঠিন, দুর্বোধ্য, শিল্পগুণহীন, অবক্ষয়ী (decadent) ইত্যাদি নানা কথার সাহায্যে।

কোনো নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে আমরা যে সকল শব্দ সাধারণত ব্যবহার ক'রে থাকি সেগুলি হ'ল : শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি, উগ্র, উদ্ধত, অহংকারী, কামোদ্রেককারী (sexy), হস্তিনী, রঙ্গিণী ইত্যাদি।

এই ধরণের epithet প্রায় সব ভাষাতেই পাওয়া যাবে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে শব্দটি কত ব্যাপক ও বিচিত্র অর্থেই না ব্যবহৃত হ'তে পারে।

মানুষ জন্মসূত্রে প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্যবোধ আপনা আপনি পায়নি। যা' পেয়েছিল তা' হোল বস্তুর আকার, প্রকার, গড়ন, রঙ্, রেখা ছন্দ, সাদৃশ্য ইত্যাদি। সৌন্দর্যবোধ (বা সারস্বত চেতনা বা নন্দন-চেতনা যা-ই বলিনা কেন) কালক্রমে গড়ে ওঠে মানব সমাজ ও সভ্যতার দ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তির এবং মানুষের জৈব জীবন ও মানসজগতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে মানুষের শ্রমের ভূমিকা অপরিসীম।

ঐতিহাসিক পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ইতিহাসের দিক থেকে এই সৌন্দর্য চেতনার উন্মেষকাল বা ঊষাকাল হ'ল তারিখহারা সুদূর অতীতে—প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মধ্য ও অন্ত্যপর্বে। অবশ্য মানুষের মনে সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষের বহু পূর্ব থেকে বস্তু জগতের মধ্যেই সৌন্দর্যের ভিত্তি বা মূল নিশ্চয়ই ছিল। কালক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির সাহায্যে নানা সৃষ্টিমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ সেই সৌন্দর্যকে আয়ত্ত, অনুধাবন এবং তার মূল্যায়ন ও ব্যবহার করতে শিখেছে। অর্থাৎ সৌন্দর্য বস্তুতেই ছিল, মানুষ তাকে আবিষ্কার করেছে মাত্র। শুধু তাই নয়, মানুষ তাকে নতুন ক'রে সৃষ্টিও করেছে। এইখানেই মানুষের কৃতিত্ব।

সুপ্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যদেশে অর্থাৎ মিশর ও ব্যাবিলনের অধিবাসীদের মধ্যেই এই সৌন্দর্য চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন বা ধারণা করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই ধারণার উন্নততর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ প্রকাশ প্রাচীন গ্রীস দেশেই প্রথম ব্যাপকভাবে ঘটে। হোমার, হেসিয়ড প্রমুখের কাব্যে সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য, সঙ্গীত প্রভৃতি পদের (terms) উল্লেখ পাওয়া গেল। পরবর্তীকালে পিথাগোরাসের অনুগামী সম্প্রদায় পণ্ডিতগণই এই পদগুলি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। তাঁদের মতে 'সামঞ্জস্য' হ'ল অসঙ্গতির মধ্যকার সঙ্গতিসাধন।

ছন্দসঙ্গীত বা সামঞ্জস্যই হল পিথাগোরীয় সম্প্রদায়ের কাছে সর্বজনীন প্রত্যয় (category) এবং এই ছন্দসঙ্গতি তাঁরা যথার্থই লক্ষ্য ক'রেছেন মহাবিশ্বজগতের গ্রহ তারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে এবং বস্তু বিশ্বের তাবৎ বস্তু ও প্রকৃতির নানা রূপ ও প্রকাশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় :

চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
মহাছন্দ মহা-অনুপ্রাস
শূন্যে শূন্যে বিস্তারিল পাশ। (সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় / প্রভাতসঙ্গীত)

গণিত শাস্ত্রের পরিমাণ গত সম্পর্কের (quantitative relationship) সুনির্দিষ্ট পরিমিতিবোধের ওপরেই এই বিশ্বজাগতিক নিয়ম-নীতি-ছন্দ-সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। গণিতশাস্ত্রের সাহায্যেই তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-যোগ্য।

পিথাগোরীয় সম্প্রদায় তাঁদের ধারণাকে বোঝাতে চেয়েছেন গানের তাল, মাত্রা ও সমের বিশ্লেষণ ক'রে। এই পরিমাণগত বা কালগত দিকটাই কালক্রমে গুণগত উৎকর্ষে রূপান্তরিত হয়ে সৌন্দর্যতত্ত্বের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

প্রাচীন গ্রীসে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রথম প্রবক্তা হেরাক্লিটাস্ পিথাগোরীয়দের মতোই লক্ষ্য করেছেন যে সৌন্দর্যের ভিত্তিভূমি হোল বস্তুনিচয় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক ছন্দসুষমা বা সঙ্গীত। অবশ্য হেরাক্লিটাস্ এও বলেছেন যে সৌন্দর্য একটি আপেক্ষিক ধারণা। যেমন. বানরীকুলের মধ্যে যে সুন্দরীতমা, মনুষ্যকুলে সে কুৎসিততমা।

পরমাণুবাদের প্রাথমিক প্রবক্তা বস্তুবাদী ডেমোক্রিটাসের মতেও সৌন্দর্যের সার সত্য নিহিত রয়েছে বস্তুসমূহের বিভিন্ন অংশের পরিমাপ, পরিমাণ, সামঞ্জস্য ও সঙ্গীতির উপরে।

প্রাচীন গ্রীসে সৌন্দর্যজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বা বিষয়ীগত ভাবনাই মুখ্য হয়ে উঠল। সক্রেতিসের কাছে সৌন্দর্য আর নিরপেক্ষ বস্তু বা শুধুমাত্র বিষয়ের সামগ্রিক গুণ রইল না। তা হয়ে উঠ্‌লে আত্মভাব-সম্পর্কিত ধারণা-সাপেক্ষ। যে-বস্তু মানবসম্পর্কিত অনুভূতির বাইরে, অর্থাৎ যা কিছু মানব-নিরপেক্ষ তা সুন্দর নয়।

প্লেটো সৌন্দর্যের এক বস্তুগত-ভাবগত তত্ত্ব গ'ড়ে তুললেন। তাঁর কালে সুন্দর হ'ল এক সারভূত, সামগ্রিক, সার্বজনিক ও সার্বকালিক ভাবময় সত্তা। তার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই। এটি অনেকটা অধি-ইন্দ্রিয়জ (Supra-sensuous) ভাবমাত্র এবং এটি তাই পুরোপুরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মানসগ্রাহ্য। প্লেটো ঠিক বস্তুকে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে সৌন্দর্য আসলে অপার্থিব বা স্বর্গীয়। সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যটুকু পার্থিব জগতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে ধরা পড়ে। কাজেই মানস-গ্রাহ্য। প্লেটোর এই তত্ত্ব হ'ল সৌন্দর্যের আধিবিদ্যক (metaphysical) ও ভাববাদী (idealist) ধারণার প্রকাশ।

এ্যারিস্টটল প্লেটোর সৌন্দর্যবাদকে তীব্র আক্রমণ করলেন। তিনি বললেন যে সৌন্দর্য হ'ল এক সজীব সত্তা, বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে এক সামগ্রিক পূর্ণতাবোধ, এবং সমগ্র অংশের মধ্যকার এক সামঞ্জস্য-বিহিত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আকৃতি ও আয়তন। অর্থাৎ সৌন্দর্য হ'ল বস্তুর একপ্রকার আকারগত বিন্যাস।

এ্যারিস্টটলের কথায়ই সৌন্দর্যের সমগ্রতা ও আকারগত সুষমার উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া গেল। কালক্রমে প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য-ধারণায় আপেক্ষিকবাদী ও ভাববাদী প্রবণতা আবার দেখা গেল। বিশেষ করে প্লটিনুসের রচনায় মরমী ভাববাদ বা

মিস্টিসিজমের চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। এই প্লটিনুসই মধ্যযুগীয় ইউরোপে সৌন্দর্য ভাবনার ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

মধ্যযুগের অপর এক চিন্তাশীল মনীষী সেণ্ট অগাস্টিনের মতে ঈশ্বর স্বয়ং সৌন্দর্য স্বরূপ, তিনিই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। আর এই অনন্ত সৌন্দর্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের খণ্ড ছিন্ন বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য, মাত্রা, সামঞ্জস্য, বর্ণসুষমা, আনন্দজনকতা ও অখণ্ডতা-বিধান ক'রে থাকেন। এ ধারণা সম্পূর্ণতঃ ভাববাদী। আমাদের উপনিষদেও এ ধরণের কথা বলা হয়েছে। যথা :

'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।'

অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তরাত্মার মধ্যে এক ব্রহ্ম বিরাজমান, কিন্তু বাইরে তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপে প্রকাশিত।

সেণ্ট অগাস্টিনের মতোই টমাস আকুইনাসের মতেও সৌন্দর্যের উৎস ঈশ্বর। কিন্তু তিনি সৌন্দর্যের কয়েকটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের কথাও বলেছেন। যথা : পূর্ণতা (perfection) যথাযথ মাত্রাসমকত্ব (correct proportions) ও সামঞ্জস্য (harmony) এবং সর্বোপরি পরিচ্ছন্নতা। তাঁর মতে যাবতীয় উজ্জ্বল বর্ণের বস্তুই সুন্দর। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে আকুইনাস এ্যারিস্টটলের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন, তবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে এ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যা মূলতঃ দার্শনিক (Philosophical) এবং আকুইনাসের ব্যাখ্যা ভাগবৎ বা ঐশ্বরিক ধারণার বশবর্তী (theologian)।

কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁস পর্বে বা নবজাগরণ যুগে মোটের উপর সৌন্দর্য প্রত্যয়ের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই পাওয়া গেল। তাই রেনেসাঁস যুগের লিও বাত্তিস্তা আলবার্তি সৌন্দর্যের ভিত্তিরূপে বস্তুর মধ্যকার সামঞ্জস্য বা harmony-কেই বড়ো করে দেখলেন। এই সামঞ্জস্যই, তাঁর মতে, প্রকৃতি বা নিসর্গজগতের প্রাথমিক শর্ত বা একমাত্র সূত্র। অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন মাইকেলেঞ্জেলো, ঘিবার্তি প্রমুখ শিল্পীমনীষীরাও। অর্থাৎ সৌন্দর্যকে এঁরা বস্তুজগতের বস্তু ধর্ম ব'লেই গণ্য করলেন।

কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ল্যাসিক যুগে এই বস্তুবাদী ধারণা থেকে অপসারণ লক্ষ্য করা গেল। পৌসিন (Pousin) সরাসরি ব'লে বসলেন যে বস্তুর সঙ্গে সৌন্দর্যের কোন সম্পর্ক নেই ; যে সামঞ্জস্যবোধ বস্তুকে সুসংহত অবয়ব দান করে তা হ'ল আধ্যাত্মিক শক্তি ও ধর্ম,—তা বস্তুর অতিরিক্ত ধর্ম অর্থাৎ বাহির থেকে আসে। অর্থাৎ পূর্ণ ও চিরন্তন (absolute and eternal) ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবেই সৌন্দর্য গড়ে ওঠে।

এই ধরণের ভাববাদী ধারণা শুধু পৌসিনেরই নয়, সেযুগের আরও অনেকেই পোষণ করতেন।

Enlightment-এর যুগে সৌন্দর্যসম্পর্কে নানা মতবাদ গড়ে উঠ্‌ল। ইংরেজ বিদ্বজ্জনেরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৌন্দর্য-প্রত্যয়ের ব্যাখ্যা করলেন। অবশ্য অতীন্দ্রিয় রহস্য প্রবণতাও পুরোমাত্রায় বজায় ছিল, বিশেষতঃ শ্যাফ্‌ট্‌স্‌বেরির (Staftsbury) রচনায়। তবে রূপকর্ম বা form-কে যে সৌন্দর্যের নিয়ন্ত্রণী শক্তি বা সংগঠনী-শক্তি রূপে দেখা হ'ল, তা অনেকটা প্লেটোর অনুসরণে বলা চলে। সৌন্দর্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হ'ল ঃ

এক ঃ নিষ্প্রাণ নির্মিতি (যেমন মূর্তি, স্থাপত্য, নরদেহের প্রতিমূর্তি ইত্যাদি)

দুই ঃ একটি রূপনির্মিতির ধারণা থেকে নতুন ধারণার উদ্ভব (বুদ্ধি ও মনন স্তরে)

তিন ঃ এক রূপনির্মিতি থেকে অন্য কোন রূপনির্মিতি অর্থাৎ এক শিল্প-কর্মের দৃষ্টান্তে অন্য শিল্পকর্ম।

শেষেরটি প্লেটোর ধারণার সঙ্গে মেলে—যেখানে তিনি বলেছেন আর্ট হ'ল অনুকরণের অনুকরণ।

হ্যাচিসন (Hutcheson) পূর্ণ বা অদ্বিতীয় (absolute) সৌন্দর্যের সঙ্গে অসম্পূর্ণ বা আপেক্ষিক (relative) সৌন্দর্যের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে "অদ্বিতীয়" সৌন্দর্যের কোন তুলনা চলেনা অর্থাৎ দ্বিতীয় কোন সৌন্দর্যের অস্তিত্বই এক্ষেত্রে অস্বীকৃত। কিন্তু আপেক্ষিক সৌন্দর্য গ'ড়ে ওঠে বস্তু-জগতের বিভিন্ন সমজাতীয় বস্তুবর্গের (Category of similarities) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে। আবার হ্যাচিসনের মতে "অদ্বিতীয়" সৌন্দর্যের ভিত্তি রীতি-পদ্ধতির নিয়মিত সংগঠন-ধর্মিতা, সুশৃঙ্খল পরিমিতিবোধ, এবং ভিন্নরূপতার মধ্যেও যে অভিন্নরূপতা তার ওপরেই গড়ে ওঠে।

যাই হোক, হ্যাচিসন তাঁর সৌন্দর্যব্যাখ্যায় পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেননি। কারণ তিনি সৌন্দর্যের রূপনির্মিতি ও সৌন্দর্যের ধারণার মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু এডমন্ড্‌ বার্ক্‌ সৌন্দর্যের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনেক পরিমাণ-পরিমাপ, উপযোগিতা ও উৎকর্ষের তত্ত্ব বাতিল করে দিলেন। তাঁর মতে কোন বস্তু তখনই সুন্দর যখন তা—

১· আকারে ক্ষুদ্র

২ মসৃণ

৩· নানা অংশ নিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ

৪· অংশগুলি কৌণিক (angular) নয়, বরংচ প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে

৫· গঠন কমনীয়

৬· বর্ণ পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল অথচ চোখধাঁধানো নয়।

এইভাবে বার্ক সৌন্দর্যকে বস্তুর ধর্ম বা গুণের সঙ্গে একীকৃত (identified) ক'রে দেখলেন।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও শিল্পতত্ত্ববিদ্ হোগার্থ (Hogarth) মনে করেন যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশের সমগ্রতা ও রূপবৈচিত্র্যই হ'ল সৌন্দর্যের ভিত্তি।

এইভাবে ইংরেজ বুদ্ধিবাদীদের হাতে সৌন্দর্যের বস্তবাদী ব্যাখ্যার সূত্রপাত লক্ষ্য করা গেল। আবার একথাও সত্য যে এই ব্যাখ্যার মধ্যে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিও যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেল। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে David Hume ও George Berkeley-র লেখায়। Hume ত সৌন্দর্যের বস্তুগত উৎসকেই অস্বীকার করলেন। বর্তমান কালের আত্মগত ভাববাদের (subjective idealism) অন্যতম প্রবক্তা Berkeley-ও অনুরূপ ধারণাই পোষণ করতেন।

তুলনায় ফরাসী বুদ্ধিবাদীদের অন্যতম দিদেরো অবশ্য সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক বেশি যুক্তিনিষ্ঠ। তিনি বললেন, "I call beautiful all things, which contains that which awakens the ideas of rapport in my mind." অর্থাৎ যা কিছু আমার মনের মধ্যে ভাবসঙ্গীতি বা ভাবসংহতি জাগিয়ে তোলে তাকেই আমি সুন্দর বলি।

ভাবসংহিত বলতে দিদেরো বুঝিয়েছেন যা কিছুর প্রকাশ সুনিয়মিত, সুস্থিত, সুবিন্যস্ত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ বাস্তব জগতের যাবতীয় কার্য-কারণ সূত্রের মধ্যেই সৌন্দর্যের মূল নিহিত।

অন্যান্য ফরাসী চিন্তাবিদ্ যাঁদের মধ্যে বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঝোঁক দেখা গেছে, যেমন হেল্‌ভেতিয়াস (Helvetius),—তাঁরা সৌন্দর্যবোধের সুনির্দিষ্ট লক্ষণসমূহের মধ্যেই তাঁদের চিন্তা সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সৌন্দর্যের গঠনধর্মের প্রতি দৃষ্টি দেননি। অর্থাৎ সৌন্দর্য কিভাবে গড়ে ওঠে তাঁরা সে কথা বলেননি।

জার্মান ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যতত্ত্ববিদ্‌গণ সৌন্দর্যের নানা ধারণার (concepts) কথা বলেছেন। এঁদের অন্যতম হ'লেন ইমানুয়েল কাণ্ট্। সৌন্দর্যের বস্তুগত গুণাবলী সম্পর্কে তিনি ততটা আগ্রহ দেখাননি, যতটা দেখিয়েছেন সৌন্দর্য-সম্পর্কে। তাঁর মতে সৌন্দর্য বিচারের (aesthetic judgement) লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য হ'ল :

১. সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে বস্তুজগতের সত্যকার অস্তিত্ব সম্পর্কে আগ্রহের অভাব

২. সৌন্দর্যের অকলঙ্ক বিশুদ্ধ (!) রূপ সম্পর্কেই একমাত্র আগ্রহ

৩ সার্বভৌমতা (universality)

৪. যুক্তিহীন প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি ছাড়াই এর অহেতুক [illegible]তা (necessity without a logical substantiation)

৫. উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহীন উপযোগিতা (expedience without an idea of a purpose)

অর্থাৎ কাণ্ট্ সৌন্দর্যকে সত্য, মঙ্গল ও বাস্তব প্রয়োজনবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে দেখলেন। ফলে এই মতের মধ্যে নিরঙ্কুশ নিরাসক্ত ভাববাদী প্রত্যয়দৃষ্টিই মুখ্য হয়ে উঠল।

শিলার কাণ্টের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হননি। কাণ্ট্-কথিত আনুপাতিক যাথাযথ্যবাদ (Proportionality) নিয়মিতিবাদ (regularity) ও অন্যান্য যা কিছু বিন্যাসরীতিই যে সৌন্দর্য নয়, শিলার তা' দেখালেন এবং বললেন যে সৌন্দর্য হ'ল অন্তর্নিহিত আত্মভাবসমূহের স্বাধীন বহিঃপ্রকাশ।

এই সূত্র ধ'রে পরবর্তীকালে হেগেল সৌন্দর্য প্রত্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। সাধারণভাবে প্রথমেই তিনি বললেন যে সৌন্দর্য হ'ল কোন অন্তর্নিহিত ভাবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রকাশ। অর্থাৎ ভাবকে তিনি গোড়ায় স্থান দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাকে নয় তাঁর মতে নিসর্গরাজ্যে সৌন্দর্যের উন্মেষ ঘটে এর অন্তর্নিহিত নিয়মিতি, সামঞ্জস্য, বিশ্বজাগতিক ছন্দ, নিয়ম, বস্তুর বিশুদ্ধতা, বর্ণ, ধ্বনি ইত্যাদির মাধ্যমে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাবসমূহই প্রকাশ লাভ করে।

আর এরা হ'ল তাদের মাধ্যম বা বাহন মাত্র। তিনি আরও বলেছেন যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী আদর্শ থেকে যতই পৃথক্ হবে ততই তার সৌন্দর্য যাবে কমে। অর্থাৎ অধ্যাত্মিক ভাব বা idea-ই হ'লো মুখ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য গৌণ এবং শুধু গৌণই নয় নীচু স্তরের। কেবলমাত্র শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতেই সৌন্দর্য যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে—কারণ সৌন্দর্যবোধের আদর্শ প্রতিমূর্তিই হ'ল শিল্প ও সাহিত্য।

হেগেল, তাই, শিল্পকে ideal বা আদর্শের প্রতিমূর্তি বলতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি শিল্প ও বস্তুজগতের সম্পর্কও নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ideal ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলেই কবিতার মধ্যে বাক্-প্রতিমার (image) সৃষ্টি হয় এবং কবিতা বা শিল্পকলা গড়ে ওঠে।

হেগেলীয় সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে কিছু বুদ্ধিবাদী উপাদান অবশ্যই আছে, কিন্তু এই মতবাদ সামগ্রিক ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিখ্যাত রুশীয় সমালোচক ও চিন্তানায়ক নিকোলাই চেরনিশেভ্স্কি এই জাতীয় ভাববাদী সৌন্দর্য ধারণার ঘোরতর বিরোধী। চেরনিশেভ্স্কির মতে প্রকৃতির মধ্যে idea-র সন্ধান করতে যাওয়া নিরর্থক। কারণ প্রকৃতির মধ্যে আছে বস্তু—বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন ধর্মের বস্তু, idea নয়। চেরনিশেভ্স্কি সৌন্দর্যকে নির্বস্তুক idea-গত সামঞ্জস্য হিসাবে না দেখে কিংবা যান্ত্রিকভাবে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বস্তুগত গুণের সমষ্টি হিসাবে না দেখে সামগ্রিক জীবনবোধেরই

একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই দেখেছেন। তাঁর মতে, এই জীবনবোধের মধ্যেই সমন্বিত হয়ে আছে পরিমিতিবোধ, নিয়মিতিবোধ, সামঞ্জস্য ও উপযোগিতার বোধ। এককথায় মানবজীবনের সামগ্রিক বাস্তবতাই সৌন্দর্যবোধ গড়ে তোলে, কারণ জীবনের খণ্ড ছিন্ন অংশের মধ্যে সৌন্দর্য নেই। মানুষের যা কিছু সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ, আদর্শবোধ তা' এই সামগ্রিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি থেকেই গড়ে ওঠে।

এইভাবে চেরনিশেভ্স্কি সৌন্দর্যের প্রকৃত ভিত্তিভূমিই শুধু গড়ে তোলেননি, তিনি এও আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য থেকেই। প্রাক্-মার্ক্সীয় যুগের সৌন্দর্যতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা গেছে চেরনিশেভ্স্কির রচনাতেই।

মার্ক্সীয়-লেনিনীয় দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের প্রত্যয় গড়ে উঠেছে একদিকে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম ও অবস্থার ওপর ভিত্তি করে, অপর দিকে একই সঙ্গে তাদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বা attitude-এর প্রকাশ হিসাবে। অর্থাৎ মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে সৌন্দর্য হ'ল একই সঙ্গে নৈসর্গিক ও সামাজিক। মানুষের যাবতীয় বাস্তবিক ও মানসিক সৃষ্টির ফসলে, বিশেষ করে শিল্পসাহিত্যেই সৌন্দর্য ধরা পড়ে। সৌন্দর্য বলতেই বোঝায় মানুষের স্বপ্ন ও সাধনা অর্থাৎ জীবনের যাবতীয় খণ্ডতা, ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা দূর ক'রে সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা স্থাপন, অমঙ্গলের ওপর মঙ্গলের ও অসত্যের ওপর সত্যের জয় ঘোষণা। এককথায় মানবত্বের সমুচ্চ আদর্শের জয় ঘোষণাই সৌন্দর্যবোধে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তখন সেটি শুষ্ক তত্ত্বমাত্র না থেকে মানবজীবনের অঙ্গীভূত সার সত্য রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। এইখানেই সৌন্দর্য-বোধের সার্থকতা।

বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। অতএব এখানেই সৌন্দর্যবোধের ক্রমবিকাশ ও তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনাটুকু শেষ করা যাক্।

সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে সৌন্দর্যবোধের স্বরূপ

Aesthetics শব্দের বাঙ্‌লা করা হয়েছে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য তত্ত্ব। এটি গ্রীক aisthetikos ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল দেখা বা ধারণা করা বা ঈক্ষণ বা বীক্ষণ। এই মূলসূত্র ধ'রে এর বাঙ্‌লা হওয়া উচিত বীক্ষা বিজ্ঞান বা বীক্ষাশাস্ত্র, বড়জোর সৌন্দর্য-বীক্ষণ। সৌন্দর্যতত্ত্ব (theoroy of beauty) এই বীক্ষাশাস্ত্রেরই (Aesthetics-এর) অন্তর্গত—সমার্থক নয়। যদিও অনেকে এই দুটোকে এক ক'রেই দে'খে থাকেন। কিন্তু সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাপক বীক্ষা-শাস্ত্রের (Aesthetics-এর)-ই একটি গণ বা Category মাত্র। এটা মনে রাখা দরকার।

কিন্তু যেহেতু আমরা দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্তি হ'তে চাইনা বা, প্রবৃত্ত হওয়ার অধিকারী নই, কারণ দার্শনিক নই, সেহেতু আলোচ্য প্রবন্ধে সৌন্দর্য-বোধ কথাটুকুই ব্যবহার করার পক্ষপাতী। আলোচ্য নিবন্ধের নামকরণেও, তাই, সৌন্দর্য-বোধ কথাটিই ব্যবহৃত হ'ল। কথাটি নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থের সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'সৌন্দর্য-বোধ' নামকরণ থেকে।

সংস্কৃত ভাষায় অলংকার-শাস্ত্র বা কাব্যতত্ত্ব (Poetics) নিয়ে যে ব্যাপক ও গভীর আলোচনা ও টীকা ভাষ্য ইত্যাদি রচিত হয়েছে তা'তে আলংকারিকদের তথা টীকা ভাষ্যকারদের অনন্যসাধারণ ধী-শক্তি ও মনীষার পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সৌন্দর্য-তত্ত্ব বা আমাদের ভাষায় সৌন্দর্য বোধ বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি তার আলোচনা শুরু হয়েছে আমাদের দেশে উনিশ শতক থেকেই। সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রে সে আলোচনা আদৌ ছিল কিনা, বা কতটুকু ছিল তা' খাঁতিয়ে দেখাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

মনে রাখতে হবে সৌন্দর্য বর্ণনা ও সৌন্দর্য-তত্ত্বালোচনা এক বস্তু নয়। সৌন্দর্য-বোধ মানুষের সহজাত। কিন্তু তাকে বুদ্ধি দ্বারা পরিমার্জিত করেই সৌন্দর্য বিচার শক্তি গড়ে ওঠে। সুন্দর দৃশ্য দেখে বা মধুর সঙ্গীত শুনে আমাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত মুগ্ধতা বা বিস্ময়ের সঞ্চার হয়ে থাকে। এর কারণানুসন্ধানই সমালোচনা।

সৌন্দর্যালোচনা প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতি অবলম্বনে করা হয়ে থাকে ঃ

১. মনস্তাত্ত্বিক বা Psychological

২. বিশ্লেষণাত্মক বা Analytical

৩. পরাতাত্ত্বিক বা Metaphysical

এই ত্রিবিধ পদ্ধতির মধ্যে প্রথমটিই আধুনিক কালের সৌন্দর্যালোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ সৌন্দর্যের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ বা দার্শনিক

তত্ত্বালোচনার নানা মতবাদে সৌন্দর্য-বোধের স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ধরতে পারিনা। বৃক্ষের পত্রসম্ভার ও শাখা-প্রশাখা গণনা করতে গিয়ে তরুপত্রপল্লবের সামগ্রিক সৌন্দর্য থেকে এবং সমুদ্রের ঢেউ গণনা করতে গিয়ে সমুদ্রের ভীমকান্ত অপার সৌন্দর্য-রহস্য থেকেই আমরা বঞ্চিত হই। বরঞ্চ বৃক্ষ ও সমুদ্রের অর্থাৎ বস্তুর রূপ, গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি, তার বর্ণ, গন্ধ, রং কবি-শিল্পীর মনে যে জটিল [illegible]-প্রক্রিয়ায় কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধের জন্ম দিয়ে থাকে, তার আলোচনা করাই বোধ করি সঙ্গত। কারণ সৌন্দর্যবোধ পরস্পর বিষয় ও ব্যক্তি-নির্ভর। একক বাদ দিয়ে আর একটিকে নিয়ে সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি হ'তে পারেনা। তবে বহুকাল থেকেই, বিশেষতঃ 'পাশ্চাত্ত্য' দেশে, সব আলোচনার মধ্য থেকে যে দ্বন্দ্বটি মুখ্য হয়ে উঠেছে তা' হ'ল: সৌন্দর্যের অবস্থান কোথায়? তার রূপে (form), না, তার প্রকাশে (Expression)? এই সমস্যাটিই একটু অন্যভাবেও তুলে ধরা যায়: সৌন্দর্য বস্তু না বিষয়-নির্ভর? না, সৌন্দর্য ব্যক্তি বা বিষয়ী-নির্ভর? এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটেছে অবশ্যই ভাববাদী ও বস্তুবাদী দার্শনিক চিন্তার মতদ্বন্দ্ব থেকেই। এই মতদ্বৈধ মেনে নিয়েও সৌন্দর্যকে বস্তুর একটি গুণ বা quality ধ'রে নিয়ে এবং সেই বস্তুটির প্রতি আমাদের (অর্থাৎ ব্যক্তির বা বিষয়ীর) মনোভাব বা attitude কি—এই দুটোকেই যদি এক যোগে গ্রহণ করা যায়, তবে বোধ করি বিচারের সুবিধা হয়। যদি সৌন্দর্য কেবল বস্তু-নির্ভর হয় তবে সে শুধু বস্তুর বিশিষ্টতাই তুলে ধরবে। ব্যক্তি বা কবি-শিল্পীর ভূমিকা সেখানে অর্থহীন হয়ে যাবে। আর, সৌন্দর্য যদি একান্তই ব্যক্তি-নির্ভর হয়, তবে তা' বস্তুধর্ম হারিয়ে নিতান্ত নির্বস্তুক বায়ুভূত নিরবলম্ব অর্থাৎ ভাবব্যঞ্জক হয়ে পড়বে, বস্তুর কোন অস্তিত্ব বা মূল্যই সেখানে অস্বীকৃত হবে। তাই, রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য অনেক মনীষীই এই দুটোকে একযোগে গ্রহণ ক'রেই সৌন্দর্যবোধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমরাও এই পদ্ধতিই গ্রহণ করতে চাই।

অনেকেই মনে করেন ভারতীয় অলংকারবাদের শ্রেষ্ঠ মতবাদ রসবাদ মানেই সৌন্দর্যবাদ। কারণ অলম্ (বা অরম্) মানেই সৌন্দর্য। কিন্তু রসবাদে এবং সৌন্দর্যবোধে পার্থক্য আছে। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু অলংকার-শাস্ত্র মানেই আধুনিক অর্থে সৌন্দর্য-শাস্ত্র নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'সুন্দর' বা 'সৌন্দর্য' শব্দের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতীয়দের সৌন্দর্যবোধ ছিলনা তা' নয়। যা'কিছু মধুর বা সুন্দর তা'কে 'সু' উপসর্গযোগে বিশেষিত করার প্রবণতা সেযুগে লক্ষ্য করা যায়। যেমন: 'সুশ্রাব্য ধ্বনি' ও 'সুন্দর ব্যক্তি' বোঝাতে যথাক্রমে 'সুশ্রব' ও 'সুনর' শব্দ ব্যবহৃত হ'ত। 'সুনর' শব্দ থেকেই কালক্রমে 'সুন্দর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। যেমন বানর>বান্দর>বাঁদর হয়েছে।

লক্ষ্য করবার বিষয় বৈদিক যুগের 'সৌন্দর্য' বোধের মূলে ইন্দ্রিয় নির্ভরতা

ছিল। কেননা 'সুশ্রব' ধ্বনি কানে শোনার এবং 'সুনর' ব্যক্তি চোখে দেখার বিষয় ঃ এবং কান আর চোখ—দুটোই যে ইন্দ্রিয় একথা বোধ করি কাউকে কানে কানে বা চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাতে হবে না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় সৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়াতীত মাত্রা বিষয়ে তখন পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয়দের দৃষ্টি প্রসারিত হয়নি বা হ'লেও তার কোন তথ্য ভিত্তিক নিদর্শন এখন পর্যত আমাদের হাতে নেই।

পরবর্তীকালে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে আমরা 'সৌন্দর্য' শব্দটি পেলেও সৌন্দর্য অর্থে রম্য, রমণীয় বা মধুর শব্দই তুলনায় বেশি ক'রে পাই। যথা ঃ

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।

অথবা 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডণং নাকৃতীনাম্'। উভয় স্থলেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতাই সৌন্দর্যের (রম্যতা বা মাধুর্যের) মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, এও লক্ষ্য করবার মতো। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ত' স্পষ্টতঃই 'আকৃতি'র সৌন্দর্য বোঝাতেই 'মধুর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

কিংবা ধরা যাক শকুন্তলার দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য দর্শনে দুষ্যন্তের কাম মুগ্ধতা ঃ
অধরঃ কিশলয় রাগঃ কোমল বিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনং অঙ্গেষু সন্নদ্ধম্॥

এখানে 'লোভনীয়ং' শব্দের দ্বারা শকুন্তলার রূপসৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা বা যৌনতার প্রতিই ইঙ্গিত করা করা হয়নি কি? 'মধুর' বা 'রম্য' শব্দ ব্যবহার না ক'রে কবি কালিদাস 'লোভনীয়ং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ব'লেই এত কথা বলতে হ'ল। এ অবশ্যই দুষ্যন্ত তথা কবিরই রূপ তন্ময়তা, কিন্তু বড়ই দেহকেন্দ্রিক ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এটি দোষের নয় বরং লক্ষ্য ক'রে আমরা আশ্বস্ত হই এই ভেবে যে প্রাচীন ভারতীয় কবি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতাকেই সৌন্দর্য বা রমণীয়তার মানদণ্ড হিসাবে দেখেছেন। কারণ তাঁর কাছে "সর্বাসু অবস্থাসু রমণীয়ত্বং আকৃতিবিশেষাণাম্" অথবা "সর্বাসু অবস্থাসু অনবদ্যতা রূপস্য।"

এ তো গেল কবি ও কাব্যের কথা। এবার সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের কথায় আসা যাক। আলংকারিকেরা বোধকরি দাবী ক'রেছেন যে অলংকার শাস্ত্রই হ'ল সৌন্দর্য বিচারশাস্ত্র। কারণ 'অলম্ সৌন্দর্যম্' এবং কাব্য শোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে।' কিন্তু অলংকার-শাস্ত্রে কাব্য শোভাকর বিভিন্ন অলংকার-বিচার এবং সর্বোপরি ধ্বনি ও রসের আলোচনা যেমন বিপুল প্রাধ্যান্য পেয়েছে, দুঃখের বিষয়, সৌন্দর্য বলতে আজকাল যা' আমরা বুঝি, তা' তেমন প্রাধান্য পায়নি। 'সৌন্দর্য' শব্দটিও তেমন গুরুত্ব পায়নি। বরংচ তার পরিবর্তে রম্য, রমণীয়, রম্যতা, রমণীয়ত্ব, মধুর, মাধুর্য ইত্যাদি শব্দই যে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তা আগেই বলেছি।

আলংকারিক কুন্তক অবশ্য 'সুন্দর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ

"সহৃদয়াহ্লাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ।' তবে কুন্তক টীকায় সুন্দরের অর্থ করেছেন সৌকুমার্য, রমণীয়তা, শোভা ইত্যাদি। লাবণ্য কথাটিও তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে সুন্দরের সংজ্ঞা হ'ল '......সুন্দরং রঞ্জকত্বরমণীয়ম্'। অর্থাৎ যার রঞ্জকত্ব বা রাঙিয়ে তোলার ক্ষমতা হৃদয়ে রমণীয়তা সঞ্চার করে তা-ই সুন্দর। কাজেই এখানে বস্তু বা বিষয়ের গুণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। রঞ্জকত্ব একটি গুণ, রমণীয়ত্ব তার লক্ষ্য। কিন্তু এই রঞ্জকত্ব বা রমণীয়ত্ব কি ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ শুধু বস্তু নির্ভর হয়েই গড়ে উঠতে পারে? না, রমণীয়ত্ব সৃষ্টিতে ব্যক্তির ভূমিকা কিছু আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তাঁর লেখা থেকে মেলেনা। আসলে অলংকারবাদীরা কাব্যের আত্মা সন্ধানে এক একটি অলংকার প্রস্থান বা রস-প্রস্থান গড়ে তুলতেই এত ব্যস্ত ছিলেন যে সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণানুসন্ধানে তাঁরা প্রধানতঃ শব্দ ও অর্থের প্রতিই অত্যধিক দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছিলেন। তাই 'বক্রোক্তি জীবিত'কার কুন্তক শব্দের 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গিভণিতি' এবং 'প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকি-বিচিত্রা অভিধা' নিয়ে যত বাক্য ব্যয় করেছেন সে তুলনায় সৌন্দর্য সৃষ্টির বিষয়গত ও বিষয়িগত সমস্যা নিয়ে প্রায় কিছুই বলেন নি। অথচ কাব্যের রমণীয়তা বা সৌন্দর্যবোধের কারণ খুঁজতে গিয়েই তিনি বক্রোক্তিবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন এবং যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্ত সহযোগে এটিকে রস-প্রস্থান রূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের 'লোচন' টীকায় অভিনব গুপ্ত সৌন্দর্যের পরিবর্তে লাবণ্য, মাধুর্য, চারুত্ব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে 'চারুত্ব দ্বিবিধ। ১. স্বরূপ মাত্রনিষ্ঠ ২. সংঘটনাশ্রিত। 'স্বরূপমাত্রনিষ্ঠ' অর্থাৎ যা নিজের রূপ আশ্রয় করেই চারুত্ব লাভ করেছে অর্থাৎ যা স্বভাবতঃই সুন্দর। আর 'সংঘটনাশ্রিত' বলতে বোঝানো হয়েছে পদ সংঘটনার বলে যা সুন্দর হয়ে উঠেছে। একটি নৈসর্গিক বা স্বভাবজ; অপরটি কবিপ্রতিভার সৃষ্টি বা শিল্প-কর্মজ। আর এই দ্বিবিধ চারুত্বের যা অতিরিক্ত তা হল লাবণ্য বা ধ্বনি। অর্থাৎ তাঁর মতে চারুত্ব হ'ল শব্দ ও অর্থের অবয়ব-সম্পৃক্ত গুণ বিশেষ আর লাবণ্য হ'ল অবয়বাতিরিক্ত। তিনি বলতে চেয়েছেন লাবণ্য অবয়ব সংস্থানের দ্বারা অভিব্যক্ত হলেও এটি অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত।

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিব অঙ্গনাসু॥

ধ্বন্যালোক ১।৪

অর্থাৎ মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু প্রতীয়মান হয় যা কাব্যপ্রসিদ্ধ অর্থ বা রচনা ভঙ্গির অতিরিক্ত আরও কিছু, রমণীদেহের লাবণ্য যেমন তার অবয়ব সংস্থানের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু।

ধ্বনিবাদের মধ্যে সৌন্দর্য বোধের সূক্ষ্মতা ও চারুতা থাকলেও ধ্বনিবাদীরা শব্দ ও অর্থের প্রতি প্রথমতঃ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ শব্দার্থের

অতিরিক্ত ধ্বনির প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান কোথায়? শব্দ ও অর্থের সাহিত্যের ওপর না বর্ণিতব্য বিষয় বস্তুর মধ্যে? না, বর্ণনাকারী কবি-প্রতিভার অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞায়? না, বিষয়বস্তু ও কবির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়? একথার জবাব ধ্বনিবাদীদের লেখাতেও পাওয়া গেল না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে শব্দ ও অর্থের যথাযথ বিন্যাসে বা সামঞ্জস্য-বিধানেই কাব্যের আলো জ্বলে ওঠে। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তাঁরা সে কথা বুঝিয়েওছেন।

"আলোকার্থী যথা দীপ শিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ।।

—ধ্বন্যালোক ১।৯

অর্থাৎ কিনা লোকে চায় আলো। কিন্তু তাকে জ্বালাতে হয় দীপ শিখা। তেমনি কবির লক্ষ্য রস কিন্তু তাকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথা-বস্তু।

কিন্তু সৌন্দর্য বিষয়-নির্ভর না বিষয়ি-নির্ভর এ প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল না।

আবার কেউ কেউ সৌন্দর্য ও লাবণ্যকে পৃথক পৃথক ধর্ম হিসাবে দেখেছেন। অবশ্য সেখানে লাবণ্য কথাটা ব্যবহার না ক'রে 'হ্লাদকত্ব' বা 'হ্লাদজনকতা' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। ঈশ্বর সংহিতার উল্লেখ ক'রে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন যে এঁদের মতে অবয়ব-সংস্থানের সামঞ্জস্যের দ্বারা চিত্তে যে একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয় তার নাম 'সৌন্দর্য' এবং এর দ্বারা যে অতিরিক্ত লাবণ্যের উৎপত্তি ঘটে তার নাম 'হ্লাদকত্ব'। এরই অপর নাম 'রস'।

এই মত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কোন বস্তুর/ব্যক্তির 'সৌন্দর্য' থাকলেই যে হ্লাদকত্ব জন্মাবে তা' নয়। নাও জন্মাতে পারে। আবার অবয়ব-সংস্থান যথাযথ বা ঠিক ঠিক মতো না থাকলেও হ্লাদকত্ব জন্মাতে পারে যদি তা ভাব ও রসের উদ্রেক ঘটায়। আবার রসের ধর্ম বিস্তার, যাকে রসের "সন্তান-বৃত্তি" বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই "সাধারণীকরণের" কথাও এসেছে।

তবে অবয়ব-সংস্থানের সামঞ্জস্যকেই সৌন্দর্য বলাতে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে বস্তুর যে গঠন ধর্মের কথা (formal beauty) বলা হয়েছে তার সঙ্গে খানিকটা সঙ্গতি অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখানে যেন বস্তুর ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে ভাব বা রসের বা হ্লাদকত্বের স্থান নেই। আসলে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের যুগ থেকে এঁদের মনে ভাব, রস ইত্যাদির প্রাক্-নির্দিষ্ট যে সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে তার বাইরে এরা কেউই আসতে পারছেননা। রসের 'বুড়ি ছুঁয়েই' আছেন। সৌন্দর্য এদের কাছে উপায় উপকরণ মাত্র, আর রসই হ'ল উপেয়। এবং সে রসের অধিষ্ঠান কাব্যগ্রন্থে নয়, কবিহৃদয়ে নয়, সহৃদয়

সামাজিকের হৃদয়াহ্লাদজনকতায়। সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। সৌন্দর্যের বিষয়-নির্ভরতা প্রকারান্তরে স্বীকার ক'রে নিয়েও এঁরা সৌন্দর্যের বিষয়-নির্ভরতার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়ে ভিন্নপথে অর্থাৎ রসমার্গে চ'লে গেছেন। তাই যে প্রশ্ন বা বক্তব্যটির কথা গোড়ায় তোলা হয়েছিল সে প্রশ্নের নিরসন হ'লনা রসসৃষ্টির প্রতিই এঁদের মুখ্য লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকায়।

'রস গঙ্গাধর' রচয়িতা জগন্নাথ কাব্যতত্ত্বে রম্যার্থকেই কাব্য বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে 'রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।' সৌন্দর্য শব্দটি ব্যবহার না করেও তিনি 'রমণীয়' শব্দের দ্বারাই এটি বোঝাতে চেয়েছেন। জগন্নাথের মতে রমণীয়তা হ'ল 'লোকোত্তর আহ্লাদজনকতা' এবং 'জ্ঞান গোচরতা'। 'লোকোত্তর কেননা তা' লৌকিক আহ্লাদ বা আনন্দের ঊর্ধ্বে'। 'পুত্রস্তে জাতঃ' অর্থাৎ তোমার ছেলে হয়েছে এ কথায় যে আনন্দ তা' ব্যক্তিগত লৌকিক আনন্দ। কাব্যের যে আনন্দ তা' ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান, কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে, তাই তাকে লোকোত্তর বলা হয়েছে। আর জ্ঞানগোচরতা কেন? না, এ আনন্দ বুদ্ধি গ্রাহ্য মানসিক আনন্দ। এই যে জ্ঞানগোচর লোকোত্তর আহ্লাদজনকতা তা' আসলে রসেরই ধর্ম। রসই রমণীয়তার জনক। জগন্নাথ ত' বলেই ফেলেছেন, 'রসঃ রমণীয়তাং আবহতি' অর্থাৎ রসই রমণীয়তাকে আহ্বান করে আনে। কাজেই সৌন্দর্য ও রসকে এঁরা প্রায় সমার্থক রূপেই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, আর জ্ঞানগোচরতা বা বুদ্ধি-গোচরতা আসলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা মানসগ্রাহ্য আকৃতি গোচরতারই নির্দেশক। কারণ বস্তু ও বিষয় যেমন লোকোত্তর আহ্লাদজনক, রসাত্মক বাক্য বা বস্তুও তেমনি অ-লৌকিক আনন্দজনক। ইংরেজিতে বলা যেতে পারে aesthetic pleasure, সংস্কৃতে তাকেই রস বলা হয়েছে।

'উজ্জ্বলনীলমণি'কার রূপ গোস্বামী সৌন্দর্যের একটি সুন্দর বস্তুধর্মী সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে যা যথোচিত, সুশ্লিষ্ট ও সন্ধিবন্ধ তা-ই সুন্দর। এখানে শুধু ঔচিত্য (যথোচিতং বা Propriety)-র কথাই বলা হয়নি, যা সুমিতি-যুক্ত, সুশ্লিষ্ট ও সন্ধিবন্ধ তাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ Proportionate ও একটা organic wholeness বা organic unity-র কথাও বলা হয়েছে।

আবার অন্যত্র ভূষণাদির দ্বারা অ-ভূষিত অঙ্গের গঠন সৌন্দর্যকে তিনি 'রূপ' বলতে চেয়েছেন। এখানে যদিচ তিনি অবয়ব সংস্থানের কথাই বলতে চেয়েছেন, তবু 'সৌন্দর্য' না ব'লে 'রূপ' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। আসলে সৌন্দর্য ও রূপ দুইই সমার্থক। তবে অভিনব গুপ্তের ভাষায় একে 'লাবণ্য' বললেই বোধ করি ভালো হ'ত।

ভারতীয় আলংকারিকদের মতামত আলোচনা ক'রে দেখা গেল যে সৌন্দর্য, লাবণ্য, রমণীয়তা, মাধুর্য বা হ্লাদজনকতা বা রসাত্মকতা—সবই এঁদের কাছে সমার্থক। শুধু নামে ভিন্ন, স্বরূপে এক। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের মতো

এঁরা বিষয়-গত আকৃতি-ধর্মকে যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি বিষয়ি-গত প্রকৃতি-ধর্মকেও স্বীকার করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এই দুয়ের অতিরিক্ত এক লাবণ্যের কথাও (ধ্বনি) বলেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসবাদের মধ্যেই পরিণাম খুঁজে পেয়েছেন।

রস ও সৌন্দর্য এক নয়, তবে রসের যা' ধর্ম, সৌন্দর্যের তাই লক্ষ্য বলে এঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন—অর্থাৎ লোকোত্তর হ্লাদজনকতা।

ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী প্রভাব আলংকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে এমনই আচ্ছন্ন ক'রে ছিল যে তার থেকে বেরিয়ে আসা তাঁদের পক্ষে ছিল দুরূহ। তাই রসবাদের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা বারবার 'লোকোত্তর' ও 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' ইত্যাদি কথার আমদানী না ক'রে পারেননি। কিন্তু এই ভারতবর্ষে ভাববাদী দর্শনের পাশাপাশি 'বার্হস্পত্য' বা চার্বাক দর্শনেরও একটি বস্তুবাদী ধারা অন্তঃশীলা রূপে বহুকাল থেকেই প্রবাহিত ছিল। সেকথাও ভুললে চলবেনা। প্রাচীন ভারতেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রের মতো গ্রন্থও লেখা হয়েছে। কালিদাসাদি শ্রেষ্ঠ কবিরা প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ তুলে ধরার পাশাপাশি নরনারীর লৌকিক সুখদুঃখ-বিরহ-মিলন-লীলার কথাও লিখতে ভোলেননি। আলংকারিকগণও, তাই, লৌকিক বিভাবানুভাবের মধ্যেই কাব্যের প্রাথমিক উপাদান খুঁজেছেন। কাজেই বস্তুজগৎ ও বাস্তব জীবনকে তাঁরা ব্রহ্মবাদীদের মতো একেবারে উপেক্ষাও করতে পারেননি। ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কসূত্রের মধ্য দিয়েই ভারতীয় অলংকারবাদ বা রসবাদ ও সেইসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রে বস্তু-নির্ভর সৌন্দর্য বোধের একটি ধারণা, কথঞ্চিৎ আকারে হ'লেও, গড়ে উঠেছিল।

শিল্প-সাহিত্যে অনুকরণবাদ

ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেব শিল্পানি।
এতেষাং বৈ শিল্পনামনুকৃতীরিহ শিল্পমধিগম্যতে ॥
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

শিল্পে ও সাহিত্যে অনুকরণবাদের কথা কোন না কোনভাবে এবং কোন না কো সময়ে সর্ব দেশেই অল্পবিস্তর উত্থাপিত, হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে বোধ করি প্লেটো (খ্রী.পূ. ৪২৮—৩৪৭) ও তাঁর ভাবশিষ্য অ্যারিস্টটল (খ্রী.পূ.-৩৮৪-২২) সর্বপ্রথম অনুকরণবাদের কথা উত্থাপন করেন। বিশেষ ক'রে অ্যারিস্টটল। তিনি তাঁর বিশ্বখ্যাত Poetics গ্রন্থে ব'লেছেন যে আর্ট মাত্রই 'মাইমেসিস্' বা অনুকৃতি। অ্যারিস্টটলের পরবর্তীকালে এই মত নিয়ে নানা মতামত ও বাদবিসংবাদ দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে প্লেটো বা অ্যারিস্টটল imitation বলতে ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? সাহিত্য-শিল্পের মূল কথা সত্যই অনুকরণ না অন্য কিছু? এবং এ অনুকরণ কিসের অনুকরণ? বাস্তবজীবনের? প্রকৃতিজগতের? না, কবির কল্পনা-জগতের? কিংবা অন্য কিছুর?

প্রাচীন ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকগণ অ্যারিস্টটলের মতো স্পষ্ট ও পৃথকভাবে না হ'লেও শিল্প-সাহিত্যে অনুকরণবাদের কথা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন স্থলে ব'লেছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি' অর্থাৎ নাট্য-শিল্প লোকবৃত্তেরই অনুকরণ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ তাঁরা দেখিয়েছেন যে 'শকুন্তলা' নাটকে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা চরিত্র হ'ল 'অনুকার্য', এবং আর আর যারা পাত্রপাত্রী তারা হ'ল 'অনুকর্তা'।

কিংবা অন্যত্র নাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন :

দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥

অর্থাৎ দেবতা, মুনি, রাজা, গৃহস্থ ব্যক্তির আচরিত কর্মের অনুকরণ করলে তবে তাকে নাট্য বলা হয়। কিন্তু সে অনুকরণের স্বরূপ কি এ সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করেন নি।

এ ছাড়া লোল্লটাচার্যের 'রসনিষ্পত্তিবাদের' মধ্যে খানিকটা অনুকরণবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লোল্লটের মতে নিষ্পত্তির অর্থ 'উৎপত্তি'। আর 'উৎপত্তি' বলতে আমরা 'অভূত প্রাদুর্ভাব' বুঝে থাকি। এরই অপর নাম উৎপত্তি। যেমন মৃত্তিকা

মৃত্তিকা থেকে ঘটের উৎপত্তি। কেননা, ঘট আগে ছিলনা, পরে হ'ল। তাই 'অভূত প্রাদুর্ভাব'। এ মাটি নয়, সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। মৃত্তিকা এর উৎপাদক বা কারণ। তেমনি লোল্লটের মতে রসও একটি অ-পূর্ব বস্তু—পূর্বে ছিলনা, পরে হ'ল, অর্থাৎ 'অভূত প্রাদুর্ভাব'। এ্যারিস্টটল যেখানে Things as they ought to be বলেছেন তার সঙ্গে বোধ করি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। যদিও ভারতীয় আলংকারিকেরা রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই অনুকরণ, অনুকর্তা, অনুকার্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ এনেছেন' তবু রসই তাঁদের মুখ্য লক্ষ্য, অনুকরণ ইত্যাদি গৌণ ব্যাপার।

আমরা অনুকরণবাদের আলোচনায় শিল্প ও সাহিত্য অর্থাৎ চিত্রকলা-ভাস্কর্যকে যেমন নেব, তেমনি কাব্যনাটককেও প্রয়োজন মতো অবলম্বন করব। কেননা 'বক্রোক্তি-জীবিত'কার কুন্তক যথার্থই বলেছেন—

"তস্মাদেব চ কাব্য-কাব্যোপকরণ-কবীনাং চিত্র চিত্রোপকরণ-চিত্রকরৈঃ সাম্যং প্রথমমেব প্রতিপাদিতম্।" অর্থাৎ কাব্য-কাব্যোপকরণ ও কবিদের এবং চিত্র-চিত্রোপ করণ ও চিত্রকরকে প্রথমেই সমপর্যায়ভুক্ত করে দেখতে হবে।

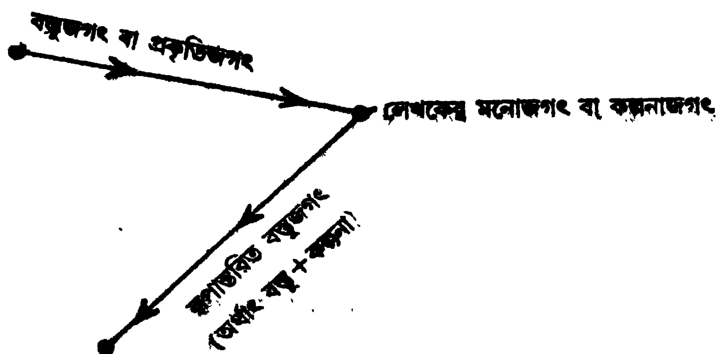
চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি হ'ল কলাশিল্প-প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গি বা মাধ্যম মাত্র। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-সেক্সপীয়র-রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের নিজের অনুভূতি প্রকাশের জন্য শব্দকেই উপাদান হিসাবে বেছে নিয়েছেন, র‍্যাফেল, টিশিয়ান, মাইকেল-এ্যাঞ্জেলো, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা তেমনি বর্ণিকা, মর্মর ও রাগিণীকে অনুভূতি প্রকাশের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। কারুশিল্প (useful art) ও চারুশিল্পের (fine art) মধ্যে যে পার্থক্য তা' প্রথমে অ্যারিস্টটল-ই আলোচনা ক'রে দেখান। যখন শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে 'Art imitates nature', তখন চারু ও কারুশিল্পের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য করা হয়নি। Nature বা প্রকৃতি বলতে অ্যারিস্টটল বাহ্যজগতের বস্তুকেই শুধু বোঝাননি, প্রকৃতি তাঁর কাছে creative force বা 'the productive principle of the Universe' রূপেই দেখা দিয়ে থাকবে। তাই যদি হয়, তবে কথাটা সম্ভবতঃ কারুশিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষ ক'রে তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কারণ কারুশিল্প প্রকৃতির চেষ্টারই পরিপূরক। প্রকৃতির অপূর্ণতা ও ফাঁক পূরণের জন্যই তার জন্ম—'to supply the deficiencies of nature' (Politics/ch. iv) চারু বা কারু শিল্প কথা দুটো অবশ্য গ্রীকরা ব্যবহার করেননি। তাঁরা বলেছেন 'মাইমেটিকাই টেকনাই' অর্থাৎ অনুকরণ প্রক্রিয়াই শিল্প।

অ্যারিস্টটলের আগে তাঁর গুরু প্লেটো-ও অনুকরণের কথা বলেছেন তবে শিষ্যের মতো এমন জোর দিয়ে স্পষ্ট ক'রে এবং বিস্তৃত ভাবে নয়। প্লেটোর কাছেও শিল্প অনুকরণ, তবে অব্যবহিত বাস্তব জগতের অনুকরণ নয়। তাঁর মতে এই দৃশ্যমান বস্তুজগৎটাই বাস্তব নয়, একমেবাদ্বিতীয় idea-রই অনুকৃত রূপমাত্র। আর সেই অনুকৃত জগতের অনুকরণ যদি শিল্পসাহিত্য হয়, তবে তাঁর মতে যা দাঁড়াবে তা' হবে আইডিয়া>বস্তুজগৎ>শিল্প-সাহিত্য অর্থাৎ 'Copy of copy twice removed from truth' (Republic-X) অর্থাৎ কিনা মূলের থেকে দু' ধাপ দূরের ব্যাপার।

প্লেটো শিল্পকলার বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি তাঁর Republic গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে কঠোর ভাবে মন্তব্য করেছেন "Art is imitation and imitation is a beggar wedded to a beggar and producing beggarly children."

অনুকরণ কথাটা শুনলেই মনে হয় যে সেখানে স্বাধীন চিন্তা-কল্পনার অবকাশ নেই। কিন্তু অ্যারিস্টটলের আলোচনা গভীর ভাবে অনুধ্যান করলে দেখা যাবে যে তিনি সঙ্কীর্ণ অর্থে অনুকরণের কথা আদৌ বলেননি। তাঁর মতে শিল্প-সাহিত্যের অনুকরণ হবে নিম্নলিখিত তিনটি পন্থায়: The poet being an imitator like a painter or any other Artist must of necessity imitate one of three objects—1. things as they were or are 2. things as they are said or thought to be 3. things as they ought to be

প্রথমটির অর্থ যথাযথ অনুকরণ, অর্থাৎ বস্তু জগতের হুবহু প্রতিরূপ। কিন্তু 'সাহিত্য প্রকৃতির আরশি নহে' একথা রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকেই বলেছেন। অ্যারিস্টটলও যে সেকথা বলতে চেয়েছেন তা'বেশ বোঝা যাচ্ছে পরের দুটি অংশ থেকে। দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বলেছেন অনুকরণ হবে প্রকৃতির বা বস্তুজগতেরই, তবে যেমন ভাবে বলা বা ভাবা হয়েছে ব'লে লেখক মনে করবেন ঠিক তেমনটি। এই ভাবনা নির্ধারিত হবে লেখকেরই চিন্তা, কল্পনা ও অনুভূতি-জগতে অর্থাৎ লেখকেরই ব্যক্তি সত্তায়। কাজেই লেখকের ব্যক্তিসত্তা, শিল্পবোধ এবং পরিমিতি বোধই বস্তুজগৎকে শিল্প সাহিত্যে রূপান্তরিত আকারে তুলে ধরবে অর্থাৎ 'অনুকরণ' করবে। তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে যে লেখক বস্তুজগৎকে যেভাবে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনায় রূপ দেওয়া উচিত ব'লে মনে করবেন সেইভাবেই (অর্থাৎ পরিবর্তিত আকারে) তা শিল্পে ও সাহিত্যে অনুকৃত হবে। অর্থাৎ লেখকের ঔচিত্য বোধই বস্তুজগৎকে রূপান্তরিত করে থাকে। কাজেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যারিস্টটল বস্তুজগতের 'যথাযথ অনুকরণকে কখনই শিল্পসাহিত্য (Art) বলতে চাননি। একটি ছকের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে:



ফলে বাইরের বস্তুজগৎ লেখকের মনোজগতের মাধ্যমে যখন শিল্প সাহিত্যের

শব্দেতে রূপান্তরিত হ'ল, তখন-তা' একটি নতুন মাত্রা শুধু নিয়ে এলনা, এল সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে। কাজেই সাহিত্য কখনই বস্তুজগতের যথাযথ বা হুবহু প্রতিচ্ছবি হ'তে পারেনা।

Poetics গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল বলেছেন যে অনুকরণের বিষয় হ'ল মানুষ ও তার ক্রিয়া-কলাপ। মূলে আছে 'প্রাত্তোন্তাস্'। বুচার তার অনুবাদ করেছেন 'man in action', বাইওয়াটার করেছেন শুধু 'actions' এবং ফাইফ্ করেছেন "living persons" তাহ'লে স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে প্লেটো-কথিত নকলের নকল থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই শোনালেন অ্যারিস্টটল। জীবন্ত মানুষের বাস্তব ক্রিয়াকলাপের অনুকরণই কাব্য বা সাহিত্য। কাজেই বাস্তবজীবনকে অস্বীকার ক'রে নয়, বরংচ গুরুত্ব দিয়েই অ্যারিস্টটল অনুকরণের কথা বলেছেন। অ্যারিস্টটলের এই মতবাদ আজও এই বিশ শতকের শেষ দশকেও যেমন সত্য তেমনি মূল্যবান, উপরন্তু আধুনিক সাহিত্য-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মাইমেসিস্ যে যান্ত্রিক ব্যাপার নয় তার প্রমাণ রয়েছে অ্যারিস্টটলেই ; প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যাক ঃ

১. We must represent men either as better than in real life or as worse or as they are.

অর্থাৎ বাস্তব জীবনকে (real life) ভালো বা মন্দ ('better' বা 'worse') ক'রে দেখানো যথাযথ অনুকরণে কখনোই সম্ভব নয়। ভালো বা মন্দ হ'তে গেলেই তাকে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হতেই হবে।

২. প্লটের কথা বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যেখানে বলেছেন 'arrangement of incidents artistically constructed' সেখানেও arrangement বা বিন্যাসের ব্যাপারে লেখকের চিন্তা, কল্পনা, ঔচিত্য, মাত্রাবোধ, শিল্পবোধ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বস্তুজগৎ আর যথাযথ রূপে সাহিত্যে প্রতিভাত হচ্ছে না।

৩. " it is not the function of the poet to relate what has happened but what may happen—what is possible according to the law of probability or necessity."

উদ্ধৃতাংশের 'what may happen' কথাটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বাস্তবে যা ঘটছে তার যথাযথ অনুকরণ কাব্য হ'তে পারেনা। বরং যা ঘটতে পারে তা-ই কাব্যের উপজীব্য এবং তা কবিকল্পনার অনুকরণেই সম্ভব।

৪. Poetry is a more philosophical and a higher thing than History, for poetry tends to express the universal and History the particular.

এখানে universal বলতে অ্যারিস্টটল বলতে চেয়েছেন, "By the universal, I mean, how a person of a certain type will on occasion speak or act according to the law of probability or necessity."

এখানেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ... দিক থেকে বা সাহিত্যের পক্ষে ... তার প্রতিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫. কাহিনীর কাল্পনিকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অ্যারিস্টটল ... Where incidents and names alike are fictitious, অর্থাৎ ঘটনাসমূহ এবং চরিত্রাবলী হবে কাল্পনিক। এবং কাল্পনিকতা নিশ্চয়ই বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ হ'তে পারে না।

৬. কাহিনী পরিকল্পনা সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছেন, "Whether the poet takes it readymade or constructs it for himself, he should first sketch its general outline and then fill in the episodes and amplify in detail"

অর্থাৎ অতিরঞ্জনের কথা বলা হয়েছে। এও তো বাস্তবিকভাবে বাস্তবের অনুকরণের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

অ্যারিস্টটলই অনুকরণবাদকে খুব বড়ো ক'রে গুরুত্ব সহকারে পোয়েটিক্‌স্‌ গ্রন্থে তুলে ধরলেন এবং মহাকাব্য, চিত্রশিল্প, ট্র্যাজেডি, কমেডি, ডিথিরাম্ব্‌ (গীতি-কবিতা) বাঁশীর সুর, বীণার স্বর—এগুলিও যে অনুকরণের ফল তা বলতে চাইলেন। তবে এদের মধ্যে পার্থক্য শুধু তিনটি বিষয়ে :

১ মাধ্যম বা medium

২ বিষয়বস্তু বা objects

৩ অনুকরণ পদ্ধতি বা mode of imitation

যেমন সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা, সঙ্গীতের মাধ্যম স্বর বা ছন্দ, চিত্রের মাধ্যম বং বা রেখা।

মহাকবি হোমার ও পদার্থবিদ্‌ এম্‌পিডোক্‌ল্‌স্‌-এর তুলনা ক'রে অ্যারিস্টটল দেখিয়েছেন যে উভয়েই যদিচ ছন্দে লিখেছেন, অর্থাৎ মাধ্যম এক, তবুও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। সে পার্থক্য অনুকরণে। কারণ বৈজ্ঞানিক করেছেন তত্ত্ব ও তথ্যবিচার, আর কবি করেছেন ছন্দে ও রূপবন্ধে মানব চরিত্রের কার্যাবলীর অর্থাৎ জীবনেরই অনুকরণ।

এইখানেই কবির সঙ্গে বিজ্ঞানীর বা তত্ত্বজ্ঞানীর পার্থক্য। তবে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় শুধু men in action বা ক্রিয়াশীল মানবজীবনকেই ধরা হয়েছে। কাজেই অনেকে এটিকে অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট ব'লে মনে করেন।

তাই, অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর তিনশ বছর পরে হোরেসও (খ্রীঃ পূঃ ৬৫—খ্রীঃ ৮) তাঁর 'Ars Poetica' গ্রন্থে শিল্পীকে অনুকারক বা imitator বলেছেন বটে, তবে তাঁর মতে কাব্যের বিষয়বস্তু শুধুই মানবজীবন (men in action) নয়, যে কোন বস্তুই, তাঁর মতে, সাহিত্যের বিষয়ীভূত হ'তে পারে। রেসের ঘোড়া বা মদের পেয়ালা নিয়েও কাব্য হ'তে পারে……'horses that win the race……and cups that free the soul.'

মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁস-যুগের ইউরোপে অ্যারিস্টটল-কথিত অনুকরণ-তত্ত্ব সাহিত্যিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হ'ল। Spingurn-এর ভাষায় 'Aristotl has briefly formulated a conception of ideal imitation which may be regarded as universally valid and which……became the basis of renaissance criticism' (Vide Literary Criticism in the Renaissance/p. 28)

তবে অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞায় কেবল মানবজীবনের অনুকৃতির (men in action)-এর কথাই বলা হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন যে এতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে। রোবারতেলি, ফ্রেকাস্তেরো প্রমুখ সমালোচকেরা বলেছেন যে অনুকরণ অর্থ যদিচ 'ideal representation of life', তবু কাব্য শুধু মানবজীবনেরই অনুকরণ নয়। তাই যদি হ'ত তবে এঁদের মতে ভার্জিলের 'ঈনিড্' (Aenid)-ই কাব্যের মর্যাদা পেত, আর নিসর্গ বর্ণনার কাব্য 'জর্জিকস্' (Georgics) কাব্য নামের অযোগ্য হ'ত।

তবে এঁদের মত বিচার কালে দেখা যাবে যে নিছক নিসর্গ বর্ণনা যদি মানব জীবন-বিযুক্ত হয়, তবে অবশ্যই তা শ্রেষ্ঠ কাব্যপদবী বাচ্য নয়। এই দিকটি এঁদের আলোচনায় উপেক্ষিত হয়েছে। আসলে মানবজীবন ও প্রকৃতি একই বৃহত্তর জীবনেরই অঙ্গীভূত। পৃথক্ ক'রে দেখাটাই খণ্ডদৃষ্টির পরিচায়ক। কিন্তু অ্যারিস্টটল সেই সুপ্রাচীন কালে men in action-এর সঙ্গে অনুকরণকে যুক্ত ক'রে বস্তুনিষ্ঠ এক পূর্ণ জীবন দৃষ্টিরই পরিচয় রেখে গেছেন।

ক্যাপ্রিয়ানো (১৫৫৫) কাব্যকেই মহৎ শিল্প বলেছেন এবং তাঁর মতে রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শময় জগতের যাবতীয় বস্তুই কাব্যের বিষয়ীভূত হ'তে পারে। রেনেসাঁস যুগের ইহমুখী জীবন রস-বাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে প্রকাশিত।

১৭/১৮শ শতকে ড্রাইডেন প্রমুখ কবিসমলোচকদের লেখায় অনুকরণকে শিল্পের লক্ষণ বলা হলেও এই অনুকরণ যে কল্পনা প্রধান একটি মানসিক ব্যাপার সে ধারণা স্পষ্টতর হ'ল। অবশ্য এর ইঙ্গিত অ্যারিস্টটলের রচনাতেই আছে। অর্থাৎ অনুকরণ বস্তুজগতের যথাযথ অনুকরণ নয়, বরংচ বস্তুজগৎ লেখকের মনোজগতের সংযোগে যে কল্পনাজগৎ গড়ে তোলে শিল্পে সাহিত্যে তারই অনুকরণ ঘটে। অবশ্য ড্রাইডেন imitation শব্দটা ব্যবহার না করে তার বদলে 'image' শব্দটিই imitation-অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, তাঁর মতে কাব্য হ'ল 'lively image (ইমিটেশন ?) of nature' এবং নাটক হ'ল 'a just and lively image of human nature representing its passions and humours.'

Inage শব্দটি আজকাল আমরা কবিতার রূপকল্প বা চিত্রকল্প বা বাক্-প্রতিমা অর্থে ব্যবহার করি। (এই গ্রন্থের 'কবিতার বাক্-প্রতিমা' প্রবন্ধ দ্রঃ)। বাক্-প্রতিমা গড়ে ওঠে কবির সমাজবোধ, জীবনবোধ, শিল্পবোধ, স্মৃতি, সত্তা ইত্যাদি থেকেই। এগুলো আবার গড়ে ওঠে কবির বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই।

সাহিত্যে যখন তা 'ইমেজ' আকারে দেখা যায় তখন তার মধ্যে 'প্রকাশনের' 'অনুকরণ' প্রক্রিয়াই কি ক্রিয়াশীল থাকে না ?

সমস্ত মধ্যযুগ জুড়ে অ্যারিস্টটল ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত ও উপেক্ষিত। কিন্তু মধ্যযুগের অবসানে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ যুগের ইউরোপে নতুন ক'রে অ্যারিস্টটল সম্পর্কে আগ্রহ জাগ্রত হ'ল। ইতালীতে কাস্তেল্ভেত্রো (Castelvetro) ফ্রাকোস্তেরো (Fracostero), পাৎসি (Pazzi), ভাল্লা (Valla), রোবার্তেল্লো (Robertello) প্রমুখ সমালোচকদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁরাই আরিস্টটলের ঐতিহ্য নতুন ক'রে তুলে ধরলেন সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে।

ইতালীয় সমালোচকদের প্রভাব দেখা গেল সমসাময়িক ইংরেজ সমালোচকদের লেখায়। এঁদের মধ্যে স্যর ফিলিপ সিডনীর নাম বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। স্টিফেন গসন (Stephen Gosson) The School of Abuse (1579) নামে একটা বই লিখে সিডনীকে উৎসর্গ করেন। এই বইয়ে তিনি প্লেটোর সমর্থনে কবি ও কাব্যের বিপক্ষে তীব্র আক্রমণাত্মক উক্তি করেন। যেমন তিনি বলেন যে কবিতা কুহকিনীর পাল্লায় পড়েই মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বে উপনীত হয় এবং কাব্য নাটক সঙ্গীত মানুষকে বীর্যহীন নাস্তিক ক'রে তোলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর উত্তরে সিড্নী An Apology for Poetry (1580) নামে এক বই লিখে গসনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। তাঁর মতে কবি শুধু বাস্তবের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেন না, তিনি সৃষ্টি করেন। অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। গণিতজ্ঞ, সঙ্গীতজ্ঞ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক বৈয়াকরণ সকলেই nature বা প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, কিন্তু কবি প্রকৃতি জগতের ওপরে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেন। এই দিক থেকে তিনি বিধাতার চেয়েও বড়ো। কারণ বিধাতা বড়ই কৃপণ। তিনি বড়ই হিসাব ক'রে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কবির কল্পনায় কার্পণ্যের স্থান নেই।

অনুকরণ সম্পর্কে সিডনীর আর একটি কথা হ'ল এই যে কবিকল্পিত সৌন্দর্য স্বর্গরাজ্যকে মাটির পৃথিবীতে রূপ দেবার দায়িত্ব পাঠকের, কবির নয়। অর্থাৎ অনুকরণ করবে পাঠক, কবি নয়। এই মতের সঙ্গে সংস্কৃত আলংকারিকদের অনুকর্তা, অনুকার্য-সম্পর্কিত মতবাদের তথা রসবাদীদের সাধারণীকরণের যেন একটু আকস্মিক মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। (এই গ্রন্থের "রসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা" প্রবন্ধ দ্রঃ)

জার্মান দার্শনিক কান্টও তাঁর ক্রিটিক অব জাজ্মেণ্ট (Critique of Judgment) গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে শিল্প-সাহিত্য বস্তুর যথাযথ অনুকরণ নয়, বরং আদর্শ রূপায়ণ বা ideal imitation. একথাটা অবশ্য নতুন নয়, কারণ এর ইঙ্গিত অ্যারিস্টটলেই আছে। তবে অ্যারিস্টটল-কথিত মাইমেসিসের সঙ্গে কান্ট-কথিত জাজ্মেণ্টের মিল আছে এই দিক থেকে যে মাইমেসিস্ বিশেষের অনুকরণ করে

দিয়ে যেমন নির্বিশেষকে প্রকাশ করা, আর্টও তেমনি Particular-এর মাধ্যমে universal-কেই প্রকাশ ক'রে থাকে।

সাহিত্য-শিল্পে রোমান্টিকতা ও লীলাবাদের (play theory of art) প্রবর্তক জর্মান দার্শনিক কাণ্টের শিষ্য শিলার (১৭৫৯—১৮০৫)-এর আলোচনা থেকেও জানা যায় যে সাহিত্য কখনোই যথাযথ অনুকরণ নয়। যদিও শিলার অ্যারিস্টটলের Poetics পাঠ ক'রে খুশি হন নি। কারণ, তাঁর মতে, Poetics-গ্রন্থে ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গি নিয়ে অ্যারিস্টটল গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন নি। তবে শিলার যখন তার 'On Naive and Sentimental Poetry' গ্রন্থে দু'ধরনের কবিতার কথা বলেন এবং naive অর্থে বোঝেন বাস্তবের যথাযথ রূপায়ণ এবং Sentimental Poetry অর্থে যখন বোঝাতে চান কবির অনুভূতি-প্রধান কবিতা, তখন এই দ্বিতীয় ধরনের কবিতার ক্ষেত্রে স্পষ্টতঃ ও প্রত্যক্ষতঃ ঠিক অনুকরণের কথা বলা না হ'লেও পরোক্ষে কি তার সঙ্গে অ্যারিস্টটল-প্রোক্ত অনুকরণ তত্ত্বের একটু-আধটু মিল খুঁজে পাই না ? কারণ বাস্তব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবি-কল্পনা বা কবির অনুভূতি যুক্ত না হ'লে Sentimental বা অনুভূতি-প্রধান কবিতা গড়ে উঠবে কি করে ?

অ্যারিস্টটলের মাইমেসিস্ তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ইতালীয় দার্শনিক Croce. তাঁর মতে জ্ঞান দু' ধরনের : ১ Logical Knowledge ২. Intuitive Knowledge অর্থাৎ যুক্তিমূলক জ্ঞান ও স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। প্রথমটির জন্ম বুদ্ধি বা intellect থেকে। দ্বিতীয়টির জন্ম স্বজ্ঞা বা intuition অর্থাৎ কল্পনা থেকে। তাঁর মতে art is intuition বা art is expression একই কথা। অ্যারিস্টটলের অনুকরণ তত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা দেখালেও 'Art is intuition' ব'লে তিনি যে খুব একটা নতুন কথা বলেছেন তা' মনে হয় না।

এর পর R A. Scott James তাঁর The Making of Literature (1918) গ্রন্থে সাহিত্যের প্রকাশ তত্ত্বের (Exhibitionism) কথা বলেছেন। তাঁর মতে "The artist does always imitate, but he always exhibits or shows."

অনুকরণ ও প্রকাশ শব্দ দুটি পৃথক হ'লেও তাৎপর্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ অনুকরণের উদ্দেশ্য যদি বাস্তবের যথাযথ প্রকাশ না হয়ে বাস্তবের উপলব্ধির প্রকাশ হয়, তবে 'প্রকাশ' কথাটির সাহায্যে যা' প্রকাশ পায় তা' হ'ল উপলব্ধিরই প্রকাশ। সুতরাং উভয়ের উদ্দেশ্য প্রকারান্তরে এক। তবে ক্রোচে যাকে mechanical imitation বলেছেন, মাইমেসিস্ যে সে ধরনের কোন যান্ত্রিক অনুকরণ নয় সে বিষয়ে এতক্ষণ ধ'রে আলোচনা করা হয়েছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অ্যারিস্টটলের পরেও প্রায় দু'হাজার বছর ধ'রে সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে যত মতবাদ দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অনুকরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন না কোন প্রকারে স্বীকার করা হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যে সাহিত্য সমালোচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় কাশীপ্রসাদ ঘোষের এক ইংরেজী প্রবন্ধে, রঙ্গলালের ইংরেজী ও বাঙলা লেখায় এবং ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনায়। সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা সাহিত্য গড়ে উঠল বঙ্কিমের হাতেই। তিনিই ভারতীয় আলংকারিক পদ্ধতির পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য তুলনা মূলক সমালোচনা (শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা), বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক সমালোচনা (উত্তর চরিত) প্রভৃতির সূত্রপাত করেন। 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধের একস্থলে তিনি চমৎকার ভাবে অনুকরণ বাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। সে অংশটি মূল্যবান। বাঙলা সাহিত্যে বোধ করি বঙ্কিমের লেখাতেই প্রথম অনুকরণ তত্ত্বের কথা পেলাম। প্রাসঙ্গিক অংশ সমূহ উদ্ধার করা যাক ঃ

"সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।···কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্র নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্র নৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টি চাতুর্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা চাহিয়া দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম, তাহাতে আমার লাভ হইল কি?"

'যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেননা তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন, সুতরাং সম্পূর্ণ দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।'

উদ্ধৃত অংশের "স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত" কথাটুকু বিশেষ মূল্যবান। এখানে অ্যারিস্টটল-প্রোক্ত মাইমেসিস্ তত্ত্বেরই সার কথাটুকুই যেন বঙ্কিম তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত নানা আলোচনায় অনুকরণবাদের কথা এনেছেন তবে সাহিত্য যে প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয় সেকথা খুব স্পষ্ট করে বেশ জোরের সঙ্গেই বলছেন।

'যেমনটি ঠিক তেমনটি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে। কারণ প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ। আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্য যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও প্রত্যক্ষ নহে।······ প্রাকৃত সত্যে ও সাহিত্য সত্যে এই খানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না, তাই বলিয়া সাহিত্যের মা'র কান্না মিথ্যা নহে।'

…এই জন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।" (সাহিত্যের বিচারক/সাহিত্য)

এই প্রবন্ধেরই আর এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মন সাধারণতঃ প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিসকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষ ভাবে সৃজন শক্তির আবশ্যক হয়। এইভাবে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাহা অনুকরণ হইতে বহু দূরবর্তী।" (দ্রঃ ঐ)

কাজেই অ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদের স্বরূপ সন্ধান করতে গিয়ে নানা দেশের নানা মনীষীর মতামত আলোচনা করে দেখা গেল যে বাস্তব জগৎ কবি ও শিল্পীর মনে আগে কল্পনা জগৎ হয়ে ওঠে তারপর সাহিত্যে যখন প্রতিফলিত হয় তখন সেই কল্পনা-জগতেরই অনুকরণ ঘটে, হুবহু বাস্তব জগতের অনুকরণ কখনোই নয়।

রসবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

রস কি বস্তু বা রসের স্বরূপ কি ? বস্তুজগতের সঙ্গে তার যোগই বা কতটুকু ? আদৌ কোন যোগ আছে কি ? বহুকাল থেকেই এ প্রশ্ন সাহিত্যতত্ত্ববিদ্‌দের ভাবিয়ে তুলেছে। রস কি দুরূহ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় কিছু ? একেবারেই কি ধরাছোঁয়ার বাইরে ? বোধ ও বোধির পক্ষে কি নিতান্তই প্রতারক ?

নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত প্রশ্ন তুলেছেন "রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ" এবং এর উত্তরে নিজেই বলেছেন "উচ্যতে আস্বাদ্য তৎ।" অর্থৎ রস হ'ল আস্বাদ্য বা আস্বাদন-যোগ্য। কিংবা বলা উচিত আস্বাদনই রস, কেননা আস্বাদন না হওয়া পর্যন্ত রসের কোন অস্তিত্ব নেই। সংস্কৃত 'রস্' ধাতুর অর্থই আস্বাদন করা—'রস্যতে ইতি রসঃ।' পূর্বোক্ত গ্রন্থের একটি শ্লোকে ভরত বলেছেন, 'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।' অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগেই রসের নিষ্পত্তি ঘটে। এ তো গেল সাদা বাঙলার অর্থ, আসল কথা কি ? এই শ্লোকটি নিয়েই প্রায় দু'হাজার বছর ধরে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, মতভেদ ও ব্যাখ্যা ভেদের অন্ত নেই। শ্লোকটি ভিত্তি করেই বস্তুতঃ পক্ষে এক বিশাল রস প্রস্থান (রস শাস্ত্র) গড়ে উঠেছে। রসের সংজ্ঞা নিয়েই নানা মুনির নানা মত—সেই মতারণ্যে রসশাস্ত্র বৃক্ষের বীজটুকু খুঁজতে যাওয়া বা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যদিও ভরত রসকেই কাব্যের বীজরূপ ব'লে বর্ণনা করেছেন।

রসের সংজ্ঞা কি ?

বস্তুত পক্ষে কাব্য-নাটক ইত্যাদি পাঠের বা অভিনয় দর্শন-শ্রবণের ফলে সহৃদয় 'সামাজিকের' চিত্তে এক রসানুভূতি বা রস স্পন্দন ঘটে এবং এই রসানুভূতি দর্শক-পাঠককে এমন এক নৈর্ব্যক্তিক লোকে নিয়ে যায় যার ফলে তিনি (দর্শক বা পাঠক) তদ্‌গত হয়ে পড়েন। ফলে কাব্যের ভাবানুভূতির সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বা আত্মসাযুজ্য ঘটে। এই আত্মসাযুজ্যের মধ্য দিয়েই তিনি ভাবজগতের তুরীয় লোকে উত্তীর্ণ হন এবং পার্থিব আনন্দের উর্ধ্বে এক অপার্থিব বা অ-লৌকিক আনন্দ অনুভব করেন। অর্থাৎ লৌকিক জগতের আনন্দের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সেই জন্যই রসকে অ-লৌকিক বলা হয়েছে। সুতরাং বলা চলে যে সহৃদয় সামাজিকের সুকাব্য পাঠজনিত হৃদয় বৃত্তির আনন্দময় উপলব্ধি বা আস্বাদনের নামই রস।

প্রাথমিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে রসসৃষ্টির উপাদান মূলতঃ দুটি :

১. মানসিক উপাদান বা কবির জগৎ

২. বাহ্যিক উপাদান বা কাব্যের জগৎ

রসের মানসিক উপাদান হ'ল মনের কতকগুলি ভাব (স্থায়িভাব) নামে চিত্ত বৃত্তি

বা emotions আর রসের বাহ্যিক উপাদান হ'ল কাব্যের জগৎ। আলংকারিকদের মতে কাব্য জগতের বাহ্যিক ক্রিয়ায় মনের ভাবসমূহই রসে রূপান্তরিত হয়। কাজেই রস হ'ল এক ধরনের মানস-রাসায়নিক (Psycho-chemical) প্রক্রিয়ার ফল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত শ্লোকে বিভাব-অনুভাব ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও স্থায়িভাবের উল্লেখ নেই।

পরবর্তী কালে আলংকারিকেরা বলেছেন, যে-ভাবসমূহ মানব চিত্তে স্বতন্ত্র ও স্থায়িভাবে বিরাজমান তাদের বলা হয় স্থায়িভাব। এঁদের মতে স্থায়িভাব ৮+১ =৯টি।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থম্ প্রোক্তা শমোঽপি চ॥

অর্থাৎ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এই ৮টি এবং শম নিয়ে মোট ৯টি ভাব স্থায়ী। এদের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ইত্যাদির সংযোগ ঘটলে এরা যথাক্রমে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্তরসে পরিণত হয় বা নিষ্পত্তি লাভ করে।

কিন্তু এই ৯টি স্থায়িভাব ছাড়াও মানুষের মনে আরও নানা ভাবের অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলি স্থায়ী নয় ব'লে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'সঞ্চারী' বা 'ব্যভিচারী।' এরা বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শেই আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া প্রভৃতি ৩৩টি ভাবের কথা তাঁরা বলেছেন। তাঁদের মতে এগুলি স্থায়িভাবের মতো মানবচিত্তে স্বতন্ত্র অবস্থায় স্থায়িভাবে থাকে না। কোন না কোন স্থায়িভাবের সম্পর্কসূত্রেই মনের মধ্যে যাতায়াত করে। তাই এদেরকে ব্যভিচারি-ভাব বলা হয়েছে। আবার এরা স্থায়িভাবের অভিমুখেই মনকে সঞ্চারিত করে বলে এদের আরেক নাম সঞ্চারি-ভাব।

'শকুন্তলা' নাটকে স্থায়িভাব 'রতি।' কিন্তু পাশাপাশি বা একই সঙ্গে চিন্তা, দৈন্য, উদ্বেগ, স্মৃতি, ব্রীড়া, হর্ষ প্রভৃতি নানা ভাব এক একবার চিত্তে উদিত ও বিলীন হচ্ছে অর্থাৎ আসা যাওয়া করছে, কিন্তু সর্বদাই মূল ভাব 'রতি'-র পোষকতা করছে ব'লে এদের নাম ব্যভিচারী বা সঞ্চারী।

এতো গেল কাব্যের মানসিক উপাদান। কাব্যের বাহ্যিক উপাদান হ'ল কাব্যের জগৎ। এই জগতের দুটি প্রধান উপকরণ বিভাব ও অনুভাব। স্থায়িভাবের উদ্বোধক যে কারণসমূহ লৌকিক বা বাস্তব জগতে রয়েছে, কাব্যে বা নাটকে নিয়োজিত বা নিবেশিত হ'লেই সেই কারণসমূহ 'বিভাব' নামে অভিহিত হয়। আলংকারিক বিশ্বনাথের ভাষায় ঃ

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য নাট্যয়োঃ।" এই বিভাব আবার দু'রকমের ঃ ১. আলম্বন, ২. উদ্দীপন। যে বস্তু বা চরিত্রকে অবলম্বন বা আলম্বন ক'রে রসোৎপত্তি ঘটে তাকে বলা হয় 'আলম্বন' বিভাব। যেমন শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্ত ও

শকুন্তলা আলম্বন বিভাব আর যে সকল বস্তু বা অবস্থা রসোদ্দীপনে সহায়তা বা আনুকূল্য করে তাদের বলা হয় 'উদ্দীপন' বিভাব। যেমন 'শকুন্তলা' নাটকে মালিনী তীর, পুষ্পোদ্যান, তপোবন, বসন্তকাল, চন্দ্রালোক প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক বস্তু 'উদ্দীপন' বিভাব।

আর অনুভাব হ'ল যা' ভাবের 'অনু' বা পশ্চাৎ আসে। মনের ভাব জাগ্রত হ'লে যে সমস্ত স্বাভাবিক উপায় বা বিকারের সাহায্যে তা বাইরে প্রকাশিত হয় ভাবরূপ কারণের সেই সব কার্যকে কাব্য ও নাটকে অনুভাব বলা হয়।

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকেষুঃ কার্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥

অনুভাব হ'ল আসলে আলম্বন বিভাবেরই কার্য। 'অনু' মানে পশ্চাৎ। তাই, কারণ (বিভাব)-সমূহের পশ্চাতে যার অবস্থান তার নাম 'অনুভাব'। প্রসিদ্ধ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবকে (স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বিবর্ণতা, অশ্রু, মূর্চ্ছা) রতিভাবের অনুভাব বলা যায়। অনুরূপভাবে বক্ষে করাঘাত, ক্রন্দন, পতন ও মূর্চ্ছা হ'ল শোক ভাবের অনুভাব বা বহিঃপ্রকাশ। আবার শকুন্তলার ছল করে কুরুবক শাখা থেকে বল্কল মোচন ও কটাক্ষে দুষ্যন্তের রূপদর্শন, পায়ের তলা থেকে কুশাঙ্কুর মোচনের চেষ্টাও 'অনুভাব' পর্যায়ভুক্ত। বস্তুতঃ পক্ষে নায়ক নায়িকার প্রতিটি চেষ্টা বা কার্যই কোনো না কোন চিত্তবৃত্তির বা ভাবের বহিঃ প্রকাশ ব'লে তা' অনুভাব রূপে গণ্য ও অভিহিত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রসবাদীরা বাহ্যিক উপাদান বা বস্তুজগৎকে অস্বীকার করেন নি। বরং মেনেই নিয়েছেন। কেননা বিভাব ও অনুভাব বাইরের প্রভাবেই আসে। এই বহিঃ প্রভাব না থাকলে ত' রসসৃষ্টিই হবে না। কাজেই রসবাদীরা বস্তুজগৎকে কম গুরুত্ব দেননি। প্লেটোর মতো তাঁরা কোন আইডিয়া থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই জগতের অনুকরণ বা নকলের নকল থেকে কাব্য হয়েছে একথা বলতে চাননি। সরাসরি বাস্তবজগৎ থেকেই কারণ স্বরূপ বিভাব, অনুভাব এসে স্থায়িভাবের সংযোগে রসোৎপত্তি বা রসনিষ্পত্তি ঘটাচ্ছে—একথাই বলতে চেয়েছেন।

অভিনব গুপ্ত বিভাব ও অনুভাবকে সকল হৃদয়ে সমবাদী বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ যে লৌকিক ভাবের তারা প্রতিমূর্তি সেই লৌকিক ভাব সাধারণতঃ ব্যক্তিহৃদয়েই সীমাবদ্ধ এবং অবশ্যই "সামাজিক" নয়। প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্বোধন তা' প্রেমিকের নিজের হৃদয়েই আবদ্ধ, পরিমিত ও লৌকিক। কিন্তু কবি তাঁর "অপূর্ব-বস্তুনির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা" বলে বা প্রতিভার সাহায্যে এই পরিমিত ও লৌকিক ভাবকে সকল হৃদয়ে সমবাদী, অপরিমিত ও অ-লৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। বস্তুতঃ শব্দে সমর্পিত হ'লে ভাব ব্যক্তিগত লৌকিক অর্থের গণ্ডী ভেঙে মুক্ত হয়। কারণ শব্দ বা ভাষা জিনিসটাই তো যৌথ ব্যাপার বা সামাজিক। অভিনব গুপ্তের প্রদত্ত সংজ্ঞা হোল; "শব্দসমর্প্যমাণ হৃদয় সংবাদ সুন্দর বিভাবানুভাব সমুদিত প্রাঙ্-

নিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগ সুকুমার স্বসংবিদানন্দ চর্বণ ব্যাপারো রসনীয়ো রূপো রসঃ।" অর্থাৎ রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সংবিৎ-এর আস্বাদ রূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনির্দিষ্ট রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয় বলেই সংবিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক ভাবের কারণ ও কার্য কবির নির্বাচিত শব্দে সমর্পিত হয়েই সকল হৃদয়ে সমবাদী যে বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্যপাঠকের চিত্তে অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ কাব্যের বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে যার ফলে কাব্যে বর্ণিত ও চিত্রিত চরিত্রের সঙ্গে পাঠক হৃদয়ের একটি সাধারণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। একে বলে 'সাধারণীকরণ'। এর ফলে কাব্যপাঠকের মনে হয় কাব্যে বর্ণিত চরিত্র ও ভাব সমূহ পরের কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়, নিজের অথচ সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি ক'রেই কাব্যের আস্বাদন আর কোন ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিছিন্ন থাকে না। 'ধ্বন্যালোক' রচয়িতার ভাষায়

> পরস্য ন পরস্যেতি
> মমেতি ন মমেতি চ
> তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
> পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।

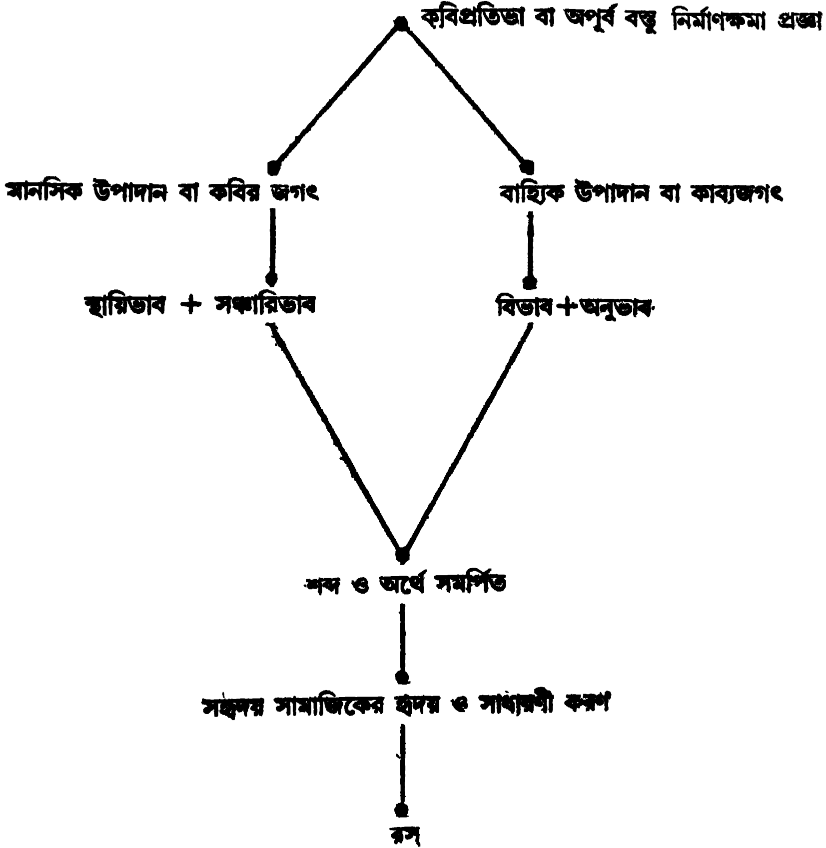
তা হ'লে এতক্ষণ ধরে যা' আলোচনা করা হ'ল তার সার সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়াল যে (১) রসনিষ্পত্তি কালে, (২) লৌকিক জগতের বস্তু অর্থাৎ বিভাব ও অনুভাব, (৩) কবি প্রতিভা বলে, (৪) শব্দ ও অর্থে সমর্পিত হয়ে, (৫) অ-লৌকিক কাব্যজগতের বিভাব ও অনুভাব রূপে পরিচিত হয়, তারপর, (৬) সহৃদয় সামাজিকের (সহৃদয় পাঠকের) চিত্তের বাসনা লোক থেকে অনুরূপ স্থায়িভাব ও সঞ্চারী ভাব উদ্ভূত হয় এবং লেখক-পাঠক সংযোগ বা (৭) সাধারণী করণের ফলে পাঠক চিত্ত রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণ থেকে মুক্ত হয়ে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। তখন স্থায়িভাবের একতান প্রবাহহেতু তন্ময় ও স্থির চিত্তে স্বস্বরূপ চিদানন্দের প্রকাশ এবং স্মৃতি সহযোগে তার যে চর্বণা তা-ই রস।

> "সত্ত্বোদ্রেকাৎ অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
> বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

রসশাস্ত্রের প্রবর্তক ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যকাব্যের রস নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, সেই সূত্র ধরেই আমরা এতক্ষণ রসবাদের মূল কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। ভরতের মতে 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদ্ অর্থ প্রবর্ততে' অর্থাৎ রস ব্যতিরেকে (রসাৎ+ঋতে) কোন অর্থেরই প্রবৃত্তি সম্ভব হ'তে পারে না। আগেই বলেছি এই রসের নিষ্পত্তি হয় "রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ···" প্রভৃতি ৮টি স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে। ভরতের মতে রস ৮টি।

> শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
> বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

পরবর্তীকালে অভিনব গুপ্ত 'শান্ত রসকে একটি পৃথক্ রস ব'লে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং শান্তরসের স্থায়িভাব হ'ল 'শম' বা 'নির্বেদ'। অর্থাৎ পরবর্তীকালে কালক্রমে আলংকারিকদের কাছে রসের সংখ্যা দাঁড়াল ৯টি। অতুল গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে নয়টি রসের কথাই বলেছেন।



এছাড়াও অনেকেই সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের কথা বলেছেন। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক ও অলংকার শাস্ত্রীগণ। কিন্তু ভরতের মতে তা' কখনও সম্ভব নয়। কারণ পুত্রের প্রতি পিতা-মাতার যে রতি বা স্নেহ তা' কখনও স্থায়ী চিত্তবৃত্তি রূপে গণ্য হ'তে পারে না। কারণ সকলেই পিতা-মাতা নন। তেমনি দেব দেবী বিষয়ক 'রতি' যা থেকে ভক্তিরসের উদ্ভব ধ'রে নেওয়া হয় তাও স্থায়ী চিত্তবৃত্তি নয়। যেমন বৈষ্ণবেরা 'কৃষ্ণ রতি'-র কথা বলেছেন। তাঁদের কাছে এটিই একটি স্থায়িভাব। কিন্তু ভরত হয়ত বলতে চাইবেন

যে, সকলেই যেহেতু ভক্তিমান্ বৈষ্ণব নন, সে হেতু "কৃষ্ণ রতি" একটি স্থায়িভাব হ'তে পারে না।

এও না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু পিতামাতা না হয়েও ত' বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য-রসাশ্রিত পদাবলী বা রবীন্দ্রনাথের 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথে'র অনেক কবিতাই আস্বাদন করা যায়। তেমনি ধার্মিক বা ভক্তিমান্ না হয়েও রামপ্রসাদী ভক্তিসংগীত, রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্যায়ের গান, অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তের ভক্তিরসাশ্রিত গান-গুলির রস আস্বাদন করা সম্ভব।

কাজেই এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে।

এ তো গেল স্থায়িভাবের কথা। সঞ্চারী ভাব থেকে সাধারণতঃ রসসৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই মূল ভাব (স্থায়ী) থেকে জাত রস ও সঞ্চারীভাব থেকে জাত রসের মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ স্বীকার করতেই হয়।

বৈষ্ণব আলংকারিকেরা ভক্তিরসের পাঁচটি ভাগ স্বীকার করেছেন : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। শৃঙ্গার রসকে আলংকারিকেরা 'আদিরস' ব'লে থাকেন, বৈষ্ণবেরা তা'তে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনত্ব আরোপ ক'রে তার নাম দিয়েছেন 'মধুর' বা 'কান্ত' বা 'উজ্জ্বল' রস।

আলংকারিক মতে শকুন্তলা নাটকের স্থায়িভাব 'রতি'। দুষ্যন্ত শকুন্তলা আলম্বন বিভাব; অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবসমূহের কথা আগেই বলেছি, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ নাটকের মূল রস বা অঙ্গীরস 'শৃঙ্গার'।

তেমনি 'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা'—চণ্ডীদাসের এই বিখ্যাত পদে কিশোরী রাধা আলম্বন বিভাব, কালো মেঘ, কালো চুল, ময়ূর-ময়ূরী প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব, 'সদাই ধেয়ানে মেঘ পানে' চেয়ে থাকা, আহারে বিরতি, রাঙা বাস পরিধান করা প্রভৃতি হ'ল 'অনুভাব'। আর এর রস হ'ল পূর্বরাগ জনিত শৃঙ্গার—বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। কিন্তু বৈষ্ণব আলংকারিকগণ একে ব্যাখ্যা করবেন একটু অন্য ভাবে। "কৃষ্ণ রতি" থেকে জাত এ রসের নাম, তাঁদের মতে, 'শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রস।

'হাস' নামক স্থায়িভাব থেকে হাস্য রসের উৎপত্তি। আজকাল হাস্য রসের সম্পূর্ণ কাব্যনাটক আমরা পাচ্ছি বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে দেখি সাধারণতঃ অন্য রসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক রস হিসাবেই হাস্যরসের প্রকাশ ঘটত। যেমন শকুন্তলা নাটকে বিদূষক হাস্যরসের আলম্বন বিভাব। এই নাটকে আর কোথাও হাস্যরসের নামগন্ধও নেই। হাস্যরস সে যুগে খুব যে একটা উঁচু আসন পেত বিদূষক জাতীয় স্থূল চরিত্রসৃষ্টি দেখে তা' তো মনে হয় না।

ভবভূতির মতে করুণ রসই একমাত্র রস। অন্যান্য রস তারই বিবৃতি বা বিবর্তন বা পরিণাম মাত্র।

> একো রসঃ করুণ-এব নিমিত্ত ভেদাদ্
> পৃথক্ পৃথাগিবাশ্রয়তে বিবর্তান।

ভবভূতির উত্তর রামচরিত করুণ রসের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মূল ভাব শোক। আলম্বন বিভাব রাম ও সীতা।

বেণীসংহার নাটকে ভীম চরিত্রে রৌদ্র রসের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তার উদ্দীপন বিভাব দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও সভা মধ্যে বস্ত্রহরণ এবং তজ্জনিত ভীমের ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহা। ক্রোধই রৌদ্ররসের স্থায়িভাব। অতুল গুপ্ত মহাভারত থেকে বিদুলার ক্রোধোদ্দীপ্ত যে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তাতেও রৌদ্র রস ধরা পড়েছে।

"অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি হি জ্বল।
মা তুষাগ্নিরিবানর্চি ধূমায়স্ব জিজীবিষু॥
মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ং ন তু ধূমায়িতং চিরম্।

অনুবাদ ঃ "তিন্দুকের (গাবগাছের) অঙ্গারের মতো এক মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠ, প্রাণের মায়ায় শিখাহীন তুষের আগুনের মতো ধূমায়মান থেকোনা। চিরদিন ধূমায়িত থাকার চেয়ে মুহূর্তের জন্য জ্বলে ভস্ম হওয়াও শ্রেয়।" বীর রসের উপাদান হ'ল 'উৎসাহ' নামে রতি ও স্থায়িভাব। রবীন্দ্রনাথের যদি 'তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে' অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে তোল উচ্চে রণজয় গাথা / রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে / শোন ঐ ডাকে ভারত মাতা" অথবা নজরুলের 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল / নিম্নে উতলা ধরণী তল / অরুণ প্রাতের তরুণ দল / চলরে চলরে চল।' প্রভৃতি গান বীর রসের দৃষ্টান্ত এবং এর মূল ভাব উৎসাহ।

ভয়ানক ও বীভৎস রস সাধারণতঃ অঙ্গীরস বা প্রধান রস হিসাবে কাব্যে নাটকে ব্যবহৃত হয়না, অন্য রসের সহচর রূপেই গৌণ রস হিসাবে দেখা দেয়। ভয়ানক রসের অনুভাব হ'ল মুখ বর্ণের পাণ্ডুরতা, রোমাঞ্চ, স্বেদস্রুতি, পলায়ন প্রভৃতি শারীরিক বিকার। এর মূলভাব ভয় নামক রতি। মালতীমাধব নাটকে শ্মশান বর্ণনা, কাপালিকের কার্যকলাপ, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসেও কাপালিকের ক্রিয়াকলাপ এবং এডগার অ্যালান পো-র অতিপ্রাকৃত ভূতের গল্পে ভয়ানক রসের পরিচয় মেলে।

বীভৎস রসের স্থায়িভাব 'জুগুপ্সা' বা ঘৃণা। এই রস নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্য হ'তে পারেনা। প্রধান রসের সহকারী রস হিসাবেই কাব্যে নাটকে এর সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে। মেঘনাদবধ কাব্যের "প্রেতপুরী" নামক অষ্টম সর্গে বীভৎস রসের দৃষ্টান্ত মেলে। যথা "সে রোগের পাশে বিশাল-উদর বসে উদর-পরতা অজীর্ণ / ভোজনদ্রব্য উগরি দুর্মতি / পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত তুলিয়া গিলিছে।"

অথবা,

'মলমূত্র না বিচারি কিছু / অন্নসহ মাখি হায়, খায় অনায়াসে।'

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে অবধূতের 'উদ্ধারণ পুরের ঘাট' উপন্যাসটি বীভৎস রসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

অদ্ভুত রসের মূলে আছে 'বিস্ময়' নামক স্থায়ি ভাব। বিস্ময়বোধ আমাদের

সহজাত। কবিগুরু গ্যেটে এক স্থলে ব'লেছেন যে বিস্মিত হ'তে না জানলে জীবনের বহু আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হ'তে হয়।

আলংকারিক নারায়ণ ধর্মদত্তের মতে সকল রসের সার অদ্ভুত রস এবং অদ্ভুত রসকেই তিনি একমাত্র রস ব'লে মনে করেন।

আধুনিক কাব্যবিচারেও বিস্ময় রসকে (spirit of wonder) গুরুত্ব দেওয়া হয়। আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের উক্ত নামাঙ্কিত প্রবন্ধে অদ্ভুত বা বিস্ময় রসের প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কিন্তু অভিনব গুপ্ত শান্ত রসকেই সর্বোত্তম রস বলেছেন। তাঁর মতে এই রসের স্থায়িভাব শম-ই সকল রসের মূল বা প্রকৃতি-স্থানীয় হয়ে অন্য সকল রসের জন্ম দিয়ে থাকে।

ভোগ-তৃষ্ণার বিলয় থেকে যে সুখ এবং তার যে পরিপুষ্টি সেই লক্ষণ যুক্ত রসের নামই শান্ত রস। অভিনব গুপ্ত শান্তরসের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'নাগানন্দ' নাটকের নাম উল্লেখ করেছেন। আনন্দবর্ধন দেখিয়েছেন যে মহাভারতে ঘটনা বৈচিত্র্য, বিষয় বৈচিত্র্য ও চরিত্র বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং শান্ত রসই মহাভারত কাব্যের মূল রস।

প্রায় অনুরূপ কথাই রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধেও বলেছেন, "বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"

বৈষ্ণব আলংকারিকরাও অবশ্য শান্ত রসের কথা বলেছেন। তবে এ শান্ত রস অভিনব গুপ্তের সংস্কৃত আলংকারিক দৃষ্টিতে যে শান্তরস তার থেকে এই অর্থে পৃথক যে এখানে এক মাত্র শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে সর্বসমর্পণের মধ্যেই এর সার্থকতা। বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা' বিষয়ক পদসমূহ বৈষ্ণবীয় শান্ত রসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

কিন্তু একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক কালে আমরা পূর্বোক্ত রস সমূহের সূত্র ধ'রে সাহিত্য বিচার করিনা। বলিনা যে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যে শৃঙ্গার রস, 'কথা ও কাহিনী'তে বীর রস, 'পূরবী'তে করুণ রস আছে। এভাবে আজকাল কাব্যের বিচার হয়না। কিংবা কাব্যদেহকে খণ্ড খণ্ড করে বলিনা যে অমুক স্থলে শৃঙ্গার, বীর বা করুণ রস হয়েছে। বরং অখণ্ড ভাবে কাব্য বিচার ক'রে আমরা তার মধ্যে মানব রস (human interest) বা জীবন রস, চরিত্র সৃষ্টির রস (বিশেষতঃ উপন্যাস বিচারে) কিংবা কাব্য বিচারে ইমেজ বা বাক্-প্রতিমার সন্ধান ক'রে থাকি।

ভারতবর্ষীয় রসবাদীরা রসবিচারে যথেষ্ট ধীশক্তি, মনীষা ও প্রজ্ঞা দৃষ্টির পরিচয় দিলেও কাব্য দেহকে তাঁরা খণ্ড খণ্ড করে দেখেছেন, কাব্যদেহের সমগ্রতা বা totality দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন। সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখার ফলেই এটি ঘটেছে। তাঁরা রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যখন বিভাব অনুভাবের কথা বলেছেন তখন পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ তথা সমাজজীবনকে উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু রসের প্রতি আত্যন্তিক দৃষ্টি

নিবদ্ধ থাকায় বস্তুজগৎ থেকে দূরে সরে গেছেন। রসই তখন তাঁদের কাছে পরম পুরুষার্থ রূপে বিবেচিত হয়েছে। অন্য সব কিছুই গৌণ ব'লে গণ্য হয়েছে। ফলে তাঁদের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। যখন তাঁরা বস্তুজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন তখন তাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, বরং উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি বাস্তব জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্যই হোক বা ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্ম তত্ত্বের প্রভাবেই হোক রসাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদরের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। ফলে সেটি ভাববাদী জীবনের উত্তুঙ্গ স্তরে বা তুরীয় জগতের অগম্য তীরে উপনীত হয়েছে বা অস্পর্শগম্য বস্তুর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥ (সাহিত্য দর্পণ)

"অর্থাৎ রস এক আনন্দ-ঘন বা আনন্দ স্বরূপ চেতনা ; কোন বিষয়ান্তরের সংস্পর্শে এর প্রবাহ বিচ্ছিন্ন নয় ; যে রজঃ মানুষের কামনা ও কর্ম প্রবৃত্তির মূল, যে তমঃ তার চিত্তকে লোভ ও মোহে বন্ধ ও আবৃত রাখে—তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত ক'রে সত্ত্ব রূপে এর আবির্ভাব হয়। সুতরাং এর আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর।"

(দ্রঃ কাব্য জিজ্ঞাসা/পৃঃ ৫৮)

অভিনব গুপ্তও রসের আস্বাদকে বলেছেন 'পরব্রহ্মাস্বাদ সচিবঃ'—পর ব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য আস্বাদ।

এখন প্রশ্ন হ'ল ভরত-রসসূত্রের "রসনিষ্পত্তি" শব্দের অর্থ কি ?

রসের নিষ্পত্তি কি ভাবে ঘটে তা নিয়ে পরবর্তীকালে নানা মুনির নানা মত—বিভিন্ন আলংকারিক ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে চারজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হ'লেন ভট্ট লোল্লট, ভট্ট শঙ্কুক, ভট্ট নায়ক ও অভিনব গুপ্ত। এই চারজনই ভারতীয় রসসূত্রের প্রধান ভাষ্যকার। এছাড়া মম্মটাচার্য ও বিশ্বনাথ-ও এই চারজন ভাষ্যকারের পন্থা অল্পবিস্তর অনুসরণ করেছেন।

ভরতের রসসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য পর্যালোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

১. ভরতের রসসূত্রে বিভাব, অনুভাব ব্যভিচারি ভাবের উল্লেখ থাকলেও স্থায়িভাবের উল্লেখ নেই।

২. 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ ভরতের কিরূপ অভিপ্রেত ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

৩. 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থও ভরত স্পষ্ট ক'রে নির্দেশ করেন নি। ফলে বিভিন্ন ভাষ্যকারের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন, সন্দেহ, মতভেদ এবং ব্যাখ্যাভেদ দেখা দিয়েছে।

লোল্লটাচার্য্যের মতে কাব্য-নাটক থেকে যে রসবোধ হয় তা' পাঠক বা দর্শকের

কাছে গৌণ; দর্শক পাঠক বা সহৃদয় কোন ব্যক্তির চিত্তে সাধারণভাবে রসের সৃষ্টি হয় না।

তা হ'লে প্রশ্ন হ'ল রসের মুখ্য আশ্রয় কে? এবং রসের নিষ্পত্তিই বা কি ভাবে হয়।

এর উত্তরে লোল্লট উদাহরণসহ বলেছেন যে শকুন্তলা নাটকে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে আশ্রয় করেই রসের উদ্ভব। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা হল রসের "অনুকার্য"। কারণ দুষ্যন্ত শকুন্তলা নামক মূল ঐতিহাসিক (?) বা পৌরাণিক পাত্র-পাত্রীর অনুকরণ যেহেতু এই দুই চরিত্রে করা হয়েছে, সেহেতু এরা 'অনুকার্য'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য নাটককে লোকবৃত্তির অনুকরণ বলা হয়েছে। ভরতের এই সূত্র ধরেই সম্ভবতঃ লোল্লট 'অনুকার্য' কথাটি এখানে এনেছেন। তবে প্লেটো-অ্যারিস্টটল-প্রোক্ত অনুকরণের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। আবার মিল ও আছে। কারণ অ্যারিস্টটল বস্তুজগতের বা প্রকৃতি জগতের অনুকরণের কথা বলেছেন। আর এঁরা প্রকৃতি জগতেরই অন্তর্গত মানুষের (পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক) অনুকরণের কথা বলেছেন। অর্থাৎ লোল্লটের মতে নাটকের পাত্রপাত্রীরা মূল পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক (?) চরিত্রের 'অনুকর্তা'।

এখন যেটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটি হ'ল কবি, সহৃদয় কাব্য পাঠক, অনুকার্য (মূল ঘটনা বা চরিত্র), অনুকর্তা—এই চারজনের মধ্যে রসের মুখ্য আশ্রয় কে?

লোল্লটের মতে 'অনুকার্য'ই' প্রকৃতপক্ষে রসের আশ্রয়। তিনিই যথার্থ রসানুভব ক'রে থাকেন। শকুন্তলা নাটকের যে শৃঙ্গার রস তা ঐতিহাসিক (?) পৌরাণিক দুষ্যন্ত শকুন্তলার পক্ষেই আস্বাদ ক'রে থাকা সম্ভব। মূল ভাব রতি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার হৃদয়েই রসোৎপত্তি ঘটিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হোল তা'তে আমাদের দর্শক- পাঠক কুলের কি লাভ?

যাইহোক, লোল্লটের মতে ভরত সূত্রের 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি'। এবং উৎপত্তি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন "অভূত প্রাদুর্ভাব"। অর্থাৎ আগে যা ছিল না (ন+ভূত = অভূত) পরে তার আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। যেমন মৃত্তিকা থেকে ঘটের উৎপত্তি। অর্থাৎ ঘট পূর্বে ছিল না, পরে হ'ল। মৃত্তিকাই ঘটের কারণ বা উৎপাদক। অনুরূপ ভাবে রসও এক অ-পূর্ব বস্তু। অ-পূর্ব বস্তু, কেননা পূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না, পরে হ'ল। অর্থাৎ মূল চরিত্র দুষ্যন্ত-শকুন্তলার চিত্তে বিভাবানুভাবব্যভিচারি-ভাবের সংযোগে শৃঙ্গার রসের যে প্রাদুর্ভাব হ'ল তার অস্তিত্ব আগে ছিল না. পরে এর উৎপত্তি হ'ল। কাজেই এটি অভূত প্রাদুর্ভাব। এবং লোল্লটের মতবাদ, তাই, 'উৎপত্তিবাদ' নামে পরিচিত।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। নাটকের বা কাব্যের পাত্রপাত্রীর হৃদয়ে রসের প্রাদুর্ভাবে আমাদের কি লাভ ক্ষতি? এর উত্তরে হয়ত তাঁরা বলবেন যে সেই রস সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সঞ্চারিত হওয়ার পরেই রসের পূর্ণতা, কিন্তু লোল্লট সে কথা বলেন নি।

ভট্ট শঙ্কুকের অন্‌ুমিতি বাদ ঃ

লোল্লটের রসবাদের বির্‌ুদ্ধ মত শোনা গেল ভট্ট শঙ্কুরের অন্‌ুমিতিবাদে। আচার্য শঙ্কুকের মতে রস কখনও অন্‌ুকার্য নায়ক-নায়িকার চিত্তে উৎপন্ন হ'তে পারে না। রসান্‌ুভূতি কেবল মাত্র সহৃদয় সামাজিকের চিত্তেই উৎপন্ন হ'তে পারে। তাঁর মতে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে স্থায়িভাবের অন্‌ুমানই হ'ল রসান্‌ুভূতি। এর থেকেই তাঁর মতবাদের নাম হয়েছে 'অন্‌ুমিতিবাদ।' শঙ্কুকের মতে স্থায়িভাবের সঙ্গে বিভাব-অন্‌ুভাব ও সঞ্চারী ভাব হ'ল "অন্‌ুমাপক" অর্থাৎ যার সাহায্যে অন্‌ুমান করা যায়। আর রস হ'ল "অন্‌ুমাপ্য"। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্‌ ধ্‌ুমাৎ'—এখানে ধ্‌ুম হ'ল অন্‌ুমাপ্য।

এছাড়া ভরতের রস স্‌ুত্রের 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ হ'ল তাঁর মতে 'অন্‌ুমিতি'। কিসের অন্‌ুমিতি? না, স্থায়িভাবের অন্‌ুমিতি। কিন্তু অন্‌ুমিতির আশ্রয় কে? শকুন্তলা নাটকের অভিনয় দর্শন কালে সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তি কোথায় এবং কি ভাবে স্থায়িভাবের অন্‌ুমান ক'রে থাকেন? অন্‌ুকার্য দ্‌ুষ্যন্ত-শকুন্তলাই কি এর আশ্রয়? না অন্‌ুকর্তা নট-নটীরাই এর আশ্রয়? এর উত্তরে শঙ্কুক বলেন যে সহৃদয় দর্শক নাট্যাভিনয় দর্শন কালে অন্‌ুকর্তা নট-নটীদের মধ্যেই স্থায়িভাবের অন্‌ুমান ক'রে থাকেন, অন্‌ুকার্য নায়ক-নায়িকার মধ্যে নয়। এইভাবে তিনি লোল্লটের উৎপত্তিবাদের বির্‌ুদ্ধে অন্‌ুমিতিবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে অভিনেতা-অভিনেত্রীরাই যে রসের আশ্রয় এ কথা মেনে নিতে দ্বিধা হয়।

[illegible] **ভ্‌ুক্তিবাদ ঃ** ইতঃপ্‌ুর্বে আমরা দ্‌ুজন প্‌ুর্বাচার্যের রসব্যাখ্যা লক্ষ্য করলাম। দেখা গেল যে এঁদের কারও ব্যাখ্যাতেই সহৃদয় সামাজিকের ভূমিকা ম্‌ুখ্য হয়ে ওঠেনি। আচার্য্য ভট্টনায়ক তাঁর ভুক্তিবাদে এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেছেন। কবির কাব্য থেকে যে রসান্‌ুভূতির জন্ম হয়, তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভট্টনায়ক-সাহিত্যের তিনটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যথাঃ

১. অভিধা
২. ভাবনা
৩. ভোগীকৃতি

অভিধা হ'ল শব্দের আভিধানিক অর্থ।

অর্থাৎ বিবিধ শব্দের সমবায়ে কবি বিভিন্ন অর্থের যে বোধ জাগিয়ে তুলতে চান, তা-ই হ'ল ভট্টনায়কের মতে, শব্দের অভিধা। ভাবনা হ'ল সেই বস্তু যার সাহায্যে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রসভাবনা বা রস-প্রতীতি জেগে ওঠে। আর ভোগীকৃতি হ'ল সেই বস্ত্‌ু যা ভাবনার ফলে দর্শক পাঠক চিত্তে ব্যক্তিত্বের বাধা বা প্রাচীর ভঙ্গ ক'রে অন্তর্জগতে রসভুক্তি বা রসাস্বাদন ঘটায়।

অভিধা ও ভাবনা যথাক্রমে শব্দ ও অর্থের স্বতন্ত্র শক্তি। আর ভোগীকৃতি সম্প্‌ুর্ণতঃ সহৃদয় সামাজিকের অন্তঃকরণের বিষয়। সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত যখন

বাইরের বস্তুজগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অন্তর্জগতের রসাস্বাদনের মধ্যে নিঃশেষে নিমগ্ন হয় তখনই ঘটে ভোগীকৃতি বা রসভুক্তি। এর থেকেই ভট্টনায়কের রসবাদ সম্পর্কিত মতবাদের নাম ভুক্তিবাদ।

অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ : অভিনব গুপ্তের মতবাদ আলংকারিক মহলে অভিব্যক্তিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এটি রসশাস্ত্রের শেষ কথা এবং অভিনব 'গুপ্তই রসশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা তা। তিনি ভট্টনায়ক-কথিত অভিধাকে অস্বীকার করেন নি, তবে ভাবনা ও ভোগীকৃতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে শব্দের অভিধা ও লক্ষণা—এই দুটি ব্যাপারই কাব্যরসিক সমাজে সুপরিচিত, কিন্তু ভাবনা ও ভোগীকৃতির অস্তিত্ব সাধারণ পাঠক সমাজে অপরিচিত। ভোগীকৃতি ত' এক ধরনের মানস-প্রতীতি, তাই এর নতুন নামকরণের কি প্রয়োজন? আর ভাবনা শব্দেরই বা প্রয়োজন কি? ভাবনা তো কাব্যনাটক দেখে দর্শক-পাঠক চিত্তে স্বতঃই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। একেই তো বলা হয় 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদ'।

অভিনব গুপ্তের মতে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে আত্ম-চৈতন্যের আনন্দ আবরণ-কারী অজ্ঞানতার অপসারণ বা আবরণ ভঙ্গ। এর ফলেই আনন্দ স্বরূপ চৈতন্যের বা আত্মার ধীরে ধীরে উন্মোচন বা অভিব্যক্তি ঘটে। এটিই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য এবং যে প্রক্রিয়ায় আত্মচৈতন্যের বা আনন্দ-স্বরূপের আবরণ ভঙ্গ ঘটে তাকেই ধ্বনিবাদীরা ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন ব্যাপার বলেছেন।

কাজেই দেখা গেল যে অভিনব গুপ্তের মতে রসানুভূতি হ'ল চৈতন্যের আনন্দ-স্বরূপের আবরণ ভঙ্গ বা অভিব্যক্তি। কাজেই ভরতের রসসূত্রের 'রসনিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ তাঁর মতে দাঁড়াল রসের অভিব্যক্তি।

অভিনব গুপ্তের পর আলংকারিকদের মধ্যে 'সাহিত্য দর্পণ'-কার বিশ্বনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে রসাত্মক বাক্য মাত্রই কাব্য—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। কাব্যের কতকগুলি গুণ, রীতি ও অলংকারের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এগুলি কাব্যের উৎকর্ষের হেতু ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। ধ্বনি তত্ত্ব নিয়েও তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু ধ্বনিবাদীদের মতো ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা ব'লে স্বীকার করেন নি। তবে ধ্বনি-কাব্যকে উত্তম কাব্য ব'লে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে কাব্যের আত্মা হ'ল 'রস'। ভরতের "বিভাবানুভাব-ব্যভিচারি সংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ" সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি রসকে কাব্যের আত্মা ব'লে রসবাদের শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষণা করেছেন এবং রসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ধ্বনিবাদের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্যদেহ নিয়ে যেমন চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি কাব্যের আত্মার সন্ধানেও আত্মনিয়োগ করেছেন। এই সন্ধানকার্যের সূত্র ধরেই কখনও ধ্বনি কখনও গুণ, কখনও রীতি, কখনও বক্রোক্তি, কখনও ঔচিত্য, কখনও বা রসাত্মক বাক্য কাব্যের আত্মা বা প্রাণরূপে ঘোষিত হয়েছে। এতে কাব্যাত্মার সন্ধান কতখানি পাওয়া গেছে জানিনা, তবে কাব্যবিশ্লেষণে আলংকারিকদের ধীশক্তি, মনীষা ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা (criticism)-রীতির সঙ্গে এর মিল না থাকলেও এই আলংকারিক (Rhetoric) পদ্ধতির মধ্যে তাঁদের মননশীলতার সূক্ষ্মতা ও বিষয়ের অন্তঃপুরে গভীর অনুপ্রবেশ শীলতা আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

ভারতীয় দর্শন যেমন স্থূল থেকে সূক্ষ্মতায়, বস্তু থেকে বস্তুর অতীতে, খণ্ড থেকে অখণ্ডে, দেহ থেকে আত্মায়, বহু থেকে একের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চরণ করতে পারে, ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রও তেমনি বস্তুজগৎ থেকে ভাবলোকে এবং কাব্যদেহ থেকে কাব্যের আত্মায় অনায়াসে উপনীত হ'তে পেরেছে। অলংকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে সর্বৈব গৃহীত নাও হ'তে পারে, কিন্তু এঁদের দার্শনিক প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও সাহিত্যিক মননপ্রকর্ষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। এঁরা বস্তুবাদী নন, তবে বস্তু জগৎকে একেবারে অস্বীকার করতেও পারেন নি।

আলোচ্য নিবন্ধে ধ্বনিবাদের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাচ্ছে।

প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে এ বিষয়ে সকলে একমত যে কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, শব্দ ও অর্থ (শব্দার্থ) হ'ল কাব্যের দেহ। কালিদাসের বিখ্যাত শ্লোকের ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে বা উল্টো ক'রে নিয়ে বলা চলে যে বাক্ ও অর্থ (বাগর্থ) পার্বতী পরমেশ্বরের মতোই পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্পর্কে অন্বিত। 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'— শব্দ ও অর্থের সহিতত্বই কাব্য। এঁরা বলেন যে কাব্য থেকে শব্দ ও অর্থকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিলে এমন কোন উপাদান অবশিষ্ট থাকেনা যা'কে আমরা কাব্যের আত্মা ব'লে নির্দেশ করতে পারি। কাব্য বিচারে এঁরা চার্বাকপন্থী বা দেহাত্মবাদী। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সংকীর্ণ জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে যদি এঁরা কাব্যের পশ্চাদ্‌বর্তী বিশাল বস্তুজগৎ ও মানবজীবনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করতেন তবে কাব্য বিচারে এক মহৎ সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্যতঃ তা হয় নি এবং নানা মতারণ্যে এঁদের মতবাদ হারিয়ে গেছে এবং ভারতীয় দর্শনের ভাববাদিতার সর্বগ্রাসী প্রভাবে এবং আত্মা-সন্ধানের আত্যন্তিক আগ্রহে এঁদের মতবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। তবুও আত্মা-সন্ধানীরা বস্তুজগৎকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি। বস্তুজগৎকে

স্বীকার করে নিয়েই 'নেতি নেতি'-পদ্ধতিতে তাঁরা 'ইতি'-তে পেঁাছেছেন। অর্থাৎ প্রথমে বস্তুজগৎকে মেনে নিয়েই তাঁরা যাত্রা শুরু করেছেন এবং বস্তুর অতীত লোকে পেঁাছবার প্রয়াস করেছেন।

শব্দার্থবাদীদের মতবাদের উত্তরে ভামহ প্রমুখ একদল আলংকারিক বললেন যে সৌন্দর্য আছে বলেই কাব্য সহৃদয় সামাজিকের কাছে উপাদেয়। এই সৌন্দর্যের উপাদান হ'ল অনুপ্রাস, উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকার বা ভণিতি বৈচিত্র্য যা শব্দ ও অর্থকে বৈশিষ্ট্য বা শোভা-সৌন্দর্য দান করে। এঁরা তাই অলংকারবাদী। 'অলম্' শব্দের অর্থই সৌন্দর্য। এঁদের মতে 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে।' এই মতের প্রধান প্রবক্তা আচার্য দণ্ডী (৬ষ্ঠ/৭ম শতাব্দী)। আর ভামহের মতে অলংকারের অন্য নাম 'বক্রোক্তি' এবং সমস্ত বক্রোক্তির মূলে আছে অতিশয়োক্তি। এবং অতিশয়োক্তিই কাব্যের প্রাণ।

ভামহের (৭ম শতক) এই অলংকার প্রস্থানের (মতবাদের) বিরুদ্ধে দণ্ডীই আবার আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন যে অলংকার সৌন্দর্যের কারণ হ'লেও কাব্যের অধিকতর অন্তরঙ্গ উপাদান হ'ল গুণ—শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সৌকুমার্য, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি প্রভৃতি দশটি গুণ। গুণই কাব্যের সহজ সৌন্দর্য, এরাই কাব্যকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলে। আর অলংকার কাব্য সৌন্দর্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও মহিমান্বিত ক'রে তোলার বাহ্য উপাদান মাত্র। তাই দণ্ডীর মতে গুণই কাব্যের আত্মা ; আর অলংকার কাব্যের বহিরাঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

এই ভাবে মতবৈষম্য ও বিচার বৈষম্যের Polemical বিতর্ক মূলকতায় কালক্রমে (আচার্য দণ্ডীর পর থেকে) কাব্যের গুণ ও অলংকারের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আচার্য বামন দণ্ডী-কথিত দশটি গুণ স্বীকার ক'রে নিলেও রীতিকেই কাব্যের আত্মা ব'লে ঘোষণা করলেন—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। রীতি কি, না, "বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ' এবং 'বিশেষো গুণাত্মা'। অর্থাৎ এমন ভাবে শব্দ ও অর্থের সন্নিবেশে 'বিশিষ্টা পদরচনা' করতে হবে যাতে শ্লেষ, প্রসাদ প্রভৃতি দশটি গুণ কাব্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে পারে। এই রকমের রচনারীতিই তাঁর মতে কাব্যের আত্মা। আচার্য বামন কাব্যরীতির তিনটি ভেদ স্বীকার ক'রে নিলেন। ১. বৈদর্ভী, ২. গৌড়ী ৩. পাঞ্চালী। এদের মধ্যে বৈদর্ভী রীতিই শ্রেষ্ঠ, কেন না পূর্ব কথিত যাবতীয় গুণাবলী নাকি এই রীতিতেই সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এছাড়াও কালক্রমে দেশভেদে লাটী,আবন্তী ইত্যাদি নানা রীতির নামকরণ হ'তে লাগল এবং রীতির তালিকা ক্রমশঃ বেড়ে যেতেই লাগল।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। কবি-ব্যক্তিত্বের কোন্ শক্তিতে যে রচনা বিশিষ্ট ও বিশেষ গুণাত্মক হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে এঁরা উচ্চবাচ্য করেন নি। এখানেই স্টাইলের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কিন্তু কাব্যদেহ ছেড়ে এঁরা কবিব্যক্তিত্বের প্রতি বা সেই

ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে যে দেশকাল ও সমাজ-পরিবেশ (Race, milieu and moment) রয়েছে তার প্রতি একেবারে উদাসীন। তাই রীতিবাদীরা শুধু বিশেষ রচনাংশেই সীমাবন্ধ থেকেছেন, তার বাইরে যেতে পারেন নি। এই জন্যই ইংরেজী style কথাটার বাঙলা ঠিক রীতি নয়, যদিও অনেকে style অর্থে রীতি কথাটি ব্যবহার করতে চান। আমাদের মতে style এর বাঙলা 'স্টাইল' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এর পর আচার্য কুন্তকের বক্রোক্তিবাদের কথা বলা যেতে পারে। কুন্তক রস ও ধ্বনিকে গৌণ করে উক্তির বক্রতা বা বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ (জীবিত · প্রাণ) বলেছেন। বক্রোক্তি অর্থে এখানে অলংকারের অন্তর্গত শ্লেষ-বা কাকু বক্রোক্তি নয়, বলাই বাহুল্য। বক্রোক্তি বলতে কুন্তক বুঝিয়েছেন 'প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকী বিচিত্রা অভিধা' এবং 'বৈদগ্ধ্যভণিতিবৈচিত্র্য'। শব্দ ও অর্থের সাহিত্যই কাব্য কিন্তু সেই শব্দার্থই কাব্যত্ব লাভ করে, যখন তার প্রকাশের মধ্যে বক্রতা বা aesthetic quality থাকে। কুন্তকের মতে শব্দ হবে 'বিবক্ষিতার্থৈকবাচকঃ' এবং অর্থ হবে 'সহৃদয়াহ্লাদকারিস্বস্পন্দসুন্দরঃ'। অর্থাৎ শব্দটি যেন ঠিক ঠিক বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ করে এবং অর্থটি যেন নিজের মহিমায় সুন্দর হয়ে সহৃদয় পাঠকের হৃদয় আহ্লাদিত করে।

'প্রসিদ্ধাভিধানব্যতিরেকী বিচিত্রা অভিধা' বলতে কুন্তক বলতে চেয়েছেন সচরাচর প্রচলিত অর্থে যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা' অতিক্রম ক'রে যদি শব্দ 'ভণিতি বৈচিত্র্য' লাভ করে অর্থাৎ প্রচলিত শব্দ ছেড়ে যদি অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ভণিতি বা বলার মধ্যে বৈচিত্র্য আসে, তবে তার নাম বক্রতা। এবং এই বক্রতাই কাব্যের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু কুন্তকের এই মতবাদে একটা স্ববিরোধিতা আছে। কাব্যরচনা কালে কবি যদি প্রচলিত আভিধানিক শব্দ পরিত্যাগ ক'রে কেবল নতুন নতুন উদ্ভট উদ্ভট শব্দই বেছে নেন, তবে কাব্য লেখা খুবই সহজ সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যে কেউ অভিধান খুলে নিয়ে কাব্য লিখতে পারবেন। কাজেই বক্রোক্তি কাব্যের একটা গুণ হ'তে পারে যাকে aesthetic quality বলা যায়, কিন্তু কাব্যের প্রাণ নয়।

এর পর ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবাদের প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। ঔচিতবাদীদের মতে কাব্যের রসভঙ্গের অন্যতম কারণ অনৌচিত্য—'অনৌচিত্যাৎ ঋতে নান্যৎ রসভঙ্গস্য কারণম্।' ঔচিত্যই কাব্যের আসল মানদণ্ড। অর্থাৎ কবি কেমন বিষয়বস্তু ও চরিত্র বেছে নেবেন, কোন্ অঙ্গী রসের অঙ্গ হিসাবে কোন্ কোন্ রস পরিবেশন করবেন—এই সব কিছুর মূলে থাকে কবির ঔচিত্যবোধ। ইংরেজীতে একে Propriety বলা যেতে পারে। কিন্তু কবি-প্রতিভার মধ্যেই শিল্পবোধের সঙ্গে মাত্রাবোধ বা ঔচিত্যবোধ থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং অভিপ্রেত। এর জন্যে পৃথক প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। কবির 'সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা'র সঙ্গেই তা' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। কাজেই ঔচিত্য অবশ্যই কাব্যের অন্যতম ধর্ম। কিন্তু প্রাণ বা আত্মা নয়। কালের পরিবর্তনে নূতন নূতন শক্তিমান কবির হাতে নূতন নূতন ঔচিত্যের সৃষ্টি হয়। আগে দেবতা

যা ক্ষত্রিয় বীর ছাড়া মহাকাব্যের নায়ক হ'তনা, কিন্তু মাইকেল অনার্য রাক্ষসকে নায়ক ক'রে নতুন ঔচিত্য সৃষ্টি করলেন ও নবযুগের মহাকাব্য লিখলেন।

এর পর সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে 'ধ্বন্যালোক' রচয়িতা আচার্য আনন্দবর্ধনের (৯ম শতক) আবির্ভাব একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। আনন্দবর্ধন দেখালেন যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মধ্যে একটি অনভিব্যক্ত অর্থ থাকে যা সাধারণ পাঠকের কাছে অলক্ষিত থাকলেও সহৃদয় কাব্য পাঠকের কাছে তা' সহজেই ধরা পড়ে বা অভিব্যক্ত হয়। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'। চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে তিনি এটি বোঝাতে চেয়েছেন এই ভাবে—

প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং লাবণ্যমিব অঙ্গনাসু॥

অর্থাৎ রমনীদেহের লাবণ্য যেমন প্রসিদ্ধ অবয়ব-সংস্থানের অতিরিক্ত বস্তু, মহাকবিদের বাণীতেও তেমনি এমন এক বস্তু আছে, যা শব্দার্থের বা কাব্যশরীরের অতিরিক্ত। আনন্দবর্ধন ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন :

যত্রার্থ : শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্গ্যঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিত॥

অর্থাৎ যেখানে কাব্যের শব্দ ও অর্থ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ ক'রে (উপসর্জন ক'রে) ব্যঞ্জিত অর্থকেই প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেন।

আনন্দবর্ধন এই ধ্বনি-কেই কাব্যের আত্মা ব'লে নির্দেশ করেছেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল কিসের ধ্বনি? কিসের ব্যঞ্জনা? এই প্রশ্নের মীমাংসার পূর্বে কিছু শব্দগত বা ব্যাকরণগত তথ্য জানা প্রয়োজন। 'ধ্বনি' অলংকার শাস্ত্রে একটি পারিভাষিক শব্দ। প্রচলিত অর্থের (শব্দ বা Sound) সঙ্গে এর মিল নেই।

শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যঞ্জার নামই ধ্বনি।

কিন্তু এই 'ধ্বনি'-র স্বরূপ কি? এর জন্য পূর্বেই বলেছি, শব্দবোধ ও ব্যাকরণগত কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন।

বৈয়াকরণ ও নৈয়ায়িক গণ শব্দের দু'টি বৃত্তি বা শক্তিকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যথা : ১. অভিধা, ২. লক্ষণা

নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা সুনির্দিষ্ট অর্থকে বোঝালে তাকে 'অভিধা' বলা হয়। যেমন 'সিংহ' বললে একটি চতুষ্পদ হিংস্র প্রাণী বোঝায়। সেটিই তার সুনির্দিষ্ট অর্থ, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। অভিধা-শক্তিই শব্দের মূলীভূত শক্তি। এর অপর নাম বাচ্যার্থ বা শব্দার্থ। এই অভিধা-শক্তির দ্বারা মুখ্য বা মূল অর্থের উপলব্ধিতে যদি বাধা জন্মায় এবং বাচ্যার্থের সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও যদি অন্য এক বিশিষ্ট অর্থের অনুমান হয়, তবে তাকে শব্দের 'লক্ষণা-শক্তি বলা হয়। এর অর্থকে লক্ষ্যার্থ' বা

'লাক্ষণিক অর্থ" বলা হয়ে থাকে। যেমন : 'পুরুষ-সিংহ'। এই শব্দে সিংহ-সদৃশ বিশেষ কোন তেজস্বী পুরুষকে বোঝায়, যে কোন পুরুষকে নয় বা পুং জাতীয় সিংহকেও নয়।

অভিধা ও লক্ষণা শক্তির নিজ নিজ অর্থ শক্তির অতিরিক্ত আরও একটি শক্তি আছে। এই শক্তি বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে অতিক্রম করে একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থের দ্যোতনা করে। তাই এর নাম ব্যঞ্জনা-শক্তি এবং এর সাহায্যে প্রাপ্ত অর্থ হ'ল ব্যংগ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনি। যেমন : "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতে নাচেরে ইত্যাদি"···অংশে নিছক বাচ্যার্থের সাহায্যে রচনাটির মূল লক্ষ্যে বা মর্মমূলে পেঁাছোনা যাবে না। আর এর লক্ষ্যার্থ ত হৃদয়ের সংগে ময়ূরের উপমা দানেই নিঃশেষিত হয়েছে। কিন্তু নব বর্ষাগমে নৃত্যরত ময়ূরের উল্লাসের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বর্ষা প্রকৃতির তথা মানবহৃদয়ের যে প্রকাণ্ড উল্লাস ও উভয়ের মধ্যকার সুনিবিড় একাত্মতা ধরা পড়েছে বা ব্যঞ্জিত হয়েছে, সেটিই এই কবিতার মূল কথা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ধ্বনিবাদীরা ব্যঞ্জনাকে রমণীদেহের অবয়ব-সংস্থানের অতিরিক্ত লাবণ্য ব'লে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে রমণী-দেহের লাবণ্য অবয়বের অতিরিক্ত অন্য বস্তু হ'য়েও তা' অবয়রের দ্বারাই প্রকাশিত। অবয়বকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলে লাবণ্যের কোন অস্তিত্বই থাকে না। এ বিষয়ে আলংকারিক মহিম ভট্ট (ব্যক্তিবিবেক ১১ শ শতক) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিন্তু ধ্বনিবাদীদের মতবাদ প্রাধান্যে তাঁর মতবাদ কালক্রমে চাপা প'ড়ে গেছে। তবে ধ্বনিবাদীরা এই মতবাদ একেবারে উড়িয়েও দিতে পারেন নি। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে ব্যংগ্যার্থ বাচ্যার্থের অতিরিক্ত হ'লেও বাচ্যার্থের দ্বারাই প্রকাশিত। একটি শ্লোকে চমৎকার উপমার সাহায্যে তা' বলাও হয়েছে। যথা :

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥

অর্থাৎ আলোকার্থীকে আলো জ্বালাতে হ'লে দীপাধারের জন্য যেমন যত্নবান্ হ'তে হয়, তেমনি যিনি ব্যংগ্যার্থের আদর করেন তিনিও বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান্ হয়ে থাকেন। দীপাধার বা তৈলবর্তিকা, এমনকি দীপশিখা ও তাপ যেন বাচ্যার্থ এবং দীপশিখা থেকে বিচ্ছুরিত আলো যেন ব্যংগ্যার্থ। ধ্বনিকার তাই ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন।

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ।
ব্যংগ্যঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিত ॥"

অর্থাৎ যেখানে কাব্যের শব্দ বা অর্থ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ ক'রে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বা ব্যংগ্য বলেন। কিন্তু ব্যংগ্যার্থ যদি অপ্রধান হয় তবে তা' ব্যচ্যার্থকেই অধিক মনোহারী ক'রে তোলে এবং তাকে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি বলা যায় না। সমাসোক্তি, সংকর-অলংকার প্রভৃতি অলংকারে অনেক সময় ব্যংগ্যার্থ থাকলেও তা' প্রকৃত ধ্বনিকাব্যের বিষয় হয় না। কারণ [illegible] প্রকৃত

ধ্বনি নেই। তা' বাচ্যার্থকেই চমৎকারিত্ব দান করে মাত্র। এসব ক্ষেত্রে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রাধান্য লাভ না ক'রে গৌণ বা গুণীভূত হয় বলে এর নাম 'গুণীভূত ব্যঙ্গ্য'।

তাই ধ্বনির স্বরূপ নির্ধারণ ক'রে আনন্দবর্ধ্বন তাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথাঃ

১ অ-বিবক্ষিতবাচ্য ২. বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য

বিবক্ষা শব্দের অর্থ বলবার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়। বাচ্যার্থ যেখানে মোটেই বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত নয়, প্রতীয়মান অর্থই যেখানে প্রধান, সেখানে ধ্বনি হ'ল 'অবিবক্ষিত বাচ্য'। এবং শ্রেষ্ঠ ধ্বনি মাত্রই আনন্দবর্ধনের মতে অবিবক্ষিত বাচ্যের অন্তর্গত। ধ্বন্যালোকের দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির আরও দুটি ভেদের কথা বলা হয়েছে। যথা ঃ ক. অর্থান্তরে সংক্রমিত খ. অত্যন্ত তিরস্কৃত।

১. অববিক্ষিত বাচ্যধ্বনি

ক. অর্থান্তরে সংক্রমিত খ. অত্যন্ত তিরস্কৃত

ক. বাচ্যার্থ যেখানে নিজের অর্থ না বুঝিয়ে অর্থান্তর বা অন্য অর্থ বোঝায় তখন তার নাম অর্থান্তরে সংক্রমিত। যথা ঃ

'জাগিয়াছে দুর্যোধন, মূঢ় ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।'

—এখানে দুর্যোধন অর্থে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধনকে বোঝাচ্ছে না, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ কামী এক বিশিষ্ট শক্তির নাম দুর্যোধন। বিশেষ ব্যক্তি এখানে নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, কাজেই ব্যক্তি দুর্যোধন এখানে অন্য অর্থে বা অর্থান্তরে সংক্রমিত হয়েছে।

খ. যেখানে বাচ্যার্থ নিজের অর্থকে অত্যন্ত তিরস্কৃত বা দূরীকৃত ক'রে একেবারে বিপরীত অর্থ তুলে ধরে সেখানে তার নাম 'অত্যন্ত তিরস্কৃত'। যেমন ঃ কপালে অনেক সুখ দিয়েছ, আর সুখে কাজ নেই।'—এখানে 'সুখ' শব্দ মূল অর্থকে দূরীকৃত বা তিরস্কৃত করে বিপরীত 'দুঃখ' অর্থকেই ব্যঞ্জিত করছে।

২. বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ঃ যদি বাচ্যার্থ বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত হয়েও অন্যপর বা অন্য একটি অর্থকে প্রধান ক'রে তোলে তবে তার নাম 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য।' অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাচ্য অর্থটি বাচ্য হয়েই থাকে, কিন্তু আর একটি অর্থকেও সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জিত করে। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ও দু'ধরনের।

২. বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য

ক. সংলক্ষ্যক্রম খ. অ-সংলক্ষ্যক্রম

ক্রম শব্দের অর্থ আগে-পরের সম্বন্ধ যাকে ইংরেজীতে বলা হয় sequence.

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতে বাচ্যার্থ যদিও নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনিকেও প্রকাশ করে, কিন্তু সেটা মানতে হবে যে কাব্যপাঠক শব্দ ও অর্থ অর্থাৎ বাচ্যার্থকেই আগে গ্রহণ করেন বা তাঁর কাছে শব্দের বোধই সর্বাগ্রে ধরা পড়ে, তারপর ধরা পড়ে ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ। এই দুই বোধের মধ্যে আগে পরের ব্যবধান বা পৌর্বাপর্যের বা ক্রম থেকেই যায়। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে সংলক্ষ্য-ক্রম। উদাহরণতঃ কুমারসম্ভব কাব্যের বহুপঠিত, বহু উদ্ধৃত বিখ্যাত শ্লোকটির কথা বলা যেতে পারে ঃ

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।

এখানে পার্বতী কর্তৃক লীলাকমলের পত্রগণনা—এই বাচ্যার্থের স্থূল অর্থ দ্বারাই পরে সূক্ষ্ম অর্থ পার্বতীর পূর্বরাগের লজ্জা—এই ব্যঙ্গ্যার্থটি ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বে বাচ্যার্থ ও পরে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির ক্রমটি এখানে স্পষ্টতঃই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কিন্তু যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রতীতির ক্রমটি লক্ষ্য করা যায়না এবং বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একই কালে একই "ক্রমে" প্রকাশিত হয় বলে মনে হয়, সেখানে তার নাম অ-সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি। রসাত্মক বাক্যমাত্রই অ-সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির উদাহরণ। কারণ বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারি-ভাবের 'সংযোগে' যখন রসের 'নিষ্পত্তি' ঘটে, তখন বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ একই কালে প্রকাশিত হয় বলে এদের মধ্যকার আগে-পরের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না। আনন্দবর্ধন কুমারসম্ভব কাব্যের বসন্ত পুষ্পাভরণা উমার আগমন (আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং...ইত্যাদি), মদনের শরসন্ধান এবং উমার মুখের প্রতি কিঞ্চিৎ 'পরিলুপ্তধৈর্য' শিবের দৃষ্টিপাত প্রভৃতি বর্ণনাকে অ-সংলক্ষ্যক্রম-ধ্বনির উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে একই কালে একই ক্রমে পাঠক চিত্তে প্রতীত হচ্ছে। বাঙলা কাব্য থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

"দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে"

এই পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ার সংগে বাস্তবতঃ কবির সাক্ষাৎ সম্ভব নয়, অথচ সেই অসম্ভব সাক্ষাৎ-চিত্রই এই কবিতায় অসাধারণ সৌন্দর্যে লাবণ্যে বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের ক্লাসিক্যাল সাহিত্য, সভ্যতা ও সৌন্দর্যই একযোগে ব্যঞ্জিত হয়েছে। ফলে এটি ব্যক্তি নিরপেক্ষ যে কোন সহৃদয় সামাজিকের রসোপলব্ধিতে সহজেই ধরা পড়ে।

এছাড়াও, ধ্বনিবাদীরা অন্য দৃষ্টি থেকেও ধ্বনিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

১. বস্তুধ্বনি ২. অলংকার ধ্বনি ৩. রসধ্বনি।

বস্তুধ্বনি : বাচ্যার্থ থেকে যখন কোন বস্তুর ব্যঞ্জনা ঘটে তখন তা বস্তুধ্বনি। বস্তু মানে বিষয়বস্তু। রসের সঙ্গে এর দূর বা নিকট সম্বন্ধ থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু ধ্বনি মাহাত্ম্যে তা উপাদেয় ও উপভোগ্য হ'তে পারে। যেমন :

'এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হ'তে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা।'

এখানে দিক্‌ দিগন্তবিস্তারী মানস সৌন্দর্য রূপিণীর সঙ্গে শৃঙ্গার রস হ'তে পারে না, অথচ বিষয় বস্তুর ধ্বনি সৌন্দর্যে তা' কত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে !

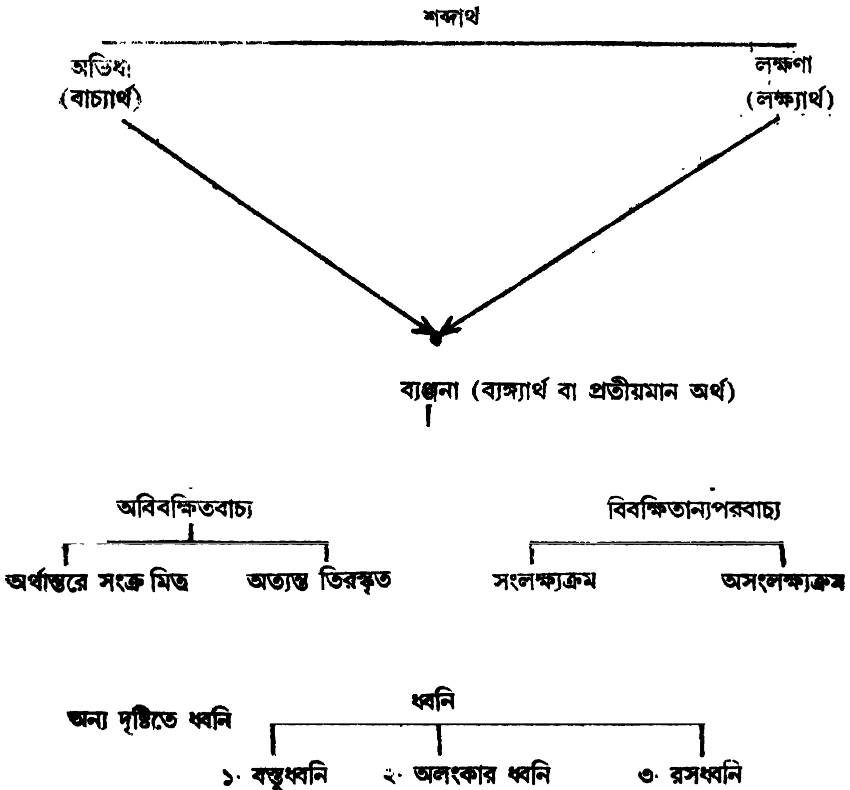
২. যখন বাচ্যার্থ থেকে কোন অলংকার ব্যঞ্জিত হয় তখন তার নাম অলংকার-ধ্বনি। যেমন :

'যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা।'

এখানে ব্যতিরেক অলংকার-ধ্বনির মাধ্যমে কবির ভালোবাসার পক্ষপাতিত্বে ধরণীর ক্ষুদ্র প্রজাপতি-পতঙ্গ আকাশের সুবৃহৎ রামধনুর চেয়েও অধিকতর সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই সৌন্দর্য অলংকারেরই সৌন্দর্য। পণ্ডিতদের ভাষায় অলংকার-ধ্বনি।

৩. আর বাচ্যার্থ থেকে যখন কোন রসের ব্যঞ্জনা হয় তবে তার নাম রসধ্বনি। এই রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠধ্বনি এবং আনন্দ বর্ধন একেই কাব্যের আত্মা ব'লে নির্দেশ করেছেন। যেখানে রসের স্পর্শ নেই সে কাব্য প্রাণহীন। শব্দ ও অর্থের কংকাল মাত্র। রস কি ? এর জবাবে ধ্বনিবাদীরা বলেন রস হ'ল কবিচিত্তের বিচিত্র অনুভূতি জনিত একটা স্পন্দন যা তাঁকে শব্দার্থময় কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়ে থাকে। এঁরা আরো বলেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অসংখ্য বাসনা নিয়ে এক 'বাসনালোক' বিরাজ করে। সেই বাসনা লোক কাব্যপাঠকালে জাগ্রত হয়ে যখন ব্যক্তিগত সীমা বন্ধনের সংকীর্ণতা লঙ্ঘন বা অতিক্রম করে এবং দেশকালাতীত, শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপে প্রকাশিত হয়, এবং সাধারণীকরণের মাধ্যমে সকল হৃদয়ে সমবাদী বা সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদকারী হয়ে ওঠে, তখনই তাকে রস বলে অভিহিত করা হয়। আসলে রস একটি মানস রাসায়নিক বা Psycho-chemical প্রক্রিয়া মাত্র। ধ্বনিবাদীদের মতে এই রসের ব্যঞ্জনা কাব্যকে সত্যকার কাব্যপদবীবাচ্য ক'রে তোলে। কাজেই কাব্যের ধ্বনি হচ্ছে আসলে রসের ধ্বনি বা রসের ব্যঞ্জনা। এবং এদিক থেকে কাব্যের আত্মা ধ্বনিও বটে রসও বটে।

পূর্বোদ্ধৃত 'এবং বাদিনি···'প্রভৃতি শ্লোকে বস্তুর বা বাচ্যার্থের নয়, অলংকারের নয়, বরং চ শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত পূর্বরাগের লজ্জাই অপূর্ব বাণীলাবণ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কাজেই ধ্বনিবাদীদের মতানুসারে শ্রেষ্ঠকাব্যে কিসের ধ্বনি, কিসের ব্যঞ্জনা প্রশ্ন করলে রসের ধ্বনি, রসের ব্যঞ্জনাই বোঝায়। এই রসধ্বনিই ধ্বনিবাদীদের মতে কাব্যের আত্মা।



এতক্ষণ ধরে কাব্যের আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকে না হয় রসধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা ব'লে খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল তাতে লাভ হ'ল কি? কাব্যদেহকে চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা হ'ল, অনেক নতুন নতুন শব্দ ও পরিভাষাও শেখা গেল, আলংকারিক পণ্ডিতদের ধীশক্তি, প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও মনীষার চরমোৎকর্ষও লক্ষ্য করা গেল, কিন্তু কাব্য যে মানব চরিত্র, মানব সমাজ ও মানব জীবনবৃক্ষেরই অপরিহার্য, অপরিচ্ছেদ্য ও অবশ্যম্ভাবী ফুল বা ফল সেকথা কোথাও বলা হ'লনা। এইভাবে মানবজীবনকে গৌণ রেখে কেবল মাত্র কাব্য-মুখ্য বা কাব্য-সর্বস্ব আলোচনা যতই মনন-সমৃদ্ধ হোক না কেন, জীবন-সমৃদ্ধ নয়। বৃক্ষ, মাটি, জল, বাতাস, আলো বাদ

দিয়ে শুধু ফুলটাকে নিয়েই কাটা ছেঁড়া করা বা ফুলের সৌন্দর্য লাবণ্যে মুগ্ধ হওয়ার মধ্যে বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী বুদ্ধির তথা সৌন্দর্য বোধের প্রকর্ষ প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফুল তো আকাশে ফোটেনা, মৃত্তিকা সংলগ্ন গাছেই ফোটে, যে গাছ আবার মাটির থেকে রস, বাতাস থেকে অক্সিজেন, সূর্যালোক থেকে সালোক-সংশ্লেষ ক'রে তবেই ফুল ফোটাতে পারে। সাহিত্যও তেমনি জীবন বৃক্ষেরই ফুল। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে থাকে টেইন্ কথিত 'race, milieu ও moment' অর্থাৎ মানব জাতি, মানুষের সামাজিক পরিবেশ ও দেশ কাল ইত্যাদি। এদের বাদ দিয়ে সাহিত্য হ'তে পারেনা। সংস্কৃত কাব্য রচনার যুগেও কবিদের মানস জগতে এই -সব উপাদান-উপকরণ অবশ্যই ও অনিবার্যতঃই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকবে, কিন্তু কাব্যের আত্মানুসন্ধানে অত্যধিক ব্যগ্র এবং বাক্যের বার্ণালাবণ্যে ও রসের ধ্বনিমাধুর্যে অপরিসীম মুগ্ধ থাকায় আলংকারিকেরা মানব-জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পাননি। এখানেই ধ্বনিবাদী ও রসবাদী আলংকারিকদের অপূর্ণতা।

সৌন্দর্য বোধ ও রবীন্দ্রনাথ

শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্য-চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বভাবনার চেয়ে বোধের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত তাঁর এতৎ-সম্পর্কিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধটির নাম 'সৌন্দর্য বোধ'; সৌন্দর্য তত্ত্ব বা সৌন্দর্য দর্শন নয়। রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত প্রবন্ধটি ছাড়াও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রচনায় যথা: সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ, পল্লিগ্রামে (পঞ্চভূত, কেকাধ্বনি, আষাঢ়, বাজে কথা (বিচিত্র প্রবন্ধ), সৌন্দর্য ও সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য (সাহিত্য), আত্মবোধ, সৌন্দর্য (শান্তিনিকেতন), রূপ ও অরূপ (সঞ্চয়), ভূমিকা (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা), বাস্তব, তথ্য ও সত্য, সাহিত্য (সাহিত্যের পথে) প্রভৃতি লেখায়, চৈতালির 'তত্ত্ব ও সৌন্দর্য" কবিতায় এবং ছিন্ন পত্রের কয়েকটি চিঠিতে ও প্রাচীন সাহিত্য, যাত্রী, জাপানযাত্রী ও পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী প্রভৃতি অজস্র গ্রন্থের নানা রচনায় তাত্ত্বিকতা বা দার্শনিকতার চেয়ে কবির অনুভূতি ও বোধের মাত্রাই অধিক প্রকাশিত ব'লে আলোচ্য নিবন্ধের নাম সৌন্দর্য তত্ত্ব বা সৌন্দর্য-দর্শন না দিয়ে "সৌন্দর্য বোধ"-ই দেওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধের জন্মমূলে রয়েছে ভারতীয় আলংকারিকদের রসবাদ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও সাহিত্য শাস্ত্রালোচনা, ঔপনিষদিক লীলাবাদ এবং সর্বোপরি কবির গভীর জীবনাভিজ্ঞতা ও সুনিবিড় স্বকীয় উপলব্ধি। ইত্যাকার বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাব-ভাবনার টানাপোড়েনে তাঁর সৌন্দর্য-ভাবনা বা সৌন্দর্য-বোধ গড়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্ত্য কাব্য সাহিত্য তথা সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল প্রগাঢ়। তা সত্ত্বেও তিনি বহুলাংশে ভারতীয় ভাববাদী দৃষ্টিতে, কচিৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সৌন্দর্য বোধের স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাববাদীদের তুলনায় তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যও নেহাৎ কম নয়। অর্থাৎ কবির জীবনোপলব্ধির গভীরতা ও কবিদৃষ্টির প্রগাঢ়তা দিয়েই প্রধানতঃ তিনি সৌন্দর্যবোধকে নিজের মতো ক'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

অর্থাৎ সৌন্দর্য বস্তু বা বিষয়-নির্ভর, না ব্যক্তি বা বিষয়ি-নির্ভর এই নিয়ে বহুকাল ধ'রে যে বিতর্ক চলেছে সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃ কোনও পক্ষে যোগ না দিলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি দুটোকেই গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিকই, তবে ব্যক্তির অনুভূতির ওপরেই জোরটা পড়েছে বেশি। শুধু তা-ই নয়, উপরন্তু সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে তিনি নতুন এক মাত্রা নিয়ে এসেছেন। তা হ'ল সাহিত্য বা হৃদয়ের যোগ। অর্থাৎ কোন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে যদি আমার আত্মার যোগ (বা সহিতত্ব) ঘটে তবেই সে বস্তু বা ব্যক্তি 'সুন্দর' হ'য়ে ওঠে। মায়ের কাছে

শিশু সুন্দর হয়ে ওঠে সুন্দর ব'লে নয়, নিজের ব'লেই। অর্থাৎ হৃদয়ের যোগ, ভালোবাসার যোগেই সে সুন্দর। গোলাপ ফুল সুন্দর। তার সঙ্গে আমার বোধের যোগ হ'ল ব'লেই সে সুন্দর। এখানে তিনি বিষয় ও বিষয়ীর সংযোগ সূত্রেই যে সৌন্দর্যের জন্ম তা' ব'লতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনার বা সৌন্দর্য বোধের ৬টি অঙ্গ। যথাঃ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, আনন্দ, প্রকাশ ও সাহিত্য। এরা পারস্পরিক সমবায়ে ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংবদ্ধ। এই ৬টি অংশ নামে ও রূপে ভিন্ন হ'লেও স্বরূপতঃ এক। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে যা' সত্ত্য, তা-ই সুন্দর, তা-ই মঙ্গল, তা-ই আনন্দময় এবং তার প্রকাশই সাহিত্য। এবং এই সাহিত্য বা সহিতত্বই সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে থাকে অর্থাৎ সত্য+সুন্দর+আনন্দ+মঙ্গল+প্রকাশ+সাহিত্য=সৌন্দর্য বোধ। পরম সত্য বা পরম সত্তা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও তাঁর কাছে পরম সুন্দর। তাই তো তাঁর বিখ্যাত গানেও দেখি, "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর।"

সৌন্দর্য বোধ হ'ল এক চৈতন্যময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় মানসিক অবস্থা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৌন্দর্য-সম্পর্কিত আলোচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌন্দর্যকে সত্য মঙ্গল আনন্দ ইত্যাদি human values বা মানবীয় মূল্যবোধের সঙ্গেই যুক্ত করে' দেখেছেন।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্র-সৌন্দর্য-ভাবনায় যে কথাটি সর্বাগ্রে এসেছে তা' হ'ল 'সামঞ্জস্য'। এই সামঞ্জস্য আবার দ্বিবিধ উপায়ে সাধিত হ'তে পারে।

১. বস্তুর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য

২. বস্তুর সঙ্গে বস্তুর (বা ব্যক্তির) এবং ব্যক্তির সঙ্গে বস্তুর বা ব্যক্তির সম্পর্কের সামঞ্জস্য।

বস্তুর অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য আবার দু'ধরনের হ'তে পারে।

ক. পরিমাণ গত

খ. আকৃতি গত।

প্রাচীন গ্রীক সৌন্দর্য চিন্তায় এ ধারণার অস্তিত্ব মেলে। কারণ প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল পরিমাণ গত ও আকৃতি গত সামঞ্জস্যের দ্বারাই সৌন্দর্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। সেই থেকে এ ধারণা পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্য ভাবনায় বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। রবীন্দ্রনাথ এ ধারণার সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এ ধারণার দ্বারা তিনি সম্পূর্ণতঃ প্রভাবিত হননি। বরংচ নব্য প্লেটোবাদী প্লটিনুসের (plotinus) মতোই তিনি বলতে চেয়েছেন যে সুন্দর বস্তু শুধু নিজের ভিতরকার আকৃতিগত গঠনধর্ম ও সামঞ্জস্যকেই প্রকাশ করেনা, সেইসঙ্গে জগতের যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গেই একটা সামঞ্জস্য গ'ড়ে তোলে। এখানেই সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অর্থাৎ প্রেমের বা হৃদয়ের যোগেই কোন বস্তু বা ব্যক্তি সুন্দর হয়ে ওঠে, তার অভাবেই অসুন্দর।

সামঞ্জস্যের ফলেই "আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালী বনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্য পিপাসু উর্ধ্ববাহু শত সহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মর মুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য ক্রেংকার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য জানেনা, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে আরও অনেক খানি পায়,—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।"
(কেকাধ্বনি/বিচিত্র প্রবন্ধ)।

কিন্তু এ তো গেল বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যের কথা। রবীন্দ্রনাথের মতে সামঞ্জস্য শুধু বস্তু বা বিষয় গতই নয়। বরং বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের এবং এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের আত্মীয়তার যোগেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। কবির ভাষায় "আত্মার কার্য আত্মীয়তা করা।...ইহা হইতেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইল।.. মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন-স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে, সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্ম-পরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য বলি সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানে সেতু।" (সৌন্দর্যের সম্বন্ধ/পঞ্চভূত)

অর্থাৎ সৌন্দর্য, রবীন্দ্রনাথের মতে Subjective ব্যাপার। বস্তুর নিজস্ব কারণে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়না, যতক্ষণ না হৃদয়ের যোগে (বা আত্মীয়তার যোগে) তা' সামঞ্জস্য-পূর্ণ হয়ে ওঠে। "গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর, সুন্দর হ'ল সে" (দ্রঃ আমি/শ্যামলী)—এ হ'ল সম্পূর্ণ হৃদয়ের যোগ যুক্ততার কথা, আত্মীয়তার কার্য বা প্রেমের যোগ। তবে এ হ'ল সম্পূর্ণ ভাববাদী দৃষ্টি, বলাই বাহুল্য, এবং এই যোগ সাধন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনের বা অহৈতুকী লীলা। অবশ্য এ বৈদান্তিক একেশ্বর বাদ বা সর্বেশ্বরবাদ (Pant' eism) নয়। এ বোধ দ্বৈতবোধ। একাকী লীলা হয় না, দুই-কে চাই। আবার সেই আগেকার কথা। হৃদয় + বস্তু বা হৃদয় + হৃদয় = এই দুয়ের যোগেই লীলা।

"একাকী গায়কের নহে তো গান,
মিলিতে হবে দুইজনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা
আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,

বাতাসে বনলতা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।"
(গানভঙ্গ/কাহিনী)

প্রসঙ্গতঃ সৌন্দর্যের প্রয়োজন-নিরপেক্ষতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তার ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফুলের মতো ফলের সৌন্দর্যও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু আমরা ফুলদানিতে ফুল সাজাই, ফলদানিতে ফল নয়। কারণ ফলের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তা' প্রয়োজনের অর্থাৎ রসনার বা উদরের সম্পর্ক। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'আষাঢ়' রচনায় একস্থলে তাই কবি বলেছেন, "ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিযা সেটা দাবি করে; সেইজন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে-রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে।"

তাই, দার্শনিক Croce মানুষের শিল্পবোধ বা Aesthetic activity কে তার প্রয়োজন বোধ বা Economic activity-র থেকে পৃথক ক'রে দেখেছেন।

অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে প্রত্যেক বস্তুরই দুটি ক'রে ধর্ম; ১. প্রয়োজনের ২. অ-প্রয়োজনের। একটি মুখ্য বা প্রয়োজনাত্মক অর্থাৎ utility-র দিক, অপরটি অপ্রয়োজনের বা uselessness-এর দিক। ফুলের মুখ্য লক্ষ্য হ'ল পতঙ্গকে আকর্ষণ করা। কারণ পরাগমিলন ঘটাতে হবে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যকার বায়োলজিক্যাল্ প্রয়োজন সাধন ঘটাতে হবে। ডারউইন্, হার্বার্ট স্পেন্সার, ওয়ালেস্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকগণ এ বিষয়ে আলোচনা ক'রেছেন। আর ফুলের গৌণ লক্ষ্য হ'ল সৌন্দর্য সৃষ্টি—সেটি অপ্রয়োজনের। সেখানে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের স্থান নেই, সেখানে কবিদের আধিপত্য। তুচ্ছতম ফুলও কবিদের রচনায় অশেষ তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়ঃ

"To me the meanest flower that blows can
give
Thoughts that do often lie too deep for
tears." (Intimations of Immortality.......)

কতক কতক ফুল আছে যা খাওয়া হয়। যেমন ফুল কপি, সজনে ফুল। এদের সঙ্গে আমাদের রসনার বা উদরের যোগ অর্থাৎ প্রয়োজনের সম্পর্ক। তাই কাব্যে এরা বিশেষ স্থান পায়নি। শীতের শিশির ভেজা টাট্‌কা ফুলকপি বা বসন্তের আম্রমঞ্জরীর মতো সজনে ফুলও কম সুন্দর নয়, কিন্তু আমাদের রসনা বা উদরের সঙ্গে এদের যোগ ঘনিষ্ঠ ব'লেই কাব্যে এরা প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ বয়সের একটি কবিতায় সজনে ফুলকেও স্থান দিয়েছেন।

"ওই-যে শিমুল, ওই-যে সজিনা, আমায় মেরেছে বাণে,
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে" (যাবার মুখে/সেঁজুতি)

এখানে সজনে ফুল স্থূল প্রয়োজন সাধনের ঊর্ধ্বে কবির "অপ্রয়োজনীয়" আনন্দের হেতু হিসাবে দেখা দিয়েছে। 'অ-প্রয়োজন' বলতে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বোঝেন যা' ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ঊর্ধ্বে এবং যা' স্থূল প্রয়োজনের দাসত্বমুক্ত। তাই তাঁর কাছে জয়দেবের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকর 'ললিতলবঙ্গলতা' ইত্যাদির চেয়ে মানসতৃপ্তি বিধায়ক কালিদাসের 'আবর্জিতা কিঞ্চিদিব' ইত্যাদি অংশ বেশি পরিতৃপ্তিকর মনে হয়েছে। (দ্রঃ কেকাধ্বনি/বিচিত্র প্রবন্ধ) প্রথমটির আবেদন কানের (কর্ণেন্দ্রিয়ের) কাছে, দ্বিতীয়টির আবেদন ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে মনের বা প্রাণের কাছে। সৌন্দর্য যে স্বার্থমুক্ত ও প্রয়োজনাতীত তার উদাহরণ মেলে রবীন্দ্র জীবনের এক স্মৃতি থেকে। সূর্যাস্ত-বেলায় পদ্মাবক্ষে বোটে ক'রে যেতে একটা বিরাট মাছের সলীল সাঁতার দেখে কবির বিস্ময় মুগ্ধতার কথা জানতে পারি, 'জলযবনিকার অন্তরালে যে জীবলীলার আনন্দ' তার সঙ্গে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির শান্ত মৌন সৌন্দর্যের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হ'ল। অথচ মাঝি বলেছিল, 'মাছটা মস্ত বড়ো'— অর্থাৎ পেটুকতার সম্পর্ক। ফলে মাছটাকে সে ভোজ্যদ্রব্যের সংকীর্ণতায় এনে দেখেছিল। কবির মতো তার মধ্যে এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য-পূর্ণ আনন্দ সে খুঁজে পায়নি।

এতো গেল একটি স্থূল বস্তুগত দৃষ্টান্তের নিদর্শন। কবির কাব্যের প্রতি দৃক্পাত করলে দেখব যে সৌন্দর্যকে তিনি স্থূল ভোগবাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত করেই দেখেছেন। 'মানসী'-র সুরদাসের প্রার্থনা কবিতায় কবি সুরদাস কামনালোলুপ দৃষ্টিতে এক সুন্দরী নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন বলেই তিনি সত্যকার সৌন্দর্যকে দেখতে পাননি। তাই আসক্তির মূল কারণ যে চক্ষুদুটি —তাকে উপড়ে ফেলে তিনি "হৃদয় আকাশে থাকনা জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি" ব'লে দেহ-বিযুক্ত রূপের সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

'চিত্রা-র' 'বিজয়িনী' কবিতায় পরিপূর্ণ নগ্ন সৌন্দর্যের কাছে মদন নতজানু হয়ে ধনুঃশর খুলে ফেলে পরাজয় বরণ করেছে এবং 'উর্বশী' কবিতায় Abstract beauty কে নারী রূপের আধারে নিয়ে এলেও তাকে মর্ত্যবাসিনী রক্ত মাংসের নারী রূপে নয়, বরংচ 'নন্দনবাসিনী', অ প্রাপণীয়া, অধরা রোমান্টিক সৌন্দর্য রূপেই দেখেছেন। যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য মানুষের অভীষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত অথচ যা অপ্রাপণীয় ও অস্পর্শগম্য, বিকশিত বিশ্ববাসনার পদ্মদলে তিনি অতি লঘুভার রেখেছেন, কোনও স্থূল ইন্দ্রিয়-বাসনা দিয়ে তাকে পাওয়ার উপায় নেই। সৌন্দর্য, তাই, তাঁর কাছে সাধনার সামগ্রী, সংযমের দ্বারা লভ্য। "যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ। লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।" (দ্রঃ সৌন্দর্য বোধ/ সাহিত্য)

এমনি ভাবে অজস্র কবিতায় ও গদ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে মানুষের

[illegible]জনসম্পর্কের বাইরে এনেই দেখতে চেয়েছেন। এ দেখার মধ্যে যে তার মুখ্য হয়ে উঠেছে সে সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই। একে কোন ক্রমেই বস্তুবাদী দৃষ্টি বলা যায়না।

এছাড়া, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রাচুর্য রয়েছে, সেই প্রাচুর্যের দ্বারাও রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের এই প্রয়োজনাতিরিক্ততার কথাই বলতে চেয়েছেন। একেই তিনি আনন্দের প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্য ব'লে চিহ্নিত করেছেন। বসন্তের বনে যে অজস্র ফুল ফোটে তার অধিকাংশই ঝ'রে যায়, খুব কম ফুলেই ফল ধরে। যদিও ফল ফলানোতেই গাছের ফুল ফোটাবার সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু প্রাচুর্যের দ্বারা যে ঐশ্বর্য প্রকাশ পায়, সেই ঐশ্বর্যেই সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রকাশ। এই ঐশ্বর্যকে তিনি আবার মঙ্গলের সঙ্গেও যুক্ত ক'রে দেখেছেন। সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-আনন্দ ইত্যাদিকে পারস্পরিক অচ্ছেদ্য ও অখণ্ড ঐকসূত্রে দেখার মধ্যেই সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা এবং এর প্রকাশ ও সাহিত্যের (বা সহিতত্বের) মধ্যেই সৌন্দর্য বোধের সার্থকতা।

এবার প্রতিটি অংশ নিয়ে পৃথক-ভাবে আলোচনা করা যাক। যদিও আগেই বলেছি, আলোচনার সুবিধার্থে এদের পৃথকভাবে দেখলেও আসলে এরা একই অ-পৃথগ্ ও অখণ্ড বোধেরই স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ।

দেখা যাক, সত্য বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন ? প্রচলিত অর্থে শিল্পসাহিত্যের সত্য হ'ল real বা reality, বাঙ্লা করলে বাস্তব জগৎ ও জীবন। আর দার্শনিক অর্থে সত্য হ'ল truth বা নিত্য সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মতো ক'রে দুটোকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। 'তথ্য ও সত্য' (সাহিত্যের পথে) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে সত্যের দুটো অংশ তথ্য ও সত্য। যা আমাদের স্থূল জগতের সংবাদটুকু মাত্র জানায় তা' হ'ল তথ্য বা information. একটিকে তিনি জ্ঞানের সত্য, আর একটিকে উপলব্ধির সত্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তথ্যকে তিনি অস্বীকার করেননি। অর্থাৎ তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ দেওয়াই সাহিত্য ও সৌন্দর্যের কাজ। এখানে রবীন্দ্রনাথ 'তথ্য' বলতে বস্তু এবং 'সত্য' বলতে বস্তুর অতিরিক্ত কিছুকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু বস্তুকে একেবারে অস্বীকার করেননি। উদাহরণতঃ তিনি কবি Keats-এর 'ode on a Grecian Urn' কবিতার যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তথ্য ও সত্য কথাদুটি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।

> "Thou, silent form ! dost tease us out of thought
> As doth eternity ." (ode on a Grecian Urn)

একটি গ্রীক পূজাপাত্র বা পান পাত্র কয়েক হাজার বছর পরে বর্তমানের হাতে এসে পৌঁছেছে। বস্তু হিসাবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এটি তথ্য মাত্র। সেই সুপ্রাচীন যুগে এটি যে তৎকালীন বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সাধন করত, বর্তমানে সে প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু এর গায়ে যে অসাধারণ শিল্প সৃষ্টির স্বাক্ষর রয়েছে, তার

আবেদন ত' ফুরোয়নি। তা কালোত্তীর্ণ হয়ে আমাদের কাছে এসে [illegible] আমাদের হৃদয়ের কাছে অনন্তের বাণী বহন ক'রে নিয়ে [illegible]। [illegible] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এক দেশ-কাল-নিরপেক্ষ নিত্য ও শাশ্বত [illegible] চেয়েছেন যার আবেদন সর্বকালীন ও সর্ব-মানবিক। এবং সত্য বলেই তা সুন্দর। তাই কবির ভাষায় "Truth is beauty, beauty truth"

"চৈতালি" কাব্যে "কর্ম" নামে একটি কবিতা আছে। এর এক বাস্তব ভিত্তিও রয়েছে। মোমিন মিঞা নামে কবির এক চাকর ছিল। ভৃত্য হিসাবে সে প্রয়োজনের দাস, প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একদিন সে কাজে আসতে পারেনি। তজ্জন্য ভর্ৎসিত হয়ে সে জানাল যে কাল রাত্রে তার মেয়েটি মারা গেছে। তখন কবির কাছে তার প্রয়োজন-নিরপেক্ষ নিত্যকালীন পিতৃসত্তা ও মানব-রূপটিই বড়ো হয়ে দেখা দিল। ভৃত্যপরিচয় হ'ল তার তথ্যরূপ। কিন্তু পিতৃপরিচয় হ'ল তার সত্যরূপ। এবং সত্য ব'লেই সে সুন্দর হয়ে উঠল। "মেয়ের বাপ বলে তাকে দেখলুম, আমার সঙ্গে তার স্বরূপের মিল হয়ে গেল, সে হলো প্রত্যক্ষ, সে হলো বিশেষ।" (সাহিত্যের পথে/৬১)

অনুরূপ ভাবে সুবিখ্যাত "কাবুলিওয়ালা" গল্পের রহমত শেখ অতি সাধারণ এক কাবুলিওয়ালা মাত্র, অর্থাৎ কবির ভাষায় 'তথ্য' মাত্র; কিন্তু যখন কবির কাছে তার স্নেহদুর্বল পিতৃহৃদয়ের পরিচয়টি উদ্ঘাটিত হল, তখন সে সর্বকালীন, সর্ব-মানবিক সত্যস্বরূপে অধিষ্ঠিত হ'ল। শুধু তা-ই নয়, সে 'সুন্দর' হয়ে উঠল।

এই ভাবে সত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে হৃদয়ের যোগে বা বোধের যোগেই তা' সুন্দর। অর্থাৎ সত্য যেখানে জাগতিক নিয়মের দ্বারা বদ্ধ সেখানে সৌন্দর্যের প্রকাশ নেই, কিন্তু যেখানে তা হৃদয়ের যোগে, আনন্দের যোগে, মঙ্গলের যোগে প্রকাশিত, কোন জাগতিক নিয়মের স্থূল প্রয়োজনের দাসত্বে নিজেকে নিয়োজিত করেনি, সেখানেই যথার্থ সৌন্দর্যের প্রকাশ।

'যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোনো সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাইনা। যে সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ।

এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সুন্দরের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।' (সৌন্দর্য বোধ/সাহিত্য)। অন্যত্র তিনি কবি কীট্‌সের উক্তির সঙ্গে উপনিষদের বাণীকে মিলিয়ে নিয়ে এই কথাটাই এইভাবে বলতে চেয়েছেন, "কবি কীট্‌স্ বলেছেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য, এই কথাটাই

আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ; আনন্দ স্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্ছেন, সেইখানেই তার অমৃতরূপ, আনন্দরূপ।" (দ্রঃ জাপানাযাত্রী)

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধের যে ৬টি অঙ্গের কথা পূর্বেই বলেছি, তারা নামের দিক থেকে ভিন্ন হ'লেও স্বরূপতঃ এক। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে তাদের পৃথক পৃথক করেই আলোচনা করতে হচ্ছে। এখন আনন্দ বলতে স্বতন্ত্রভাবে কি বোঝায় তার আলোচনা করতে গেলেও দেখব যে সত্য, সুন্দর, মঙ্গল প্রকাশ ইত্যাদির সংযোগেই তার অস্তিত্ব। তবুও আনন্দ বলতে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বোঝায় আনন্দ হ'ল মানুষের অন্তরের সহজাত ঐশ্বর্য। উপনিষদে আত্মাকে বলা হয়েছে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আনন্দ স্বরূপ। কাজেই যখন আমরা আত্ম সমাহিত হই, আত্মোপলব্ধি করি, তখনই আনন্দের প্রকাশ ঘটে। মন ও বুদ্ধির দ্বারা যা আমরা কামনা করি তা' সুখপ্রদ হ'লেও আনন্দ দায়ক নয়। "বিচিত্র প্রবন্ধের" একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুখ ও আনন্দের পার্থক্য চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন, 'সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ, পাছে কিছু হারায় বলিয়া ভীত ; আনন্দ, যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত, এই জন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে ; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদার ভাবে প্রকাশ করে। এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মের মধ্যে বদ্ধ, আনন্দ সে-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে ; আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য কেবল ভালো টুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুইই সমান।' (দ্রঃ পাগল/বিচিত্র প্রবন্ধ)

আসলে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর বস্তুতে আনন্দ নেই, আনন্দ রয়েছে নিজের অন্তরের সঙ্গে অন্য বস্তুর একাত্মতার যোগে ও সামঞ্জস্য সাধনে। আনন্দ তখনই হবে যখন কোনো বস্তুকে ঠিক আপনার মধ্যে টেনে নেব বা উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে আসব। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আমারই সত্তা বিরাজ করছে, এই বোধ নিয়ে যখন কোনো বস্তুকে দেখি তখন সত্যসত্যই তাকে আত্মসাৎ বা আত্মগত করে নিই, এই আত্মীকরণের মধ্যেই আনন্দ। এ শুধু পাওয়ার আনন্দ নয়, হওয়ার আনন্দ, বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার আনন্দ।

এর সঙ্গে 'মঙ্গল' ব্যাপারটিও অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত-মিশ্রিত। মঙ্গলের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দুটো জিনিস মুখ্যতঃ লক্ষ্য করেছেন, ১. সামঞ্জস্য ২. ঐশ্বর্য। আবার যথার্থ মঙ্গল সত্য ও সুন্দর। "কেন সুন্দর? কারণ মঙ্গল মাত্রেরই সমস্ত জগতের

সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে ; সকল মানুষের মনের সঙ্গে নিগূঢ় মিল আছে।" (দ্রঃ সৌন্দর্যবোধ/সাহিত্য)

এছাড়া, মঙ্গলের আরও একটি গুণ আছে, তা' হ'ল ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য বলতে বোঝায় যা' আমার ব্যক্তিগত, স্বার্থগত, স্থূল প্রয়োজনগত সীমার উর্দ্ধে। "যখন দেখি, কোন বীরপুরুষ ধর্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে, যাহা আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ।"—একেই রবীন্দ্রনাথ 'ঐশ্বর্য' বলতে চেয়েছেন।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও মানুষের কল্যাণ বা হিতবাদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে ব্যাবহারিক কল্যাণ বা অর্থনৈতিক হিতবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই এতে মহত্ত্ব থাকলেও মাহাত্ম্য নেই। হিতৈষণা থাকলেও ঐশ্বর্য নেই। কারণ তাকে সুন্দর ও আনন্দের সঙ্গে এক ক'রে দেখা হয়নি। এখানেই পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের সঙ্গে ভারতীয় মঙ্গলাদর্শের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ 'মঙ্গল'-বোধের ক্ষেত্রে ভারতীয় মতবাদকেই যে অনুসরণ করেছেন তা' বলাই বাহুল্য।

'সাহিত্য' কথাটি রবীন্দ্রনাথ 'সহিতত্ব' অর্থে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি সাহিত্য বা literature অর্থেও ব্যবহার করেছেন। তবে প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' অর্থাৎ শব্দের ও অর্থের সহিতত্বই তিনি শুধু স্বীকার করেননি। 'সাহিত্য' শব্দটিকে তিনি নতুন অর্থ নতুন তাৎপর্য এবং নতুন মাত্রা ও নতুন ব্যঞ্জনা দান করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন এক হৃদয়ের সঙ্গে আরেক হৃদয়ের, এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের, এক কালের সঙ্গে আরেক কালের, এক কথায় বিশ্ব প্রকৃতির ও বিশ্বজগতের সঙ্গে সহিতত্ব বা সংযোগ সাধনই সাহিত্যের কাজ। বিশেষতঃ মানবজীবন ও মানবহৃদয়কে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোন্‌খানে ? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সব গ'লে গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করছে।' (সাহিত্যের পথে)। অর্থাৎ এখানেও সেই সামঞ্জস্যের কথা। কিন্তু মানবজীবনের সম্পর্ক বা মানুষের পরিচয় বলতে রবীন্দ্রনাথ মানুষের দোষগুণের যথাযথ বর্ণনা বা বিবরণ মনে করতেননা। মানুষের মধ্যে যা নিত্য, যা শাশ্বত, যা মানুষকে গৌরবান্বিত করে, তাকেই মানুষের সত্য পরিচয় ব'লে তিনি মনে করতেন। তাঁর ভাষায়, "সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই ? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে ; যাহা তাহার সংসারের মধ্যে ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই। ······এইরূপ প্রাচুর্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। মানুষ যে ভোজনপ্রিয় তাহা সত্য বটে—কিন্তু মানুষ যে বীর ইহাই সত্যতম।" এটিই মানুষের পূর্ণতম প্রকাশ। তাই তিনি একস্থলে ব'লেছেন বিজ্ঞানে আমরা পর্যবেক্ষণশীল মানুষকে পাই, দর্শনে চিন্তাশীল মানুষকে পাই, কিন্তু সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষটিকে পাই। এই সমগ্র মানুষটি

আবার বাইরের বৃহত্তর বিশ্বজগৎ বা বিশ্বমানব-জগতের সঙ্গে যোগযুক্ত থেকেই সমগ্রতা লাভ করে। সাহিত্যের কাজই এই সহিতত্ব সাধন। এবং সহিতত্ব ঘটে বলেই সাহিত্য আমাদের কাছে সত্য ও সুন্দর হয়ে ওঠে। সেখানে ভাঁড়ুদত্ত-ও সুন্দর, মুরারি শীলও সুন্দর ইয়াগোও সুন্দর আবার দুষ্যন্ত-শকুন্তলাও সুন্দর। এবং সত্য বলেই সুন্দর। কাজেই কোন প্রাগ্-নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে নয়, সম্পূর্ণত ঃ স্বকীয় উপলব্ধির বা বোধের সাহায্যেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যে নীতি শিক্ষার কথা আসতে পারে। আলংকারিকদের ভাষায় কান্তা-সম্মিত উপদেশ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই বলেছেন মানুষকে ভালো করার দায়িত্ব সাহিত্যের নয়, মানুষের পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। কিন্তু মানুষের কোন্ পরিচয়? বস্তুবাদীদের মতো মানুষের সামাজিক পরিচয় নয়, দেশকাল নিরপেক্ষ এক সর্বকালিক ও সর্বজনীন নিত্য সত্য-মানুষের পরিচয় অর্থাৎ মানবত্বের। এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতঃই ভাববাদী।

সাহিত্য-সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে এর পরেই আসে প্রকাশের কথা। প্রকাশ শব্দের ইংরেজী Expression শব্দের লাতিন-ব্যুৎপত্তি হ'ল Ex-presso, এর অর্থ to press out, এর মধ্যে খানিকটা যেন বলপ্রয়োগের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু বাঙ্লা 'প্রকাশ' কথাটি সুন্দর। এর অর্থ হ'ল দীপ্তি পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আধুনিক সৌন্দর্য-দার্শনিক ক্রোচে-র মতে প্রকাশ মাত্রই সুন্দর। অর্থ, অপরিচ্ছন্ন প্রকাশ মাত্রই অসুন্দর। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ ব্যাপারটিতে খুব গুরুত্ব দিলেও ক্রোচের মতামত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে সাহিত্যে কি প্রকাশ পেল, কেমন ক'রে প্রকাশ পেল, বিশ্বজগতের সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সঙ্গে এক যোগে যুক্ত হয়ে তা' প্রকাশ পেল কিনা এটিই বড়ো কথা। এখানেও সেই পূর্বকথিত সামঞ্জস্যের কথা। এখানেও তিনি উপনিষদের 'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' শ্লোকের প্রসঙ্গ এনেছেন। "ব্রহ্মস্বরূপের যেমন তিনটি প্রকাশ—মানবাত্মারও তাই। প্রথমটি আমি আছি, দ্বিতীয় আমি জানি, এবং তৃতীয়টি আমি প্রকাশ করি। এই তিনটি ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপের ক্রমান্বয়ে অন্তর্গত।' (দ্রঃসাহিত্য/সাহিত্যের পথে)

এই অনন্ত স্বরূপের প্রকাশ কি ভাবে ঘটতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলবেন অপরের সঙ্গ মিলনে। এখানেও সেই ঐক্য, সামঞ্জস্য ও ঐশ্বর্যের কথা এসে পড়ে। তাইতো তিনি বলেন, "এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধ দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। (দ্রঃ সাহিত্য/সাহিত্যের পথে)

সাহিত্য-শিল্প-কলা-সমালোচকেরা 'প্রকাশ' বলতে যা বোঝেন রবীন্দ্রনাথের ধারণা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রকাশ বলতে মানুষেরই বা মানবাত্মারই

প্রকাশ মনে করতেন। অর্থাৎ মানুষের অন্তরাত্মার প্রকাশ, যে অন্তরাত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে নিরন্তর মিলন প্রয়াসী। বহির্জগতের সত্তার সঙ্গে অন্তর্জগতের সত্তার বিরোধ ঘুচে গিয়ে যে পরম ঐক্য, পরম ঐশ্বর্য দেখা দিচ্ছে সেখানেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। "প্রকাশ একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই।" (সাহিত্য/সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য বোধের মূলকথা বহির্জগতের সঙ্গে হৃদয়ের যোগেই কোন বস্তু বা ব্যক্তি সুন্দর হয়ে ওঠে। কাজেই বস্তুজগৎকে তিনি অস্বীকার করেননি। তবে ঔপনিষদিক লীলাবাদের আত্যন্তিক প্রভাবে তাঁর ব্যাখ্যা বারংবার ভাববাদিতায় উপনীত হয়েছে দেখতে পাই। কিন্তু বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে তাঁকে সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা করতে দেখিনা। ভাববাদী দার্শনিকদের মতো তিনি বস্তুর অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেননি বা উড়িয়ে দেননি। বস্তুকে স্বীকার ক'রে নিয়েই জোর দিয়েছেন আনন্দের যোগ বা অনুভূতি বা উপলব্ধির ওপরে।

"এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীট্সের বাণী মনে পড়ল 'Truth is beauty, beauty truth.' অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা হৃদা-মনীষা-মনসা উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য ক'রে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তা সুন্দর।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি/সাহিত্যের পথে)

'সাহিত্য' গ্রন্থের 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে উপলব্ধি বা আনন্দের যোগ ব্যাপারটা কি তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন যাজ্ঞবল্ক্যের বাণী—

"নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি॥ ......

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়।.........এ কথার অর্থ এই, যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে, তাহার মানে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরও পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি।"

এই ভাবে, জীবনের প্রথম পর্বে রচিত প্রবন্ধে যেমন, তেমনি জীবনের পরিণত বয়সের লেখাতেও রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য বোঝাতে উপলব্ধি বা বোধের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন।

'একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খট্‌কা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায়না—সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারণায় ধরা গেলনা।

তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো ক'রে বলেছিলুম তাই সোজা করে বলার দরকার। বলুলুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্য কী দিয়ে এই সৌন্দর্যের বোধকে জাগায় সে কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের।"

(দ্রঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি/সাহিত্যের পথে)

'যা' আনন্দ দেয়' তাকেই রবীন্দ্রনাথ সুন্দর বলতে চেয়েছেন। এতে বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'লেও সৌন্দর্যের কারণ অনুসন্ধানে তিনি বস্তুর ভিতরকার গুণ বা শক্তির কথা বলেননি। বরংচ নিজের মতো ক'রে বস্তুর সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। তা হ'ল হৃদয়ের যোগযুক্ততার কথা। সৌন্দর্য-সম্পর্কিত প্রতিটি রচনায় এই কথাটাই বার বার তিনি উচ্চারণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের একদিকে সাহিত্য ভাবনা ও অন্যদিকে সাহিত্য সৃষ্টি—এ দু'য়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য, পঞ্চভূত, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ প্রভৃতি গ্রন্থে সাহিত্য-সৌন্দর্য বিষয়ে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত হয়েছে, তা মূলতঃ ভাববাদী। পক্ষান্তরে, তাঁর অজস্র সাহিত্য/সৃষ্টি, ঠিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী না হোক, বাস্তববাদী ও মানবতা-মুখী তো বটেই, বরংচ এককথায় বলা চলে জীবন-মুখী। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ ভাববাদী বা বলা চলে ঔপনিষদিক লীলাবাদী অথচ গল্পগুচ্ছের অজস্র গল্পসমূহে, চোখের বালি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, দুইবোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায় উপন্যাসে, অসংখ্য কবিতায়ও গানে তিনি প্রধানতঃ মানুষের কবি ও লেখক। বিশেষতঃ জীবনের শেষপর্বে তাঁর মন থেকে ভাববাদের গন্ধ প্রায় ধুয়েমুছে গেছে। তিনি তখন দুনিয়ার দরবারে মানুষের হয়ে মানুষের জন্যই প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলে ধরেছেন, বিশেষতঃ তাঁর আফ্রিকা (পত্রপুট , প্রায়শ্চিত্ত (নবজাতক ও প্রান্তিকের কয়েকটি কবিতায় এবং পল্লী প্রকৃতি, সমাজ, সমূহ, রাজাপ্রজা, কালান্তরের বহু প্রবন্ধে বিশেষতঃ লড়াইয়ের মূল, লোকহিত, সমস্যা, সভ্যতার সংকট প্রভৃতি অজস্র রচনায়।

জীবনের গোড়া থেকেই তাঁর জীবনে ও কাব্যে এই দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্ব থেকেই সম্ভবতঃ তাঁর জীবনে ও কাব্যে সীমা ও অসীমের প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে। তাঁর নিজের কথায়, "আমার তো মনে হয় আমার কাব্য সাধনার এই একটি মাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" (দ্রঃ প্রকৃতির প্রতিশোধ/জীবন স্মৃতি)

এই সীমা ও অসীমের টানা পোড়েনেই তাঁর কাব্যে কখনও মাটির পৃথিবীর প্রতি টান, কখনও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-স্বর্গ লোকে অভিসার যাত্রা, কখনও "ভূতলের স্বর্গ

খণ্ডগুলির" প্রতি ভালোবাসা (দ্রঃ স্বর্গ হ'তে বিদায়/চিত্রা), কখনও নন্দনবাসিনী সৌন্দর্য লক্ষ্মীর প্রতি আকর্ষণ (দ্রঃ উর্বশী/চিত্রা)—দুইই একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় উল্লিখিত দু'টি কবিতাই মাত্র একদিন আগে-পরে লেখা। উর্বশী, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২, স্বর্গ হ'তে বিদায়, ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২। অর্থাৎ একই সময়ে একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে সীমা ও অসীমের প্রতি টান যুগপৎ কাজ ক'রে যাচ্ছিল। এই কথাটাই প্রমথ চৌধুরীকে আরও বিশদ ক'রে তিনি বলেছেন দু'টি চিঠিতে ১. 'আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।"

২ আর একটি পত্রে লিখেছেন, 'আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌চে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করচে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছেনা। আমার ভারতবর্ষীয় শান্তপ্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর এক দিকে বৈরাগ্য। এক দিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজাফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এইজন্য সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা ও ঔদাস্য।" (ঐ/পত্রসংখ্যা ৬ / চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)

এই দুইকে তিনি মেলাতে চেয়েছেন, কিন্তু মেলানো যায় কি? দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। সে দ্বন্দ্ব যেমন জীবনে তেমনি সৃষ্টিতে তেমনি সাহিত্য তত্ত্বভাবনায়ও।

আসলে গত শতকের গোড়া থেকেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এ'রা ছিলেন মূলতঃ ভূমিজীবী অথচ বণিকী পুঁজির সঙ্গে এ'রাই আবার সদ্যোজাগ্রত নব্যবিত্তজীবী (বুর্জোয়া) হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার অসম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ সার্থক হতে পারেন নি। বরংচ ব্যর্থতার গ্লানিই বহন করতে হয়েছে। গ্রামের ভূমি-ব্যবস্থার সঙ্গে এ'দের নাড়ীর টান রইল অটুট অথচ নব্য বুর্জোয়াদের মতো আধুনিকতার আকাশে স্বাধীনতার পাখা মেলবার দুঃস্বপ্ন ও দুঃসাহসও দেখা দিল। ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের প্রভাব, ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী, রুশো, মিল, বেন্থাম, কোম্‌তে, হার্বার্ট স্পেন্সার ও টম পেইনের The Age of Reason, Rights of Man-এর প্রভাব, বায়রনের চাইল্ড্ হ্যারোল্ডের স্বাধীনতার বাণী, ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডি বিপ্লবের বাণী এ'দের চিত্তক্ষেত্রে অগ্নি-সংযোগ ঘটিয়েছিল। অথচ শিকড় রয়েছে ভূমিব্যবস্থার গভীরে বা মধ্যযুগীয় সনাতন ব্যবস্থার মৃত্তিকায়। তাই, একদিকে বন্ধন ও অন্যদিকে বন্ধন মুক্তির পিপাসা এ'দের মধ্যে এক অসহনীয় স্ববিরোধ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। তাই যে রামমোহন প্রজাস্বত্ব রক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী নায়ক, তিনিই

আবার নিজে জমিদারী স্বত্বের অধিকারী হয়েও নব্য ব্যবসায়ী ও বিত্তজীবী শ্রেণীর পুরোধা পুরুষ। আবার নারী মুক্তির উদ্‌গাতা হয়েও যবনী নারী সংসর্গ দোষে অভিযুক্ত। যে ঈশ্বর গুপ্ত 'সম্বাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অবলাকুলের দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করেন, তিনিই আবার "যত সব ছুঁড়ি গুলো তুড়ি দিয়ে কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে' ইত্যাদি ব'লে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন। 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' ব'লে যিনি স্বদেশ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান, তিনিই আবার লেখেন,

'ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়
গাও সবে মুক্ত কণ্ঠে ব্রিটিশের জয়।'

যে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' লিখে স্বদেশোদ্দীপনার বা জাতীয়তাবাদের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন, তিনিই আবার আনন্দমঠের শেষাংশে ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি রচনা করেন।

গতশতকের মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথও এই দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তবে অসাধারণ মানবপ্রেমে, প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং অন্তর্ভেদী ও দূরবিসপী কল্পনা শক্তিবলে তিনি মানবজীবনের যাবতীয় মৌল সমস্যার গভীরে যথাসাধ্য প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছেন, মানুষের প্রতি মানুষের সৃষ্ট শোষণ, বঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদের বাণী নিয়ে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষতঃ শেষ জীবনের সাহিত্য কর্মে আত্মপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু সাহিত্যভাবনা বা সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে তিনি রয়ে গেলেন ভাববাদী ভাবনার জগতেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৌন্দর্য ভাবনা বিচার কালে এই কথা গুলো স্বভাবতঃই আমাদের মনে রাখতে হবে।

নির্দেশিকা

ফ

ব

ভ

ল

শ

স

হ

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ-রূপ
দুষ্মান্ত	৩৫	১৭	দুষ্মন্ত বা দুষ্যন্ত
ভট্রার্যের	৪১	২৪	ভট্টাচার্যের
ভাবসংহিত	৯0	১৬	ভাবসাহিত
প্রবৃত্তি হ'তে	৯৬	৯	প্রবৃত্ত হ'তে
মমন-প্রকর্ষ	১২৪	১৫	মনন-প্রকর্ষ
ঈর্ষং	১২৫	১৯	ঈষৎ
আলংকাঁরিকদের	১২৫	২0	আলংকারিকদের